

যায়ার
অমনিবাস
দৃষ্টিপাত
ধ্যেন্দ্ৰ



এয়াবৎ প্রকাশিত আমার বিভিন্ন গ্রন্থের
এই প্রথম সংকলন।
সর্বগত পিতৃদেবের! অবিন্দনীয় শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করলাম।

নিউদিল্লী
মাঘ, ১৩৮৯

দৃষ্টিপাত

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৩ জানুয়ারি ১৯৪৭

এক

সাত ষষ্ঠী আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল। বিমানবাটিটি আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু উকৰে প্রধান। পর্ব গোলার্ধে যুক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন ও চৈনিক সমর-বিশারদদের এটা আগমন ও নিকুমগের পাদপীঠ। প্রাতাহিক পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে এর বহুল উল্লেখ।

আমাদের বাহনটি ডাঙ্গলাস ডাবল এঞ্জিন জাতীয়। খেচের কুলপঞ্জীতে ফ্লাইং ফোটেস ও লিবারেটার প্রেমের পরেই এর ছান। নিকষ না হলেও ভজকুলীন বলা যেতে পারে। এর আকার বিশাল, গর্জন বিশুল ও গতি বিদ্যুৎপ্রাপ্ত।

পুরাণে পুন্থকরণের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত। আধুনিক বিমান রথের গন্তব্যস্থল মর্টলোক। কিন্তু সারাথি নিপুণ না হলে যে-কোন মুহূর্তে রথাদের স্বগপ্রাপ্তি বিচ্ছিন্ন নয়।

বিমানবাটির কর্মকর্তা বাঙালী। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ এবং ব্যবহারে অমায়িক। এর স্তৰি মণিকা মিত্রের সৌন্দর্য-খ্যাতি নয়াদিনের অনেক বকললনার মর্মবেদনার কারণ।

কাঠের সিডি দিয়ে মাটিতে নামতে হয়। বিমানকর এক অনুভূতি। এই তো সকালবেলায় ছিলেম কলকাতায়। দমদমের পথে গ্যাসের আলোগুলি সব তখনও নেড়েনি। ঘৃটপাথে খাটিয়ার উপরে আপাদমস্তুক চাদর মুড়ি দিয়ে হিন্দুশালী দোকানদারেরা নিষ্ঠামগ্ন, কর্পোরেশনের উড়ে কুলীয়া জলের পাইপ থেকে গঙ্গোদকের দ্বারা রাজধানীর বহুজনমন্দিত পথগুলির কেন্দ্ৰমুক্তিৰ আয়োজনে ধৰ্মবান। সাইকেলের হাতলে স্তুপীকৃত খবরের কাগজ চাপিয়ে হক্কয়ারা যাচ্ছে এ দুয়ার থেকে ও চুনারে।

সদাগত রঞ্জনীর সুমুক্তির রেশ ধৰণীর বুক থেকে তখনো নিঃশেষে মুছে যায়নি। আকাশের কৃষ্ণপক্ষের যশিত চাদ দূরবর্তী তরঙ্গের শীর্ষে কুঁশা-রমণীর নিষ্পত্তি মুখের মতো সৃতিহীন। যিচ্ছিটি করে জ্বলছে গুটি কয়েক মুহূৰ্ত তার। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখিদের কাকলি শুক হয়েছে ধীরে ধীরে। দমদম বিমানবাটির দূরবর্তী পাটকেলের উত্তুক চিমনিটা আকাশের পটে ধীকা আবছা ছবির মতো দেখাচ্ছে। বিমান কোম্পানীর সাদা ধৰ্মধৰে যুনিফর্ম পরিহিত খেতাব কর্মচারীরা টিকিট পরীক্ষা ও মাল ওজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্তসমস্ত। দূরে বারাসতের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মছরগতি গুরুর গাড়ি, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈলচুরিত চাকার ক্ষীণ আর্তনাদ।

দেড়টা বাজতেই নয়াদিনি। মাঝে শুধু বামবৌলীতে ঘটাখনেকের বিআম,—প্রাতরাশের প্রয়োজনে। বাবস্থা থাকলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনৰায় দিলি থেকে সক্ষ্য নাগাদ কলকাতায় ফিরে যেত্তোতে সিনেমা দেখা যায়। রেলযোগে প্রায় দেড়ছিন্নের পথ। দূরকে নিকট এবং দুর্গমকে সহজাধিগম্য করেছে যে-বিজ্ঞান, তার জয় হোক।

মনে আছে শৈশবের কথা। দুপুরে গৃহকর্তাৰ কৰ্মসূলে। আহারাদিৰ পৰ প্রাতাহিক দিবানিৰার অবাধ শৈথ বক্ষিমের উপন্যাস হাতে মা পাশেৰ ঘৰেৰ মেঘেতে আঁচল বিছিয়ে শয়ান। তাৰ সেই বৰায় বিশ্রামক্ষণটি যাতে চপলস্বভাৱ-বালকেৰ সশস্দ দৌৰায়ে খণ্ডিত না হয় সেজন্য পিতামহী মাতিকে নিয়ে বসেছেন। বৰ্কা তাৰ ক্ষীণদৃষ্টি চকুৰ উপরে নিকেলেৰ চশমা-জোড়াটা এতে মডু স্বয়ে পঞ্জেল কৃতিবাসী রামায়ণ। খানিকক্ষণ এপাল, ওপাল, উসবুস করে মাথাৰ বালিশটা নিয়ে লোকাল্পনিক পবে হঠাতে এক সময় কান্দে আসতে

ৱাবণ বসিল চাড়ি পুন্থক রথতে।

বিদ্যুতের সম্ম-গতি আকাশ পথেতে।

অমনি ভুজ উৎকৰ্ণ হয়ে উঠতেম। অৱশ্য, পৰ্বত, সাগৰ, জঙ্গল অতিক্রম করে রথ চলেছে শুনাপথে মৃত্যুক বিছনেৰ মতো, দূৰ হতে দূৰে, দেশ থেকে দেশস্তৰে মধ্যাহ্নদিনেৰ কমহীন অলস প্ৰহৱগুলি শিতমনেৰ নিৰুক্তু কলনায় উদ্বীপ্ত হয়ে উঠত। দশননেৰ সৌভাগ্যা ঈর্ষা জয়াত। একলক পৃথু ও ততোধিক পৌত্ৰ সংখ্যাৰ জন্য নয়, তাৰ যদৃচ্ছ আকাশপ্রমণক্ষমতাৰ জন্ম।

সেদিনের বৃক্ষ পিতামহী তার ডক্টি, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে দীর্ঘকাল গত হয়েছেন। তার-ই নাতি-জাতীয়া যে অন্দুর ভবিষ্যতে শক্ষাবিপত্তির সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে-কথা কর্জমা করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দশকারণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কা নিকাবতনয় কর দাঁড়ে পৌরোহিতেন তার উচ্চে কৃতিবাসে আছে কিনা মনে নেই, কিন্তু কলকাতা থেকে দিলি—নগ' তিন মাইল পথ আমরা সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করেছি। এতে উচ্চেজনা আছে কিন্তু উপভোগ নেই। কমলালেন্দুর ঘলে ডিটারিন সি ট্যাবলেট খাওয়ার মতো।

প্রাকবিমান যুগে পথ অতিক্রমণটাই ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; নানাজনের সংশ্পর্শে আসবার একটা সুপরিসর অবকাশ তাতে মিলত। মন্দগতি গরুর গাড়ির কথা থাক ; রেলপ্রমাণে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা যোগাযোগ ঘটে, বিমানযাত্রায় তার সম্ভাবনা মাত্র নেই। যুক্তোভূকালে ভারতবর্ষেও বিমান চলাচল বহুলত হবে। রাত নটিয়া গ্রেট ইস্টার্নে ডিলারের পর দমদমে ফ্লেমে উঠে পরিপাটি নিয়া দিলে পরাদিন সকালে বহুর তাজে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে। সেদিন না থাকবে সূর্য অথবা সুবিহুর জোরে টিকিট কেনার হাঙ্গামা, না থাকবে কূলীর বা সহযাত্রী কোলাহল। জানালার কাছে 'চাপ্রাপ' হৈকে কেউ যুব ভাঙ্গবে না। পানিখাড়ে তার বালতি থেকে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর অঙ্গলি ভরে দেবে না। এবং টিনের চালার ঘূর্মুট ঘরের ফটক আটকে যে পয়েন্টস্ম্যান সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ি 'পাস' করে তারও আর দর্শন মিলবে না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে খেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আচ্ছেগতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।

বিমানযাত্রির বাইরে এসে দেখা গেল, যানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। বেলা প্রায় দেড়টা। মার্চের ঝোপদক্ষ আকাশ পাখুর এবং বাতাস প্রচুর ধূলিকীর্ণ। সামনে গ্রান্থালটসের রাস্তা জনবিবর। কৃষ্ণ প্রাতৱের পর্য পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ উর্ধ্ব অধঃ—যে-দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে উচ্চত্ব বাতাসের একটা কল্পনান নিখাস ছাড়া আর কিছুই ইন্সিয়গোচর নয়। কৃষ্ণ বৈশাখ—কথাটা এতকাল বিধ ঠাকুরের কাবো পড়া ছিল ; কিন্তু 'লোকুপ' তিতায়ি শিখা লেহি লেহি বিবাট অস্ব'র বলতে সত্তি যে কী বোঝায় দিয়ির নিষাঘ মধ্যাহ্নে তারই খালিকা আভাস পাওয়া গেল। সহযাত্রীদের সাতজন বিদেশীয় ; তাদের ধাক্কী অঙ্গবরণে যথাযথ সামরিকগোত্রের নিঃসন্দেহ নির্দেশ। ত্রিপল্টাকা বৃহদাকার এক মোটর-স্লাইডে মাল ও মালিকেরা একই সঙ্গে বোঝাই হয়ে অন্তর্ভুক্ত হল।

হোটেলে স্থান নিন্দিষ্ট ছিল না, সুতৰাং গন্তব্যস্থল অঙ্গাত, পথ অপরিচিত অথচ ভরসা একমাত্র নিজের আদি ও অক্তিম চরণযুগল। তারাই শ্বরণ নিয়ে পথে বিচরণ শুরু করব কিনা ভাবছিলেম।

"আপনি কোথায় যাবেন, চলুন, নামিয়ে দিচ্ছি।"

গভীর রাত্রিতে নিশি ডাকে বলেই তো শুনেছি। তবে কি দিনেও ? না ; পিছনে তাকিয়ে দেখি নিজের মোটরের দোর খুলে পাইয়ে আছেন একমাত্র বেসামরিক যাত্রাসহচর এ. এস. বোঝারি,—ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের যুবেরার !

রোচ্চত্ব মধ্যাহ্নের নিকাপায় পথপ্রাণে পাইয়ে মনে হলে,—স্বার্থ উর্বশী 'লহ লহ জীবন বয়ড' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেও বোধহয় এত খুশি হচ্ছে না।

স্বামপত্র ও বেতারজগতে বোঝারি সাহেবের নিল্লা ও প্রসাংসা দুই-ই সমপরিমাণ, যদিও সরকারী সুব্যাক্তির সোণানে সোণানে, দুর্গম প্রমোশনের শিখরে শিখরে উর্তীর হয়ে অল-ইন্ডিয়া রেডিওর তিনি আজ সর্বাধিনায়ক।

বেতারপূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ছদ্মনামে রসরচনা দ্বারা উর্দু সাহিত্যেও একদা তিনি বহুবিকৃত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভদ্রলোক অসাধারণ বাকপটু এবং পরিহাসরসিক। লাওনেল ফিল্ডেন তাকে অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে বেতারজগতে আমদানি করেন। কলেজের লেকচার করু থেকে রেডিওর স্টুডিও। এমিক দিয়ে বাংলাদেশের শিশির ভাবুঢ়ার তিনি সগোত্র।

শুধু তিনি একাই নন, তার অনুজ্জ ভেড়. এ. বোঝারিও ফিল্ডেনের অনুগ্রহপ্রচায় অল-ইন্ডিয়া রেডিওর অঙ্গনে বাসা বেঁধেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, এককালে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের

ক্রৌতুক-আখ্য ছিল, ইন্ডিয়ান বি. বি. সি—বোধারি ব্রাদার্স কর্পোরেশন।

নয়াদিলির রাস্তাগুলি নয়নাভিয়াম। ঘজু, প্রশংস্ত এবং ছায়াচ্ছম। মসৃণ শীচের আস্তরণ, ডাস্টবিন থেকে উপটীক্ষ্মান জাহালভূপ্রে ঢারা পাইল নয়। যানবাহনের সংখ্যা পরিমিত; পদাতিকদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। ভাবতের অন্যান্য শহরের ন্যায় সতত সঞ্চরমান নিভীক ব্যবস্থাকুল এখানকার রাজশাখে দৃশ্যামান নয় এবং পথপাৰ্থের কোন গৃহের অলিঙ্গ থেকে অক্ষয়াৎ মুখ্যমিস্ত ভাস্তুলোগ নিরীহ পথচারীদের মন্তকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। মাঝে মাঝে গোলাকৃতি কুসুমকার পাৰ্ক, সেখান থেকে সাইকেলের ঢাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ নানাদিকে প্রসারিত। পাৰ্কগুলির নাম প্রেস, আকৃতি একই। উইন্সর প্রেসের সঙ্গে ইয়েক প্রেসের তফাও যা, সে ক্ষেত্ৰে মাঝে। সবগুলিই স্থানে রচিত এবং রক্ষিত।

রাস্তার পরিচয় আমলাভিক। সরকারি দস্তুরখনার পূর্বতন বছ ইংরেজ কর্মচারীদের নাম পথের প্রাপ্তসীমায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত। মোগল বাদশাহ বাবরের চাহিতে চীফ-কমিশনার বেলা সাহেবের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই নূরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড গ্রোড অধিকতর অভিজ্ঞত। বোৰা গেল, নয়াদিলির নগরগোলদের আর যাই থাক, বিনয়ের অপবাদ নেই। প্রসঙ্গত এ কথা উত্তেখণ্ডে যে, একটি রাস্তার নামকরণ রাধীক্ষনাধৈরের নামে তাঁর জীবনদৃশ্যাই হয়েছে, কবির জন্মস্থানে আজও যা সজ্জব হয়নি। শায়ের যোগীর পক্ষে ভিত্তি পাওয়া সহজ নয়।

বোধারি সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তার নাম কুইন্সওয়ে। নামটি ভালো। বাংলা জানীরদীঘির কথা শ্বারণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাম নিয়ে কবিত্ব করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। ক্ষু, পিপাসা ও ক্লাষ্টি নামক যে কঠি অসুবিধাজনক অবস্থা মানবদেহকে বিত্রিত করে থাকে আপাতত তাদের নিরসন প্রয়োজন।

যুদ্ধের হিডিকে গভর্নমেন্টের দস্তুরখনার বিস্তার ঘটিছে অভাবনীয় বেগে। কেরানী, দশুরী, শাহেব, সুবোৰ শহরের ঘৰবাড়ি পরিপূর্ণ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছে সেক্রেটারিয়েটের বছ তিন-হাজার চার-হাজারী মনসবদার। নালা দিকশেষ থেকে এসেছে খবরের কাগজের বিপোটাৰ। হোটেল, বোর্ডিং-হাউস সৰ্বত্রই এক রব, —ঠাই নাই, ঠাই নাই ছোট এ বাড়ি। প্রচুর দক্ষিণ কবুল করেও সাতদিনের অবিভ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রাধীক্ষনাথ লিখেছেন,—বহুদিন মনে ছিল আশা ; রহিব আপন মনে, ধৰণীৰ এক কোণে, ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। অনুমান হয় কবি এককালে দিল্লিতে ছিলেন।

যিনি আতিথি দিলেন, তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানীৰ স্থানীয় কৰ্তৃধার। নিজের কর্মকুশলতায় কোম্পানীকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নয়াদিলি শহরটা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রয়োজনে ; কপালে তার জয়পত্র আটা,—“অন্হ হিজ ম্যাজেস্টিস্স স্টার্টিস” জামেসদেপুয়েকে যদি বলি স্টেস-টাউন, তবে নয়াদিলিকে বলা যেতে পারে স্টেলফ্রেমের টাউন। শহরের জনসংখ্যা গড়ে উঠিছে সেক্রেটারিয়েটকে কেন্দ্র করে। চাপুরাণী, দশুরী, কেরানী, সুপারিষ্টেন্ডেন্ট আকীর্ণ এই শহরে বেসরকারী বাসিন্দার কক্ষে পাওয়া ভার। এখনকার সম্মান ও প্রতিপত্তি উৎস ধাকে ইন্ডিয়া গেজেটের পাতার মধ্যে। যে-অল্লসংখ্যক বেসরকারী লোক এখনকার সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী প্রভাবান্বিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তারা যথার্থই শ্রেষ্ঠ যোগ্য। আমার হেস্ট সেন মহাশয় স্থানীয় সংস্কৃতাগ্রণ সমিতিৰ সভাপতি, কালীবাড়িৰ সম্পাদক, বাঙালী ক্লাবের কর্মকর্তা এবং আজও একাধিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানেৰ বিশিষ্ট সদস্য।

জালোকেৰ জালামারিত সারিবাধা ‘সুবৃজপত্রে’ ধাঁচানো খণ্ড দেখে বোৱা যায় তাঁৰ রুচি। জোড়াবস্তৰে সেটা অধিকতর পরিকৃত হলো। শুক্তো, ভাজা, ডাল, তরকারী, মাছ, টুক ও একটু দৈ। সাধারণ জল বাঙালী পরিবারে যা প্রাতিহিক আহার অতিথিৰ জন্যও সেই ব্যবস্থা। অপৰাহ্নে মারিবকেলেৰ কৃতি সহবাহো চিড়ে ভাজা বা বাড়িতে তৈরী আনকয়েক বুজি। চায়েৰ সঙ্গে পাতুয়া রসগোলার সমাজোহ এবং ভাতেৰ সঙ্গে চপ-কাটলেটেৰ বাহলু ঢারা প্রত্যহই অতিথিকে স্বারণ কৰিয়ে দেবাৰ চেষ্টা নেই যে, এ গৃহে সে একজন বহিৱাগত আগকৃত মাত্ৰ। সহজ হওয়াৰ মধ্যেই আহে কালচাৰেৰ পৰিচয়, আড়ুবৰেৰ মধ্যে আছে দস্তেৰ। সে দস্ত কখনও অৰ্থেৰ কখনও বিদ্যাৰ, কখনও বা প্রতিপত্তিৰ।

দুই

বৈকল কাব্যের ত্রীরাধি কৃষ্ণবিরহে একদা 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। দিনির কন্ট প্রেসকে বৃদ্ধাবনের কুঞ্জগলি বলে কোন মতেই ঝুল করবার সংজ্ঞাবনা নেই, তার পুরুনারীরা কেউ ব্যবভাদ্যনিদিশা নম। কিন্তু এখনকার শ্রীমতীরাও নিমার রজনীতে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করেছেন।

না করে উপায় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে মার্ত্তগুদের এখানে যে প্রচণ্ড ক্রিগ বিকিরণ করেন, তাতে ঘরের ভিতরটা প্রায় টাটা কোম্পানীর অঙ্গীরভ বয়লারের মতো তেতে থাকে। মাথা খুজতে গেলে মাথা কুটতে ইচ্ছে হয়। পাখা খুলে দিলেও আগুনের হঢ়া লাগে। সুতরাং বাহিরে ঘূমানো ছাড়া গতি নেই।

শুধু মেয়েদের নয়, ছেলে বুড়ো বাচ্চাকাটা সবাইই এক অবস্থা। সংস্কাবেলো বাড়ির সামনে অভিযন্তে ঘটি ঘটি জল ঢেলে উত্পন্ন ধরণীকে করা হয় শীতল। তার উপর খাটিয়ে বিছিয়ে পড়ে সারি সারি বিছানা। দেখে মনে হয়, যেন সন্দৰ্ভারী হাসপাতালের তিন, পাঁচ বা সাত নম্বর ওয়ার্ড। স্বামী, স্ত্রী, বন্দুর শাত্রু, নন্দ, ভাজ, পুত্র কল্যান সবাই শুয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন, শয়া ধিরে নেই কোন আবরণ। অনভ্যন্ত চোখে হঠাত যেন একটু দৃষ্টিকুঠ ঠেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্য আর খাটো শীতিকোথের ন্যায় আমাদের শালীনতা জ্ঞানটাও আপেক্ষিক। দেশাচারের দ্বারা তার রকমফের ঘটে, প্রয়োজনের খাতিতের হয় রদবদল। কলকাতার বড়বাজারের রাস্তায় দেখা যায়, খাটো কাঁচুলি আর আঠারো গজি ঘাগরার মধ্যপথে মেসবছল দেহের অনেকখানি অনাবৃত রেখে অসক্ষেত্রে চলেছেন মারোয়াড়ী মহিলা। আমাদের বাঙালী তরঙ্গীদের মধ্যে কারও মতি হবে না সে সজ্জারীতিতে। ইঁটুর উপরে-ওঠা স্ট্রাট পরে ইঁরেজ ও এ্যাংলো ইত্তিয়ান মেয়েরা যাচ্ছে যত্ন তত্ত্ব। কিছু খারাপ লাগছে না তো চোখে। অথচ আমাদের অতি আধুনিকদের মধ্যেও কোন দুঃসাহসিক তাঁর ক্রেপ শাড়ির ঝুল পায়ের গোড়ালি থেকে জান পর্যন্ত উঁচুত করতে পারবেন না। যদি বা পারেন, লজ্জায় চোখ তুলে তাঁর দিকে কেউ তাকাতে পারব না।

একই বস্তু কেমন করে শুধু মাত্র আবেষ্টন ভাষা ও পরিবেশের তফাতে জীব ও অঙ্গীল ঠেকে তার আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টিকুঠ আছে সিনেমায়। শঙ্কর-ভানুর, পুত্রবৃু ও কল্যান-জামাতা একসঙ্গে যেটোতে বলে গ্রেটা গার্রো ও চার্লস মোয়ারের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন আর আলিঙ্গন দেখতে থারা কিছু মাত্র সঙ্গুচিত হন না, বালোছবির নায়ক-নায়িকার নিরাপিয় প্রণয় নিবেদন দৃশ্য তাদেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে দেখেছি। শারীরতত্ত্বের আলোচনায় যে কথা বাংলায় বলতে বাধে, ইঁরেজীতে তা নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা হয় অনায়াসে।

গরমকালে ঘরে তুলে যে-মেশে কুরে ধরে, সে-মেশে মেঘে পুরুষকে বাইরে ঘুমোতে হয় এবং তিন চারটো করে আলাদা উঠান ঘর্ঘন শতকরা নিরানয়ী জনের বাড়িতেই মাথা সংজ্ঞব নয় তখন শঙ্কু, জামাতা, মা ও মেয়ে এক জায়গায় খাটি না বিছিয়েই বা করে কী? নয়াদিনি সার্বজনীন শহর। অঙ্গ, বজ, কলিঙ্গ, কালী, কাঞ্চি, কোশল থেকে এখানে ঘটেছে জনসমাগম। আহারে তারা যদি বা নিজ নিজ রুচিকে রেখেছে বজায়, শরনে মেনে নিয়ে একই রীতি। পাঞ্চালী মেয়েদের বসন এরকম কমিউনিটি ইলিপিং-এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোড়ালির কাছে আট পায়জামা শিথিলেবক্সন শাড়ির মতো অলঙ্কৃত নিপিত দেহের উপর অবিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

সকল বেলা ঘুম ভাঙতে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল সে হচ্ছে ফিরিওয়ালার ক্যান্ডেলেকেড। দুধ, সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, সবুজ এখানে ঘরে বসে পাওয়া যাবু পসারিনী যদিও বাঁচে, পসরা আসে দরজায়। মাথায় চেপে নয় সাইকেলে। এ জিনিসটা এখানে অসংখ্য। কলকাতায় সাইকেল চাপতে দেখি খবরের কাগজের হকারেকে। কিন্তু নয়াদিনিকে গয়লা, ধোপা, নাপিত, জেলে, কসাই, প্রাউজের ছিট, গায়ের সাবান বিক্রেতা আসে সাইকেলের পিছনে মন্ত ঝুড়ি বা বাঁক চাপিয়ে। মহানগরীর সওদাগরেরাও পদাতিক নয়।

প্রভাতে উঠিয়া যে-মুখ দেখিনু, তার বেসাতি দুধ। ছাকরা গাড়ির হোড়ার মতো হাড়গোড় বেব করা জীর্ণদেহ সাইকেল, তার পিছনের ক্যারিয়ারের দুপাশে বাধা দুধের দুটি টপ। তিনের তৈরী, তলায় জলের কলের মতো টাপ, ঘোরালে দুধ বেরোয়। সামনের হাতলে ঝুলছে অনুরূপ গুটি দুই পাত্র। আশ্চর্য বহন ও চলন ক্ষমতা এই দ্বিতীয়রথের। আশ্চর্যতর তার চাকা, চেন ও দুর্ফুভাণের সম্মিলিন ট্রাক্টানবাদন। তিনের টবণ্ডিলির উপরের দিকে ঢাকনি আছে, তাতে তালা আটা। বলা বাহ্য দূরের বিশৃঙ্খলা এবং গয়লার বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে ক্রেতাকে আবস্থা করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অসাবধানী লোকের হাতায় ঘটা করে নাম লেখার মতো। মীরং ত্যাঙ্গ ক্ষীরং গহণ করতে হলে খাচ সের দুধকে দুসেরে দীড় করতে হয়।

গয়লার পরে “কলকাতাকা হিলশা সো, করাচীকা টিংড়ি” হাক দিয়ে এল মাছওয়ালা। বলা বাহ্য সে-ইলিশ বেশীর ভাগই বঙজ নয়, এলাহাবাদের। তবে অনেক মানুষের মতো তারাও স্বব সময়ে চেহারায় ধূৰা পড়ে না, পড়ে স্বাদে। মাছওয়ালার সাইকেলের পিছনে ঝুড়ির উপরে মিহি জালের আবরণ, মাছির অত্যাচার নিবারণের জন্য।

সবজি-ওয়ালা আসে একে একে। কেউ হাকে,—লেটকী লো, কেউ হাকে পালং অথবা গোবী। কারো বা ঝুড়িতে আছে তিমাটো, ভিঞ্চি, হরা ধনিয়া এবং সীতা ফল অর্ধাং কুমড়ো। রক্তক বাইসিকেলের পশ্চাতে যে পর্বতপ্রমাণ কাপড়ের বোৱা চাপিয়ে আসে তা দেখে ত্রেতায়ুগে পদ্মনন্দনেরও বিশ্বায়ের উদ্দেশ্য হতে পারত।

মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাঢ়ি দু-একই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সমান সময়সাপেক্ষ। তফাত শুধু এই যে, প্রথমটির যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল মোজ বাধতে হয়, দাঢ়ি রোজ কামাতে। যে বাধে সে চুলও বাধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুণ্ণও চলায়,—এ কথা সত্য। তবুও, বেণীরচনায় আত্মজ্ঞায় বা নননিমীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুলী হন; ক্ষোরকার্যে নর-সুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক হেলে আয়েশ বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম। তার সঙ্গে আছে খুব ছোট পিলের একটি পোর্টেবল চুলী, অনেকটা ইকৰিক কুকারের মতো আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের বাসিন্দারা জানেন, ডিসেম্বরের সাইক্রিসি ডিগ্রির শীতে গালে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার চাইতে চড় দেওয়া ভালো।

সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হয় আপিস অভিযান। প্রথমে চাপরাশী দল। গায়ে থাকী রঙের উন্দি, মাথায় পাগড়ি ও কঠিতে লাল সর্পকৃতি তিন চার ফেরতা কোমরবক্ষ। দু-একজনের কোমরবক্ষে সুন্দর্য খাপের মধ্যে হাতির দাতের ঠাটওয়ালা ক্ষুদ্র ছুরিকা। মোগল বাদশাহের আমলে থেজা প্রহরীদের অনুকরণ। তারা অনাবেল মেছৰ বা সেক্রেটারীদের চাপরাশী। আর্দালী বাহিনীতে মেজর জেনারেল। তাদের সাইকেলের পিছনে লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা এক শুচু ফাইল, যা সাহেবের প্রত্যেক শনিবারই বাড়ি নিয়ে যান কাজ করার জন্য এবং বেশীর ভাগই সোমবারে ফিরিয়ে আনেন একবারও না ছাঁয়ে।

চাপরাশীদের পরে যায় কেরানী, এ্যাসিস্ট্যান্ট ও সুপারিটেন্ডেন্ট।

সাইকেল, সাইকেল, সাইকেলের পর সাইকেল। ঠিক যেন একটা সাইকেলের প্রসেশন। তার সঙ্গে আছে টাঙ্গা। সেও দ্বিতীয়ান। ঘোড়ায় টানে। সামনে পিছনে চারজন বসা যায়,—কিন্তু মৃহুমুখি নয়, পিঠোপিঠি। মাথার উপরে সামান্য একটু ক্যাসিসের আচ্ছাদন; তাতে রৌদ্রতাপ বা বৃত্তধারা কোনটাই পুরোপুরি নিবারিত হয় না। আরোহণ ও অবোহণের কালে পুরুষদের পক্ষে হয় জিমনাস্টিকের পরীক্ষা, শাড়ি পরিহিতাদের পক্ষে ভব্যতার। একটু সতর্কতার অভাবেই পতন ও মৃত্যু অসম্ভব নয়।

টাঙ্গার গতি মহুর, আসন আরামহীন এবং পরিবেশ নাসারজ্জের পক্ষে ক্রেশকর। সম্পত্তি আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণার হার হয়েছে বৃক্ষ। আগে যে রাস্তাটুকুর মাশুল ছিল চার আনা, তার জন্য এখন বারো আনার কমে টাঙ্গাওয়ালাৰা কথা বলে না; কিন্বা এমন কিছু বলে যা না শোনাই ভালো। তবে দশটা পাঁচটায় সেক্রেটারিয়েটের পথে সহযাত্রী মেলে। টাঙ্গাওয়ালা

“দণ্ডুৱকো, দণ্ডুৱ জানেবালা আইয়ে”, বলে চেছিয়ে সংগ্ৰহ কৰে সওয়াৰী। তাতে ভাড়াৰ অংশ বিভক্ত হয়ে পাকেটৰ পক্ষে সুসহ হয়। ভাগেৰ মা গুজা পায় না, কিন্তু ভাগেৰ টাঙা গন্তব্যাছল অবধি গিয়ে শৌচায়।

সাড়ে দশটোৱ মধ্যে গোটা শহৱটোৱ সমষ্ট পুৰুষ নিঙ্কাণ্ট হলো পথে। সব পথেৱে একই লক্ষ্য—সেক্রেটারিয়েট। বাবু পালাল পাড়া ঝুড়ালো, গিৰি এল পাঠে।

ইল্পৰিৱাল সেক্রেটারিয়েটটি নবনিৰ্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়েট নম এখনকাৰ বাড়িছৰ, পথঘাট, হটেলজাৰ সবই নতুন। নয়াদিলি শহৱটো আপন্টার্ট, বাৰাণসী প্ৰয়াগ এমনকি কলকাতা মূল্যবাদীৰ মতো ও এৰ পচাতে কেৱল ট্ৰাইভিশন নেই। সে হঠাৎ টাঙা-কৰা ওয়াৰ কল্পনাকৰ, সাত পুৰুষেৰ বনেদি জমিদার নয়। কিন্তু যুগাই যে টুইফোডেৱৰ। এ যুগে জুড়ি গাড়িৰ চাইতে বেৰী-আস্টিন, সাত লহুৰীৰ চাইতে মফচেন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলেৰ আদৰ বেৰী। বিষ্ট হলৈই হলো, নাই বা রাইল বৈভৱ।

মাঝখান দিয়ে প্ৰশ্নত পথ কিংসওয়ে, ভাইসৱয়'স হাউসেৰ লৌহছাৰ অবধি প্ৰসাৰিত। তাৰই দু'পাশে সেক্রেটারিয়েটেৰ দুই মহল,—নৰ্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, বং, বেৰী, গঠনভঙ্গি হ্যৰু এক। যেন যয়াৱাৰ দোকানে “আৰাৰ খাবো” বা জলতৰস হাতে গড়া এক জোড়া সদেশ। নৰ্থ ব্লকেৰ সিডিৰ মাথায় প্ৰস্তুত ফলকে উৎকীৰ্ণ পৰিকল্পনাৰ এডুইন লুটনস এবং তাৰ সহযোগী সাৱ হার্ষটি বেকাৱেৰ নাম।

নয়াদিলিৰ প্ৰায় সমষ্ট সৱকাৰী ও বেসৱকাৰী বাড়িগুলিই মুখ্যত: ক্লাসিক্যাল অৰ্থাৎ গ্ৰীক স্থাপত্যেৰ অনুকৰণ, যদিও পুৱোপুৱি নয়। ধাম আৰ গুৰুজ। আৰ্টেৰ সংখ্যা কম। যা আছে তাৰ মোমান ধৰনেৰ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ, মুসলিম পজতিৰ সুচূণাভাগেৰ নয়। ধামকুলি চতুৰ্কোণ নয়। গোলাকৰ। নয়াদিলিৰ পতনে শীৰ স্থাপত্যকে গ্ৰহণেৰ পচাতে কেৱল উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা শক্ত। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞেৰ ধাৰণা এই যে, জলবায়ু ও আবহাওয়াৰ দিক দিয়ে সীম উৰুৱ ভাৱতেৰ সমতুল্য যদিও তাৰ শীৰ অপেক্ষাকৃত সহযোগ্য। এবং শীৰ অপেক্ষাকৃত কঠোৱত। উভয় ভাৱতেৰ মতো শীৰেৰও বাতাস অনাৰ্দ, আকাশ নিৰ্মেৰ এবং গ্ৰেচু নিৰ্মল সৃতৰাং শীৰ স্থাপত্য নয়াদিলিৰ পক্ষে স্থায়িত্বেৰ দিক দিয়ে অধিকত উপযোগী হবে, হ্যুতিদেৰ মনে এ বিশ্বাস দেখা দেওয়া আৰ্শ্য নয়।

কিন্তু নয়াদিলিৰ স্থাপত্যকে পুৱোপুৱি কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক নয়। সেটা ক্লাসিক্যাল বটে কিন্তু একেবাৱে মিৰ্কেজল নয়। সেক্রেটারিয়েট দালানে হিন্দু পঞ্জতিৰও চিহ্ন আছে,—সাৱনাধে দৃষ্টি অশোকক্ষতেৰ অনুকৰণে গঠিত পঞ্জগুলিতে। আছে প্ৰবেশ-ভোৱণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী, ঘোটা প্ৰতিতি অলকেৰণেৰ। তাৰই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্যৱীতিৰ পাথৱেৰ জালি, ফডেপুৰ সিঙ্কিতে চিত্ৰিৰ কৰণে যার বহুল নিদৰ্শন। রাজমিৰ্ত্তিৰা বেশীৱৰাগই এসেছে জয়পুৰ, রাজ্বুতানাৰ অন্যান্য ছান এবং আগা থেকে। জনকৃতি এই যে, তাৰেৰ মধ্যে অনেকে ছিল তাৰ্জি নিৰ্মাতাদেৰ উষ্টৱপূৰ্বৰ। নৰ্থ এবং সাউথ, দু'ভাৱেই মাথায় বিৱাট গুৰুজ, অনেকটা রোমেৰ সেই পল গিৰ্জাৰ অনুকৰণ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যেৰ ছাপ দেওয়াৰ চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গুৰুজ দুটিৰ উচ্চতা কৃতৃবৰ্ষীৰ থেকে মাত্ৰ একশ ঘুট কম। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়েটে কক্ষ আছে আৰ আয় এক হাজাৰ, সব ক'টি মিলিয়ে বাবালাৰ দৈৰ্ঘ্য হবে প্ৰায় আট মাইল। ইলাহী কাণ্ডাই বটে!

সাধাৱণতঃ সৱকাৰী দণ্ডুৱখানাৰ সঙ্গে আৰ্টেৰ বড় একটা সম্পৰ্ক থাকে না। তাৰ নামে যে-দশ্যাটি আমাদেৱ কল্পনায় আসে তা এক রাশি নথি, দলিল, দস্তাবেজ, ও হিসাব নিকাশ। দশটা থেকে পাঁচটা পৰ্যন্ত ট্ৰেবিলেৰ উপৱ ফাইল ধীটাই যেখানে একমাত্ৰ কাজ, সেখানে গুহৰে গঠনভঙ্গি বা পৱিত্ৰেশ নিয়ে আমাৰা মাথা ধামাইনে। সে দালানেৰ জানালা কি বং-এৰ, সিডি কি চং-এৰ সে প্ৰশ্ন আমাদেৱ মনেই আসে না। পুলিশকোর্টেৰ দেয়ালে অজন্তাৰ ফেঁকো পেটিং আমাৰা আশা কৱিনে। কিন্তু দেখলে কি খুশি হতেম না? অন্ততঃ নয়াদিলিৰ সেক্রেটারিয়েটকে সুদৃশ্য কৱাৰ চেষ্টা দেখে আনন্দিত হয়েছি।

লাল পাথরে গড়া বিনাটি ভবন। মাঝখান দিয়ে দুরপ্রসারিত পথ। পথের দু'পাশে শ্যামল দূর্বার আন্তরণে ঢাকা বিস্তৃত প্রাক্ষণ। মাঝে মাঝে কৃত্রিম খিল, তাতে সারিবন্দী ঘোয়ারা থেকে অবিবাম উৎসারিত হচ্ছে জলযাশি। পাশে পুশ্পিত মরসুমী ফুলের—ডেজী প্যানসী, এ্যাস্টর ও হলি হকের—কেহারী। নির্বাচিত স্থানে একটি করে কমলালেবু গাছ। বহু যত্নে বৃন্তাকারে হাঁটা তার ডালপালা, মনে হয় যেন ধাটের উপর দীভূতে আছে এক একটি খোলা ছাতা।

দালানের ভিতরটোকেও কেবলমাত্র কাজের উপযোগী না করে দর্শনযোগ্য করার প্রয়াস আছে। নর্থ ও সাউথ রুকে কমিটি রুম নামক যে বৃহৎ কক্ষগুলি আছে তাদের সিলিং এবং দেয়াল চিত্রশোভিত। বর্ষে স্কুল অব অর্টের শিল্পীদের আঁকা। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভাল কিন্তু দুর্বলের বিষয় অঙ্কন্তাতুর্য প্রশংসনীয় নয়। এই কক্ষগুলিতে নানা রকম কমিটি, কনফারেন্স বসে। সার স্ট্যাফের্ড ক্রীপসের প্রথম প্রেস কনফারেন্স বসন্ত সাউথ রুকের কমিটি রুমে।

ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পৌছল দিল্লিতে। তখন দুটো। সুতরাং বেলা চারটায়—মাত্র দু'ঘণ্টা ব্যবধানে—একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকার মধ্যে তৎপরতার পরিচয় আছে যথেষ্ট। সাউথ রুকের স্বৰ্গটাই মিলিটারীর দখলে, বেসামরিক দণ্ডের মধ্যে মাত্র হোম ডিপার্টমেন্ট আছে একটি টেরে। অবস্থান নেকটোর কারণ বোধ হয় স্বত্বাবসন্ধ্য। ভারতে পুলিশ আর মিলিটারী প্রায় কাছাকাছি। স্বগতে না হলেও স্বজ্ঞাতি বটে।

দরজায় কড়া সামরিক পাহারা। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের জন্য ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যবস্থা হয়েছে প্রবেশপ্রত্রে।

প্রচুর বক্ষিশ ও প্রচুরতর তাড়না দ্বারা টাঙ্গাওয়ালাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও সাউথ রুকের দরজায় এসে যখন অবর্তীর হলেম চারটে বাজতে মিনিটখানেক মাত্র বাকী। বেচারার চেষ্টায় ক্রটি ছিল না। কিন্তু টাঙ্গার ঘোড়াগুলি ভারতীয় যোগীপুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নিরাসস্ত ও নির্বিকার; কোন কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করা সহজ নয়। বেগবন্ধি প্রায় সাধ্যাত্তিত।

উর্ধবস্থাসে রওনা হলেম কনফারেন্স কক্ষের উদ্দেশ্যে। সিডির মাথায় দীভূতে আছেন সপারিয়দ সার ফ্রেডরিক পাকল, ইনফরমেশন বিভাগের কর্ণধার। পরিচিত বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললেন, ক্রীপসের অপেক্ষা করছেন। গোটা দুই সিডি উপরে যাছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ, মনে হলো সদা আগত ইংরেজ বা মার্কিন রিপোর্টারদের অন্যতম। হঠাৎ পিছিয়ে নেমে এসে সার ফ্রেডরিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "Did you say Cripps? That's me."

এর চেয়ে বক্ষপাত হওয়া ভালো ছিল।

আমরা বিশ্বিত, পাকল সুস্থিত, পারিষদের হতবাক।

সার স্ট্যাফের্ড ক্রিপস্ ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেছেন প্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব নিয়ে। আছেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে। সুতরাং প্রেস কনফারেন্সে আসবেন বড়লাটের ড্রাউন মার্ক গাড়ি চেপে, আগে চলবে লাল মোটর সাইকেলে পাইলট সার্জেন্ট, পাশে থাকবে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অনুকূল কোনো হোমরা-চোমরা পথ- প্রদর্শক। জমকে জলুসে চিনতে বিলম্ব হবে না এক মুহূর্ত। এইটেই আশা করছে সবাই। হা-হাতোশ্য, কোথায় প্রাইভেট সেক্রেটারী আর কোথায় বা আগে পিছনে পিস্তলকোমরে সার্জেন্ট পাহারা। সঙ্গে একটি মাত্র ভাইসরয়স হাউসের চাপরাশী, বোধ করি সেও শুধু পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন।

সরকারী কায়দা কানুন, ফর্মালিটি পরিহার করে আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল একটি পরিবেষ্টন সূচী করলেন ক্রীপস্। তার আন্তরিকভাবে ভারতবর্ষের আস্থা গভীরতর হচ্ছে, তার চেষ্টার সাফল্য কামনা করল জনসাধারণ, তার সুখ্যাতি অক্ষণণ ভাষায় কীর্তিত হচ্ছে সর্বপ্রদেশ ও সর্ব ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তরে।

কনফারেন্স ক্রীপস্ আবেদন জানালেন সাংবাদিকদের, তারা যেন ক্রীপস্ প্রস্তাবের সারমর্ম নিয়ে অথবা গবেষণা না করেন। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে সংবাদপত্রে মীমাংসা-প্রস্তাবের ক্রিয়ত বিবরণ প্রকাশের দ্বারা যেন অবিজ্ঞত বিকৃতভাবের সৃষ্টি না হয় রাজনৈতিক মহলে। বলা বাহ্য, সে আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

সবচেয়ে বিশ্বাসকর, প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীপসের মনে অবিচলিত আছা। ওয়ায়া ক্যাবিনেটের সর্বসম্মত এই মীমাংসা-প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনাগ্রহে প্রাণীয় হবে, প্রিটেন ও ভারতবর্ষের বিরোধ অপনীত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে অদম্য অভিলাষে ভারতের অগলিত নৰনৰী দুরহ ত্যাগ ও দুঃসহ নির্যাতন কৰণ কৱেছে তাৰ সাৰ্থক পৰিগতি ঘটবে, এ বিষয়ে ক্রীপসের মনে সংশয়ের লেশামুক্ত ছিল না।

ভাৱতবৰ্ষ সম্পর্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী চার্চিলের মনোভাৱ কাৰো অজ্ঞাত নয়। জাতীয়তাবাদী ভাৱতবৰ্ষের প্ৰতি ক্রীপসের সহানুভূতি, বিশেষ কৰে কংগ্ৰেসের নেতৃত্বালীয় বাজিমেৰ সঙ্গে তাৰ সৌৰ্যাদী ও তেমনি অতি পৰিচিত তথ্য। চার্চিল ইলিপুরিয়লিস্টদেৱ মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা বৰুৱণশীল। ক্রীপস সোশ্যালিস্টগোষ্ঠীতেও সবচেয়ে প্ৰগতিশীল। জনৈক সাংবাদিক প্ৰশ্ন কৱলেন,—সৰ্ববাদিসম্মত প্ৰস্তাৱ চকন্যাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ও সার স্ট্যাফোৰ্ডেৱ মতেক হলো কী কৱে ? চার্চিল তাৰ মতবাদ ত্যাগ কৱেছেন, না কি সার স্ট্যাফোৰ্ড ক্রীপস বদলেছেন ?

প্ৰবল হাস্যালোৱেৰ মধ্যে ক্রীপস উত্তৰ কৱলেন, কোনোটাই নয়, দুজনাৰই মতেৰ মিল হওয়াৰ মতো একটা নতুন পক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এৰ আগে চোখে পড়েনি।

কনফাৰেন্স থেকে যখন বাহিৰে এলোম, বড়িৰ কাঁটা তখন প্ৰায় হাঁটাৰ কোঠায়। অপৰাহ্ন ব্লেজৱ শাস্ত্ৰৱোষ সুৰ্যেৰ অ-তণ্ত্ৰ রাখি পড়েছে সেকেন্টারিয়েট ভবনেৰ রঞ্জন প্ৰটীৱে। সামনেৰ হোয়াৱাৰ উৎসাহিত ভল কল্পিত ধাৰায় বিকিণু হচ্ছে বৃত্তাকাৰ প্ৰস্তৱ-আধাৱে। ঝজু দীৰ্ঘ কীসওয়েৰ প্ৰাণভাগে দেখা যায় ওয়ায়াৰ-মেমোৱিয়াল, বিগত মহাযুক্তে নিহত ভাৱতীয় সৈন্যদেৱ স্মৰণলেখা যাব গায় উৎকীৰ্ণ। দূৰে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থেৰ পাষাণগুৰেৰ ভগৱাবশেষ কুণ্ঠী তৰুৰীৰ পাশে পলিত কেশ, বিগতহৌবনা বৰ্কা পিতামহীৰ মতো নয়াদিপ্পিৱেৰ বৰ্তমান বৈভবকে স্মৰণ কৱিয়ে দিছে কালেৰ অমোঘ বিধান, অপ্রতিৱোধীয় পৰিগাম !

পিছনে তাৰিয়ে দেৰি উন্নতশিৰি ভাইসেৱ হাউসেৰ বিৱাট গম্বুজেৰ শীৰ্ষে বাতাসে মন্দ আলোচিত মূলনিমন জ্যাক,—ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদেৱ সনাতন গৌৱবচিহ্ন। দুশ' বছৰ ধৰে ভাৱতবৰ্ষে যৱেছে অচল, অটল ও অনপনেয়। এই মাত্ৰ যে কনফাৰেন্স শেষ হলো, তাতে আছাস ছিল এ পতাকাৰ বৰ্ণ পৰিবৰ্তনেৰেৱ। সে বৰ্ণ গৈৱিক হৰে কি সবুজ হৰে, তাতে চৰকা থাকবে কি অৰ্ধচন্দ্ৰ থাকবে সে প্ৰশ্ন পৱেৱেৰ। আপাতত এইটাই বড় কথা যে, সে নতুন হৰে, ভাৱতীয় হৰে। কিন্তু সে কৰে গো কৰে ?

তিনি

গৃহকৰ্ত্তাৰ সাত বছৰেৰ মেয়ে মেৰা এসে অত্যন্ত গভীৰভাবে জিজ্ঞাসা কৱল, “মিনি সাহেব, ইংৰেজ জিতবে কি জাপান জিতবে ?”

মিনি সাহেব নামেৰ পিছনে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, ভাৱাত্মকও।

বিলাতে গেলে আমাদেৱ প্ৰথম কলাপ্তুৰ ঘটে বেলে, বিতীয় নামে। দেশে থাকতে যাবা পল্লু, গদাই, সুৱেন কিংবা সুৰোধ বিদেশে তাৱাই সেল, রং, মিটাৰ অধৰা বানাজী। নয়াদিপ্পিটা খাটি বিলাত নয়,—এৱেসাংস। এখানেও ব্যক্তিৰ পৰিচয় নামেৰ আদিতে নয়, অস্তে। পি-এল-আহুনায় আদা অক্ষৰ দুটি কিসেৰ সংক্ষেপ তা নিয়ে কাৰও ঔৎসুক দেই, শেষেৰ টুকু জানলেই হলো। পদবৰ্যাদাৰ উপৱে নিৰ্ভৰ কৱে সংৰোধনেৰ বিশেষণ। কেৱলী হলে আহ্বানৰ সাফিক্স বসে বাৰু, অফিসাৰ হলে প্ৰেমিক লাগে মিস্টাৰ।

কিন্তু মুখে মুখে কথাৰ ধাৰা বসল হয়, নামেৰও পৰিবৰ্তন ঘটে। বিশেষ কৰে চাকৰ, বেয়াৱাৰা আৰ্দাজী, পিওনেৰ অশিক্ষিত উচ্চাবণে অনেক সময় চলতি বিকৃতি থেকে আসল আকৃতি আচ কৱাই কঠিন হয়। ব্যানাজী বেনারসী হন, যি: ম্যাকাটিস হন মারকুটি সাহেব। সেনগুৰেৰ পৰিচাৰিকা বিলাসিয়াৰ আদি বাস রামগিৰি পৰ্বতেৰ সানুদেশে। ভাৰা কিউটা স্বাবিড় এবং কিউটা আৰ্য, শব্দেৰ উচ্চাবণ মাৰাইক। সূতৰাং কৰে কেমন কৰে কোন শব্দেৰ অপৰাঙ্গ ও কোন শব্দেৰ অৰ্ধাঙ্গ মিলিয়ে তাৰ মুখে মিনি সাহেবে দাঙিয়ে গোছি সে গবেষণায় সুনীতি চাটুয়েৱ শৱণ নিতে হৰে।

“বল না, মিনি সাহেব, কে জিতবে। ইংরেজ ন জাপান?” প্রশ্নকর্তা তাড়া দিলেন।

প্রশ্নটা নতুন নয়। ইতিপূর্বে আরও অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে এ জিজ্ঞাসা। জবাব অবশ্য দিতে হয়নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেক্ষারী নিজেই দিয়েছেন উত্তর, চেয়েছেন শুধু সমর্থন। ধীরা তা দেননি, তারাও কী শুনলে খুশি হবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রাখেননি কখন, ঠিক যেমন ঝৌ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, নতুন শাড়িটার তাকে কেমন দেখাচ্ছে। সুতরাং পাঁচটা প্রশ্ন করলেও, “তুমি বল, কে জিতবে।”

“ইংরেজ!” স্বর গভীর, প্রত্যয়বাঞ্ছক। স্বয়ং চার্টিলের পক্ষেও বোধহয় এতটা নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কাছেই ছিল। বোনের উত্তর কানে যেতেই তাই ছুটে এল! “কী বললি? ইংরেজ জিতবে? জিতবে না হাতি। জাপানীদের সঙ্গে পারবে ইংরেজ? ফু!” বাক্যের সঙ্গে যোগ করল তিনি। ঠোট বাঁকিয়ে মুখে ঢোকে এমন একটা গভীর তাছিল্যের ভাব প্রকাশ করল যাতে শ্রোতাদের পক্ষে ইংরেজের জয় সম্পর্কে ক্ষীণতম আশা পোষণ করাও হস্তাক্ষর নির্বৃক্ষিতা বলে গণ্য হবে।

বৃদ্ধ রেবার চাইতে মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু অভিভাবকদ্বয়ের ধারা প্রায়ই বেয়াদের অনুপাত মেনে চলে না। বিশেষত বৃদ্ধ স্তুলে ভর্তি হয়েছে, রেবার অখণ্ড বাকী। সুতরাং তর্ক-বিতর্কের মাঝপথে বৃদ্ধ যখন মাস্টার বা অন্য হাতেদের নিজির উল্লেখ করে, রেবাকে তখন বাধ্য হয়ে বোৰা হতে হয়। “বিষ্ণু আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সে বলেছে। তার চাইতে তুমি মেশী জান কিনা?” এ যুক্তির উপরে আর তর্ক চলে না।

কিন্তু আজ তো ফার্স্ট বয়ের মতামত নয়। এ যে তার নিজের বিশ্বাস। তাই রেবা দমল নাঃ।

“কেন জিতবে না, ঠিক জিতবে!” কিন্তু কঠে যেন সে দৃঢ়তর আভাস পাওয়া গেল না।

বৃদ্ধ অপরিসীম তাছিল্যের সঙ্গে বলল, “ইংরেজ জার্মানের সঙ্গেই পারে না, আর পারবে জাপানের সঙ্গে। হং, হেরে ভূত হয়ে যাবে।”

“কেন হারবে? ইংরেজের কৃত কামন বন্দুক কৃত এরোপ্তেন। আছে জাপানীদের এরোপ্তেন?”

“জাপানীদের এরোপ্তেন নেই? হা হা হা! এরোপ্তেন থেকে বোমা ফেলে ইংরেজের রিপালস্ আর প্রিজ অব ওয়েলস্ ড্রিবিয়ে দিল কে শুনি? পারল ইংরেজ জাপানীদের কিছু করতে? ইংরেজের এরোপ্তেন তো সব ভাঙা, কী হয় তা দিয়ে?”

“ইংরেজের এরোপ্তেন ভাঙা, মিনি সাহেব? ভাঙা যদি তবে আকাশে ওঠে কেমন করে?” কর্ণ কঠে আপীল জানালেন ইংরেজ হিতাকান্তিকণী।

কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বৃদ্ধ বলল, “ওঠে আর পড়ে যায়। কাল পত্রিকায় লেখেন ‘বিমান দুর্ঘটনা’? কলকাতায় এরোপ্তেন আকাশে উড়তে গিয়ে পড়ে গেছে। তাতে মানুষ মরেছে!”

অকট্য প্রামাণ। শুধু ঘটনা নয়, একেবারে দিন তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ। এর পরে তর্ক করা কঠিন। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রেবা। “দেখো, ইংরেজ হারবে না।”

“তুমি কৃত জানো! হারবে হারবে, হারবে। জাপানীরা চার্টিলকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে দেখে এনে তারপর ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবে।” বলে, এমন ধীরদৰ্পে প্রস্থান করল বৃদ্ধ যেন জাপানী নয়, সে নিজেই চার্টিলের বক্ষনের উদ্দোগ করতে গেল।

রেবা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, “ক্ষুর নয়, জাপানীরা পারবে না। পারবে মিনি সাহেব?”

তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেম, “না পারবে না। আর পারবেই বা কী? বাধুক না চার্টিলকে; আমাদের রেবা দিদিমণিকে তো আর বাধ্যতে পারছে না।”

“ইংরেজ হেরে গেলে বিলদের কি হবে? বিলের বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে যাবে, অন, লুসী ও গ্র্যানী সবাইকে তো বেঁধে নেবে?” বিল মানে প্রতিবেশী উইলিয়ম। রেবাদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সিম্স দম্পত্তির বাবো বছরের ছেলে জন। লুসী ও গ্র্যানী তারই দুই বোন।

“তা নিক না ধরে বিজ্ঞদের। ওদের ট্যাবী কৃকুরটা আমাদের বিলাসিয়াকে সেদিন কামড়ে দিচ্ছিল যে।”

শাখা নেড়ে প্রবল আগস্তি প্রকাশ করল রেবা। বলল, “না ধরে নেবে না ওদের। বিল আমাকে চকোলেট, টক্ষী দেয়। বলেছে একদিন তার সাইকেল চড়তে দেবে।”

ও হবি ! এতক্ষণে বটেনবাজীবীর প্রবল ইংরেজ-হিতেশগার আসল কারণটা বোৰা গেল। চকোলেট, টক্ষী, তার উপরে আবার সাইকেল চড়তে দেওয়ার আহাস। এর পরেও ইংরেজের পরাজয় করল্লা করা অত্যাঙ্গ কৃতভাতার পরিচয় হবে। বিশ্বায়ের কিছুই নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অনুরাগী যে ক'জন আছেন তাঁদের সবারই এই এক অবস্থা। চকোলেট, টক্ষী না হোক, কারো চাকরি, কারো প্রমোশন, কারো বা রায়সাহেব, খানবাহাদুর বা সি. আই. ই. নাইটহড খেতাব।

কিন্তু সুদূর প্রাচোর যুক্ত প্রসঙ্গে বাধা পড়ল। সন্তুষ্মুক ঘোষ সাহেব হানা দিলেন। এই দম্পত্তিটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাঝ দিন কয়েক কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা অন্ধকালের মধ্যেই অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস বললেন, “চলুন ওখালায়।”

“সে কোথায় ? পেক না কান্দাট্কায় ?”

“তার চাইতে কিছুটা কাছে। মধুরার পথে, এখন থেকে মাইল আটকে। ফিরতি পথে নিজামুদ্দিন দেখিয়ে আনব।”

ওখলা জ্বায়গাটা একটা ঝীপের মতো। যমুনার ধারাকে একটি কৃত্রিম খালের মধ্যে দিয়ে ভিন্নমূর্খী করা হয়েছে সেখানে। সে-খাল বেটেন করেছে এক টুকরো ভূমিখণ্ড। বৃক্ষবহুল, ছায়াচ্ছবি। একপাশে সরকারী সেচ বিভাগের দপ্তর, বাকীটা প্রমোদ-উদ্যান। খালের মুখ খোলা ও বৰ্জ করার জন্য আছে লকগেট, তার উপরে প্রশস্ত সেতু। টাঙ্গা ও মৌলির অন্যায়ে যেতে পারে। ছাঁটির দিন দলে দলে লোক আসে পিকনিক করতে। ওখলা নয়াদিল্লির বটানিকস।

জুনটি মনোরম। চারিদিকের ধূসুর রুক্ষ ও ধূলিকীর্ণ দেশে একটুখানি রিঙ্গ, শ্যামলতার আমেজ মেলে। যমুনার অগভীর প্রবাহ খালের দিকে প্রসারিত করার জন্য দীর্ঘ ধীর ধীর। তার উপর দিয়ে উগ্পটীরমান কৃত জলধারা গড়িয়ে পড়েছে ওপাশে। বেদীর মতো পাথর দিয়ে বাধানো সেখানটা। চারীদের ছেলেরা কাপড় দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। খালের মুখে ছিপ ফেলে বসে আছেন দু-একজন সাহেব ঘাসের পর বস্তা। তাঁদের ধৈর্য বিপুল এবং আশা সীমাহীন। গাছের নীচে ফরাস বিছিয়ে বসেছেন কোন শেঠ, প্রসাদ বা শুশ্রাবী। চৌরী বাজারে বিরাট লোহার আড়ত। সারা সন্তান হস্তের হিসেবে সোহা বেঢে অর্ধ উপায় করেছেন প্রচুর। রবিবার এসেছেন প্রমোদ-ক্রমণে। সঙ্গে এসেছে বিপুলকাম্যা গৃহণী, আধিভূত পুত্রকন্যা, গোটা চারেক বৃহৎকার টিফিন-কেরিয়ার, জলের সোরাই, আলবেলুন্স-ও ভৃত্য।

এসেছে কাঁধের উপরে পিতলের চাকতি বসানো খাকী গায়ে ইংরেজ, ক্যানাডিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন। বাহসংলগ্ন ফিরিসী বাজুরী। কঞ্জে চামড়ার ফিতে দিয়ে লস্থমান ফটোগ্রাফের ক্যামেরা। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁদের প্রগল্পকাণ্ডের উৎকৃষ্ট অতিশয় দেখে মাঝে মাঝে সজ্জিত হতে হয় দর্শকদেরই।

আবেদনে ইংরেজকে কথনও দেখিনি এমন মাত্রাজ্ঞানীন। শৰ্নিবার বিকেলে পিকাডিলীতে দেখেছি প্রণীয়গুলের দল। কপ্পেট-ক্রপাটী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। তাঁদের আনন্দেজ্ঞাস ঠিক ভট্টপালীর বিধাননন্দয়ারী নয় বটে, কিন্তু তবুও অশৃঙ্খ, অলিখিত একটা রেখা টানা আছে যা সজ্জন করে না কেউ। সে রেখা সুনীতির নয়, সুকৃতির। ডিসেম্বরে ইংরেজ ভালবাসে মনে প্রাণে। ইভিসেন্ট বলার বাড়া গাল নেই ইংলণ্ডে। ছাবিশ মাইল জল পার হলেই কঠিনেন্টে দেখা যায় না এ রুচিবোধ। শালীনতার অঙ্গুলি-নির্দেশকে সেখানে তরশু-তরুণীরা বৰ্জাঙুলি দেখায় অকৃতিত চিন্তে।

সাত সমুদ্র তের নদীপার হয়ে এদেশে এসেছে যে-ইংরেজ, সে এ সুরক্ষিত রেখাটির কথা ভুলে পিয়েছে নিঃশ্বেষে। ব্রিটেনের বাইরে ব্রিটিশ কলঙ্কের কদর্য কাহিনী আছে Somerset Maugham-এর গল্পে ভূরি ভূরি। পালায়ো ভৰ্মণে সঞ্চয়চন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, বন্দেরা বনে

সুন্দর, শিশুরা মাতৃকেড়ে। ব্রিটেন-অরশের বাইরে ইংরেজকে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ডাকইন-তত্ত্বে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের এই নির্জন উচ্চস্থানের প্রধান কারণ এই যে, তার পাশের দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরা ওদের সবকে কী ভাবি না ভাবি তা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেই আমাদের সামনে তত্ত্ব আচরণের দায়িত্ব। আরও একটা কারণ আছে, সেটা গভীরতর। এদেশে ইংরেজ তার পরিবার ও সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানে সে বল্লাইন অৰ্থ। সে যেন কলকাতার মেসে থাকা মফস্বলের ধৰ্মী জমিদারনন্দন। পিছনে অভিভাবকের এতটুকু নেই রাশ, হাতে টাকা আছে রাশি রাশি।

দুটি ইংরেজ দম্পত্তি এসেছেন নরাণিণি থেকে সাইকেল চেপে এই দারুণ গ্রীষ্মে। আনাৰ্থে। নদীতে জল কোঢাও বুকের উপর নয়, কিন্তু বছ। তারই মধ্যে ঘোষা কয়েক ধরে তাঁদের সন্তুষ্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ণের চেষ্টা চলল সোৎসাহে। ওপারে বালুচরে যে মৎস্যার্থী বকের দল ধ্যানমুখ সংজ্ঞাসীর ন্যায় নিশ্চল নিখির, জলের উপর নিবেদন দ্বারিয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল, শান্তীদের সশঙ্খ জলক্ষ্মীড়া ও কলহাস্যে তাঁদের হৈর্য ক্ষুঁগ হলো। সচকিত হয়ে বারংবার তারা স্থান পরিবর্তন করতে লাগল।

শ্রী-পুরুষে এই মিলিত আনন্দটা তেমন কৃচিকর নয় আমাদের দেশে। প্রাচীনপূর্ণাদের কথা ছেড়েই দিলেন। আহারে বিহারে শয়নে ধীরা ইংরেজের অনুগামী তাঁদের মধ্যেও মেয়েরা এটা খুব ব্যঙ্গস্বরূপ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। ক্ষাবে জিন বা ভারযুধ পান করে পরপুরুষের সঙ্গে ঘোলজ নাচতে ধীদের বাধে না, তাঁরো সহজানন্দ খুব শ্রীতির চোখে দেখেন না।

হির চিত্তে বিচার করলে বোঝা যাবে, এর মূলে আছে আমাদের সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুকি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিষ্ণব, রংয়ে-সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

আমাদের প্রাচীন সমাজে নরনারীর একটা সম্মিলিত সত্তা খুব স্পষ্টরূপে স্বীকৃতি নয়। উভয়ের ক্ষেত্রে পৃথক, পরিবেশ বিভিন্ন এবং কর্তৃত্ব আলাদা। একমাত্র ধর্মচরণ ব্যতীত শ্রী-পুরুষের একত্র করণীয় কিন্তু উচ্চে আমাদের শাস্তি নেই। অর্জনের রাখে সুভূষ্মার সারাধিতাকে বাদ দিলে সম্প্রতি পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যে শামী-শ্রীর মিলিত কর্মে বিত্তীয় উপাখ্যান মিলে না। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গ নিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে নয়, স্বপ্নে দেখা অমঙ্গলের ভয়ে। সেকালে পুরুষেরা করত যজ্ঞন, যাজন, অধ্যাপনা, হলকর্ণণ ও বাণিজ্য। যেয়েরা করত গো-আক্ষণের সেবা, রক্ষণ ও গৃহীর্জন। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ ছিল সুর্ক্ষণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র নিশ্চিথে শ্যায়গ্রহের বহুপরিসর অবকাশের মধ্যেই তা নিবেদ ছিল।

আমাদের একান্নবৰ্তী পরিবার-প্রথাও শামী-শ্রীর সর্বব্যাপী যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে পদে পদে। সেখানে শামী এবং শ্রী একটা বৃহৎ সংসারযন্দের দ্রু বা কল্পু মাত্র, উভয় মিলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি নয়। সরগমের তারা আলাদা দুটি সূর্য; দূরে মিলে একটি অখণ্ড সঙ্গীত নয়। চৌধুরী বাড়ির মেজিঙ্গীর পারেন না বাড়ির আর তিনটি জা ও পাঁচটি ননদকে রেখে একা শামীর সঙ্গে সিনেয়াম, কিংবা গঙ্গার ধারে হাওয়া থেকে যেতে। বঠঠাকুরের মনেও আসবে না একা বড়গিয়াকে দার্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে দেড়িয়ে আনুন কথা।

নরনারীর মিলিত অস্তিত্বের ধারণাটি আমাদের সমাজে অধুনাজ্ঞাত। শ্রী পুরুষের পৃথক সত্তা পুরোপুরি মেনে নিয়েও উভয়ের মিলিত জীবনের একটি সমগ্রকল্প সম্প্রতি আমরা উপলক্ষ্মি করতে শুরু করেছি এবং শ্বেতাকার করতে দোষ নেই যে এ জ্ঞান আমরা যুরোপের কাছ থেকে পেয়েছি। এখনও পুরুষ দশটা-পাঁচটায় আপিস করে, আদালতে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় এবং যেয়েরা দ্বন্দকজ্ঞার তত্ত্বাবধান করে, সদেহ নেই। কিন্তু দুপক্ষের রেস্পন্সিবিলিটি আলাদা হলেও পলিসির বোগ থাকে। এ যুগের শ্রীরা আদার ব্যাপারী হয়েও শামীদের জাহাজের খবর রাখেন।

গৃহ এখন কেবলমাত্র শ্রীর প্রয়োজন ও স্বাক্ষরদের বিচারেই গঠিত নয়। বাইরে পুরুষের বকৃত, সামাজিকতা ও অবসর বিনোদনও শুধু শামীর নিজস্ব অভিমুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

প্রাণিতিহসিক যুগের অতিকায় জীবজগ্তের মতো বর্তমানে একাইবৰ্তী পরিবার শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে। স্বামী, স্ত্রী ও দু'চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যে নাতিবৃহৎ সংসার, তাতে স্বামীৰ স্বামী গৃহকর্তার। সে স্বনামে পুরুষোধ্য। সে গৃহে স্ত্রীৰ পরিচয়ও মেজ, সেৱা বা ছোট বউ রাপে নয়, আপন সামাজিকের সভাজীৱাপে।

অনেকেই ভূলে যান যে, স্বামী-স্ত্রীৰ মিলিত জীবনেৰ পরিপূৰ্ণতাও প্রয়াসেৰ অপেক্ষা রাখে,—সেটা আকশ্মিক নয়। বিবাহ সে পরিপূৰ্ণতাৰ লাইফ ইনসিওৱেল নয়, গ্যারাণ্টি তো নয়ই। সে শুধু মীনস, সে যেন্ত নয়। সামাজিক স্থীৰতি ও আইনগত অধিকাৰ দিয়ে বিবাহ স্ত্রী-পুরুষেৰ মিলনেৰ ক্ষেত্ৰিকে সুপৰিসৰ ও নিৰ্বিষ্ট কৰে মাৰ্জ। তাকে সফল কৰতে হয় উভয় পক্ষেৰ সহজ চেষ্টায়, নিৰলস সাধনায়। আগে প্ৰম ও পৱে বিবাহকে ধীৱাৰ সমন্বয় দাস্পত্য সমস্যাৰ সমাধান আৰু কৰতেন, তাৱা এখন ঠিকে শিখেছেন যে কোটশিপ কৰে বিয়েও ফুল-পুৰুষ নয়, যেমন নয় ইন্টারিভিউ দিয়ে কৰ্মচাৰী নিয়োগ।

স্বামী এবং স্ত্রী দিনে একে অনেকে প্ৰচাৰাবৃত্তি কৰে আপন কৰিব ধীৱা, অভ্যাসেৰ ধীৱা এবং মতবাসেৰ ধীৱা। পৰম্পৰাকে গঠন কৰে নিজ অভিলাষান্বয়ায়, সৃষ্টি কৰে পলে পলে। এই দেওয়া দেওয়া, ভাঙা গড়া চলে অলঙ্কৃত অজ্ঞাতে এবং অনেকটা অবিসংবাদে। সেটা সুগম হয় নিকটতম সারিখণ্ডেৰ ধীৱা। সারিখণ্ড শুধু গৃহে নয়, বাহিৱেও।

মানুষেৰ মন বহু বিভিন্ন, তাৱা পৰিচয়েৰ নাই শেষ। তাৰ সত্তা ধূৰ নয়, পৰিবেশেৰ পৰিবৰ্তনে তাৰ প্ৰকাশ হবে বিভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পৰীক্ষায়, উৎসবে বাসনে চৈব দুভিক্ষে মাঝেবিষ্টে। স্বামী স্ত্রীকে আবিকাৰ কৰবে তিল তিল কৰে নিত্য নব আবেষ্টনে, যেমন মণিকাৰ হীৱা, পারা, মুক্তাকে কৰে নতুন ডিজাইনেৰ বালাতে, চুড়িতে, চম্পহারে। সুতৱাং স্ত্রী যদি জলকেলিৰ সক্ৰিয়া হন, তবে তাকে এমন একটি বিশিষ্টতাৰূপে পাই, যা সকাল বেলাৰ সখুম চামেৰ পেয়ালা-হস্তে প্ৰতীক্ষমানা গৃহিণীৰ মধ্যে নেই। স্ত্রীকে নাচঘৰে অপৱেৰ বাহলগাৰ দেখে ধীৱা রাগ না কৰেন, তাৱা তাকে সানেৰ সহচৰী পেলে দুখিত হৰেন কেন? নারীদেহে সুইমিং কস্টিউমে দেখলৈ শক্ত হৰেন এ যুগে মাৰ্কিন সিনেমা দেখে ধীৱা ঢোক পাকিয়েছেন তাদেৰ মধ্যে নিচয়ই এমন কেউ নেই। ঘোষজ্ঞা প্ৰতিশ্ৰূতি রক্ষা কৰলেন। ঘৰিবাৰ পথে মোটৰ ধামালেন নিজামুন্দিনেৰ দৰজায়। দৰজা খুলে গেল ইতিহাসেৰ এক অনধীত অধ্যায়েৰ।

পাঠান সন্তুষ্ট আলাউদ্দিন খিলজী তৈৱী কৰেছিলেন একটি মসজিদ সেদিনকাৰ দিনিৰ এক প্রাপ্তে। তাৰ মৃত্যুৰ দীৰ্ঘকাল পৰে একদা এক ফকিৰ এলেন সেই মসজিদে। ফকিৰ নিজামুন্দিন আউলিয়া। স্থানটি তাৰ পছন্দ হলো। সেখানেই রয়ে গেলেন এই মহাপুৰুষ। ক্রমে প্ৰচাৰিত হলো তাৰ পুণ্যখ্যাতি। অনুৱাগী ভক্তসংখ্যা বেড়ে উঠল স্বত বেগে।

স্বামীৰ গ্ৰামেৰ জলাভাৱেৰ প্ৰতি দৃষ্টি আৰুষ্ট হলো তাৰ। মনুষ কৰলেন খনন কৰবেন একটি দীঘি যেখানে ত্ৰুভাৰ্ত পাবে জল, গ্ৰামেৰ বধূৱা ভাৱে ঘট এবং নামাজেৰ শৰ্বে প্ৰাক্কলন ধীৱা পৰিবৰ্ত হৰে মসজিদে আৰ্থনাকাৰীৰ দল। কিন্তু সকৰে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতৱাপে। উদীপ্ত হলো বাজৰোৱা। প্ৰবল পৱানাকৃষ্ণ সূলতান গিয়াসুন্দিন তোগলকেৰে বিৱৰিতভাৱে হলেন এক সামান্য ফকিৰ দেওয়ান নিজামুন্দিন আউলিয়া।

তোগলক রাজবংশেৰ প্ৰতিষ্ঠাতা গিয়াসুন্দিনেৰ পত্ৰগঠিয়া কৌলিনা-যুক্ত নয় ত্ৰীতদাসৱাপে তাৰ জীবন আৱৰ্ত্ত কৰলেন কুজন অপদাৰ্থ সূলতান, ধীৱা আপন অক্ষম শাসনেৰ ধীৱা দেশকে পৌছে দিল অৱাজৰকতাৰ প্ৰায় প্ৰাপ্তি সীমান্বয়। গিয়াসুন্দিন তখন পাঞ্জাবেৰ শাসনকৰ্তা। এমন সময় ধৰে ধীৱা নামক এক ধৰ্মত্যাগী অস্তৰ হিন্দু দখল কৰল দিনিৰ

সিহাসন। গিয়াসুন্দিন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলেন পাঞ্চাব থেকে দিল্লি, পরাজিত ও নিহত করলেন খসক খানকে, সঙ্গীরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাদশাহী তত্ত্ব।

গিয়াসুন্দিনের দৃঢ়তা ছিল শক্তি ছিল, রাজাশাসনের দক্ষতা ছিল। কিন্তু ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। একদা দায়িত্বানন্দী লোকের অসাধারণ রসনায় রটনা শোনা গেল গিয়াসুন্দিনের মৃত্যু। সুলতানের কাণেও পৌছল সে ডিউইন জনরব। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে সুলতান আদেশ করলেন তাঁর সিপাহসালারকে, “লোকে আমাকে মিথ্যা কবরস্থ করেছে, কাজেই আমি তাদের সভ্য কবরে পাঠাতে চাই।” অগমিত হতভাগের জীবনান্ত ঘটল নিয়ে। গোরহানে শব্দুক্ত পশ্চীম হলো মহোৎসব।

কিন্তু গিয়াসুন্দিনের বিক্রংগতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং তার আনুবন্ধিক হতাকাণ্ড ও লুঁটন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরস্তর বিভীষিক। গিয়াসুন্দিন তাঁদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্রন করলেন নৃতন নগর, তৈরি করলেন নগর যিনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং প্রাচীরাঘারে দুর্জয় দূর্গ। একদিকে ক্ষুস্ত পর্বত আর একদিকে প্রাচীর বেষ্টিত নগরী, মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়। বর্ধার দিনে শৈলশিখের থেকে ধারাস্ত্রোতে জল সঁষ্টিৎ হতো এই জলাশয়ে; সংবৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিত আংশস থাকতো প্রজাপুঁজের।

ফকির এবং সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর-নির্মাণ, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ উপলক্ষ করেই।

নিজামুন্দিন আউলিয়ার দীর্ঘ কাটাতে মজুর চাই প্রচুর। গিয়াসুন্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহজ সহজ। অথচ দিল্লিতে মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত, দু'জায়গায় প্রয়োজন মিঠানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বাদশাহ চাইবেন মজুরেরা আগে শেষ করবে তাঁর কাঙ্গ, ততক্ষণ অপেক্ষা করক ফকিরের খ্যরাতী খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্ধের, সেটা পরিমাপ করা যায়। ফকিরের জোর হস্তয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরিতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুন্দিনের তালাও। সুলতান হস্তান ছেড়ে বললেন,—‘তবে রে—’

কিন্তু তাঁর খনি আকাশে মিলাবার আগেই এতালা এল আশু কর্তব্যের। বাংলাদেশে বিশ্বেহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্য সাম্রাজ্য নিয়ে।

শাহজাহান মহসুদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজ্য-প্রতিভূরূপে। তিনি নিজামুন্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনন্দকূলে দিবাৰাত্রি খননের ফলে প্রহিতভূতী সম্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অনতিবিলম্বে। তোগলকবাদের নগর-প্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশ্যে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্তী। প্রমাদ গণনা করল নিজামুন্দিনের অনুরাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাঁদের নিরস্তর করলেন,—“দিল্লি দূর অস্ত্।” দিল্লি অনেক দূর।

প্রতাহ যোজন পথ অতিক্রম করেছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রতাহ ভক্তুর অনুময় করে ফকিরকে। প্রতাহ একই উত্তর দেন নিজামুন্দিন,—দিল্লি দূর অস্ত্।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিখ প্রশিয়েরা অনুনয় করল সম্যাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুন্দিনের ক্ষেত্রে এবং নিষ্ঠুরতা অবিদিত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তাঁর সে কথা কলনা করে তারা তায়ে শিউরে উঠল বারংবার। স্মিত হাসো সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বত্যাগী সম্যাসী,—“দিল্লি হনজ দূর অস্ত্।” দিল্লি এখনও অনেক দূর। হাতে জগের মালা ঘোরাতে জাগলেন নিষ্ঠিত ঔদাসীন্যে।

নগরপ্রাণে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহসুদ তৈরী করেছেন মহার্ঘ মণ্ডপ। কিংবা সামিয়ানা। জরীতে, জ্বরতে, ঝলমল। বাদ্যতাণ, লোকলশকর, আমীর ওমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তিযুদ্ধের প্রদর্শন-প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ইষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর । পরদিন গোধূলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভার্ধনা মণ্ডপে । প্রবেশ আলোচ্যসের মধ্যে আসন প্রাপ্ত করলেন । সিংহসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে । কিন্তু সে মহামুদ নয়, তাঁর অনুজ ।

তোজনান্তে অতি বিনয়াবন্ত কঠে মহামুদ অনুমতি প্রার্থনা করলেন সশ্রাট্টের । জাহাঙ্গীর হৃকুম হলে এবার হাতির কুচকাওয়াজ শুন হয়, ইতিযুথ নিম্নলুণ করবেন তিনি নিজে । গিয়াসুন্দিন অনুমোদন করলেন শ্মিতহস্যে ।

মহামুদ মণ্ডপ থেকে নিজান্ত হলেন মীর শাস্তি পদক্ষেপে ।

কড় কড় কড় কড় কড় ।

একটি হাতির শিরসঞ্চালনে হ্যানচুত হলো একটি স্তুতি । মুহূর্ত মধ্যে সশ্রাদ্ধে ভৃপতিত হলো সমগ্র মণ্ডপ ।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কাঠের থাম । চাপাপড়া মানুষের আর্ত কঠে বিশীর্ণ হলো অক্ষকার রাত্রির আকাশ । ধূলায় আচ্ছান্ন হলো দৃষ্টি । ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধারবান হস্তিযুধের গুরুভার পদতলে নিষিট হলো অগলিত হতভাগোর পল । এবং বিভাস্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উজ্জ্বারকীয়া ব্যর্থ অনুসর্কান করল বাদশাহের ।

পরদিন প্রাতে মণ্ডপের ডগফুল সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃক্ষ সুলতানের মৃতদেহ । যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত । বেধ করি আপন দেহের বর্ষে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর মেহাম্পদকে ।

সমস্ত ঐতিহ প্রৱৰ্য্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপৃত্র গিয়াসুন্দিনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটল নগরপ্রাণে । দিনি রাতে ত্রিকালের জন্য তাঁর জীৱিত পদক্ষেপের অঙ্গীত ।

দিনি দূর অস্ত । দিনি অনেক দূর ।

চার

নিজামুন্দিনের দরগায় প্রবেশ করে আজও প্রধানেই ঢোকে পড়ে আউলিয়া খনিত পুরুর । তাঁর পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশংসন চতুরে যাঁর মাঝখানে সমাধিষ্ঠ হয়েছে ফকিরের দেহ । সমাধির উপরে ও আশেপাশে হয়েছে সুশৃঙ্খ ভবন ও অলিম্প । উভয়কালে স্বার্গীয় সাজাহান সমাধির চারদিকে বিশেষ তৈরী করেছেন খেত পাথরের খিলান ; প্রাঞ্চ প্রেটিত করেছেন সুস্থ কারুকার্য-খচিত জালিকাটা পাথরের দেয়ালে । বিজীয় আকবর মৃচ্ছন করেছেন সমাধির উপরিত্ব গম্ভীর । ফকিরের পৃষ্ঠা নামের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে নিজেকে তাঁরা ধূম জ্বান করেছেন ।

গিয়াসুন্দিনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিমাট হৃষিস্তুপে পরিণত । বি বি সি আই রেলওয়ে লাইন গেছে তাঁর উপর দিয়ে । একজনের প্রস্তুতাবিহীন গবেষণায় এবং টুরিস্টের প্রত্যোগ্য হিসাবে আজ তাঁর গুরুত্ব নিজামুন্দিনের দরগায় আজও মেলা বলে প্রতি বছর । দূর-স্মৃতি থেকে প্রাণকারীরা আসে দর্শনাকারীকায় । সেদিনের রাজধানী তাঁর অবস্থার অভিক্ষেপ নিয়ে বহুদিন আগে মিলেছে ধূলায় ; দীন সর্যাসীর মহিয়া পুরুষানুক্রমে ভুক্তভুক্ত সশ্রদ্ধ অবসরের মধ্যে দিয়ে রয়েছে অঞ্জন । তাঁর আকর্ষণ ধূলকালে প্রসাৰিত ।

হিমুর অঙ্গিম অভিলাষ গুলামীরে দেহবৰ্কার ন্যায় শত শত বৰ্ষ ধৰে দিনির বিশুলালীয়া কামনা করেছেন আউলিয়ার কবরের নিকটে সমাধিষ্ঠ হতে, চেয়েছেন জীবনান্তে ‘মীর মজলীসে’র সারিখণ । তাই তাঁর আশেপাশে আছে সংখ্যাতীত আমীর ও মরাহের সমাধি । তাঁরই মধ্যে একটি গর্তে আছে কবি আমার খসরুর দেহবৰ্কশে ।

খসরুর প্রতিভা ছিল বিশ্বয়কর ; খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত । দিনির কবিগোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ । আলাউদ্দিন খিলজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তাঁর হস্ত্যাতা ছিল গভীর । আপন অনুগাম ছিলে প্রাণিত করে খিজির খানের সীরাজ-কাহিনীকে তিনি কালজীয়ী অমরত্ব দান করে গেছেন ।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে আর একনি কবি রয়েছে চিরনিতিত, হার রচনা আজও উর্দ্ধ সাহিত্যে অভ্যাতশক্ত। কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরহীন, সাধারণ প্রস্তর-বেদিকায় মাত্র আবৃত। উনবিংশ শতাব্দীর উর্দ্ধ সাহিত্য অঞ্জন রেখেছে তার স্মৃতি, কাব্যে ও গাথায়। জগতে বহু ঐর্ষ্যময় সৌধ রচিত হয় অক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে। কিন্তু কবিপরে ভার থাকে নিজ মেমোরিয়ালের।

হিন্দু যুগে কেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের। তার কারণ মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল কেবল। তাই শাশানে দালান খাড়া করে প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষম করার কথা কখনও তাদের মনে হয়নি। মৌর্যারাজদের আমল থেকে পৃথীরাজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাজা রাখেননি কোনো স্মৃতি-সৌধ। রাজপুত রাজন্যেরা গড়েননি কোনো এতমদৌলা, সফদারজঙ্গ বা হমায়ুন-স টুব। তারা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান, গোদান করেছেন ব্রাজকে। সমস্তই জগৎ-হিতায় অশোক যে স্তুত রচনা করেছিলেন, তা নিজ কীর্তি ঘোষণার জন্য নয়, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে। বৃষ্ট গড়েছিলেন তৈজ ও বিহার সভের জন্য, শক্ররাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্তচর মানসে।

সে যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমূর্তী ফুলের মতো তার ধ্যান কর্ম, চিষ্ঠা, ধান, ধারণা, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের নামে উর্ধ্বমুখী। ঐতিহ সম্পর্ককে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন কা তব কাঙ্গা কল্পে পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী? ময়াময়মিদ্য অবিলং বিশ্বমং। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং তপঃ, শামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, শ্রীকে হতে হয়েছে সহস্রমুণি। নারী যে সহমত্য হয়েছে তার কর্তৃ প্রেমের আকর্ষণে আর কর্তৃ পুঁজলোভবণে তা বলা শুক্ত। স্বয়ংবরা যাঁরা হয়েছেন, তারা প্রেমে পড়ে নয়। সংজুড়া পৃথীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তার খ্যাতি ও বৈভবের জন্য যেমন একালের তরুণীরা আর্দ্ধি পরিয়ে দেন আই। সি। এসের অঙ্গুলিতে।

মুসলমানেরাই আনল ভিত্তি জীবনার্থ। দৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তাদের নয়। তারা পরকালকে খোঝাই পরোয়া করল, ইহকালকে করল সর্বস্ব। তারা জীবনকে করল ভোগ, কাঁদল, কাঁদালো এবং ডাকোবাসল। তাই নারীর জন্য করল কৃষ্ণন, প্রেমের জন্য করল অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহ্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারণ ও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে? মেনে চলে নীতির অনুসাসন? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা? মহাভারতের অর্জুন করেছে? বৃন্দাবনের কানু করেছে? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেউক্স বা লেডি হ্যামিটন?

মুসলমানেরা প্রিয়তম প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পঞ্জীর এমন কি উপপঞ্জীর সমাধিতে। হিন্দু তপবী, তারা দিয়েছে বেল ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানের শুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হস্তয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অঙ্গীত; এই দুই নিয়েই হবে ভারত বর্ষাণ। একটিকে বাদ দিলেই পাকিস্তান,—মিট্টার মহামুদ আজি জিন্না না চাইলেও।

যাত্রাসচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি ক্ষুদ্র মর্মের সমাধির প্রতি। সেই সন্দাত্সুহিতা জাহানারার।

ইতিহাসে সন্তাট আলমগীরের শাসন বিধী নির্যাতনের দুরপনেয় কলক্ষে মলিন; সে-তথ্য সূলপাঠ্য পৃষ্ঠকে আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্যহীন অথচ অভিত-বিক্রম শোকা ন্যূতির জীবন যে দুটি বিশিষ্ট উপন্থত্ব বল্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘাস্মে অভিশপ্ত ছিল, সে-কথা যথেচিত বিদ্যত নয় জগতে।

জাহানারা ও জেবুমেসা দু'জনেই ছিলেন আওরঙ্গজেবের অতি নিকটতম আয়োজ্য। একজন অনুজ্ঞা, অপর জন আয়োজা, দু'জনেই ছিলেন রূপসী, দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ স্মৃতীক ও তেজস্বিনী। দু'জনেই চিরকুমারী এবং দু'জনেই জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে আওরঙ্গজেবের কারাগাহে।

কিন্তু আরও এক জ্ঞানগায় এই দুই দুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তারা দুজনেই ছিলেন কবি। মুঘল যুগের মহিলা কবি।

জ্ঞানানন্দার সমগ্র রচনা সহজে রক্ষিত হয়নি। গহন অরণ্যে প্রস্তুতিত পুল্পের মতো প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিতে হয়েছে বিলীন। দু'একটি মাত্র নির্দেশন আছে ইতৃষ্ণুত বিক্ষিণু।

জেবুম্বেসার কাব্যাখ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। 'জেব উ'-মুনশোয়াতে' সত্যিকার কাব্যাপ্রতিভাব চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পার্শ্বী কাব্যাখ্যাতি 'দিওয়ানে মখ্ফীর' রচয়িত্রীরাগেও জেবুম্বেসার উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থে, যদিও পণ্ডিতেরা সম্প্রতি সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানানন্দা আমাকে আকৃষ্ট করেছেন শৈশব থেকে। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্বকলে সন তারিখে কন্টাকাকীর্ণ মুঘল কাহিনী কঠিন করার দুজন প্রায়স করতেম প্রাণগণে দীর্ঘবারিব্রাতী। চুম্বে চোখের পাতা আসতো জড়িয়ে, দেহ হত অলস, মাথা বিমিয়ে পড়তো ঢুলুনিতে। এরই মধ্যে জ্ঞানানন্দার উপাখ্যান পড়ে করন্নায় আঁচ করার চেষ্টা করতেম তাঁর চেহারা।

প্রথম যৌবনে জ্ঞানানন্দা বাদশাহ-বেগমের মর্যাদা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমায়। হারেমে করেছেন একাধিপত্য। অপ্রতিহত অনুগ্রহ ও শাসন বিতরণ করেছেন দুই হস্তে। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়তরা। তাঁর জন্য সপ্তাহ তৈরি করেছিলেন দিল্লির জুম্বা মসজিদ, তারতের বৃহত্তম মুসলিম ভজনালয়।

জ্ঞানানন্দার সেইভাজন ছিলেন এক বাঁদী। অতর্কিংতে একদিন আগুন লাগল তাঁর বসনে। সে আগুন নেতাতে গিয়ে শাহজাদী নিজে দক্ষ হলেন সাংঘাতিকরণে। রাজ্যের নামা জ্ঞানগা থেকে এল হাকিম, হলো নানারকম এলাজ। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সপ্তাহনিম্বীর জীবন সংশয় দেখা দিল।

বিচিত্রিত সাজাহান এন্টালা দিলেন এক সাহেব চিকিৎসককে। গ্যারিয়েল বাউটেন। সুরাটে ইংরেজ কুঠির ডাক্তার। বাউটেন বললেন, ওষুধ দিতে হলে রোগিনীকে চোখে দেখা চাই। শুনে সভাসদরা হতবাক হলেন। বলে কি বেয়াদব! শাহানশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না কম্বক্ষ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃরেহে জয়লাভ করল সামাজিক প্রধার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটেনের প্রস্তাবে। অলঙ্কার মধ্যে আরোগ্যলাভ করলেন জ্ঞানানন্দা। তাঁর অনুরোধে সাজাহান বাউটেনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে।

আচুম্বিত কুর্নিশ করে বাউটেন বললেন, নিজের জন্য কিছুই চাইনে। কলকাতার একশ' চারিশ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংরেজের কুঠি নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করি একটুকরো ভূমিখণ্ড। ইংরেজকে দান করুন এসেশে বিনা শুষ্ক বাণিজ্যের অধিকার।

বাউটেনের প্রার্থনা মেরুর হলো। হজারিভুতৈতেবগার এত বড় দৃষ্টিস্ত আর একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডেউল কাইম ভাইজমানের।

উনিশ শ' খোল সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সংকটেনক কাল, ইংল্যেন বিফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান আসিস্টেনের অভাব, তখন কৃতিম আসিস্টেন তৈরীর ভাব নিলেন মাঝেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন, প্রফেসর, সমগ্র ভিট্টেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা বিফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।

অধ্যাপক বললেন, তথাক্ত।

দিবারাত্রি অবিভ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিক্ষার করলেন কৃতিম আসিস্টেন। পরাজয়ের হাত থেকে বক্স করলেন ভিট্টেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বজ্ঞেষ্ঠ পুরস্কার।

ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে।

লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ারেজ? অর্থ?

'কিছু নয়। একটি মাত্র জ্ঞান আছে আমার। আমার প্রজ্ঞতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ, ইংল্যান্ডের নাশনাল হোম।'

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইংরাজীদের জন্য প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসভ্রান্তি। অবশ্য কাগজেপত্রে। আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না ইংরাজীদের। বরং ইদানীং কনসার্ভেটিভরা প্যালেস্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছে সুয়োরানী, যখন আজ্ঞা ইংরেজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে। কৃতজ্ঞতা কথাটা আছে ইংরেজের ভাষায়, নেই ইংরেজের চরিত্রে।

জাহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরামুগ্ধ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ডিপ্তি শাপনা করলেন সকলের অঙ্কে। সেই জাহানারার চরিত্রে কলম আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতো বিস্মিত হইলে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেশনে স্টাফের্ডশায়ারে বাড়ি ইঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিম্ন করেন সবচেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শক্তি, কারণ তার জন্ম গোরখপুরে।

জাহানারার জীবনবন্ধুটার শেষ দৃশ্যগুলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন পিতার সর্বাপেক্ষা গ্রীতিভাজন। কিন্তু তার অনুরক্তি ছিল স্বীকৃত ধর্ম। সেটা মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তার কারণ নয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদে সুজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে বশনা হলেন দিল্লি অভিযুক্ত। বারাণসীর যুক্তে দারা তাকে করলেন পরাজিত। আওরঙ্গজেব তখন মোরাদকে বললেন, এ ছলনা চাতুরীময় পৃথিবীর কোনো কিছুতেই লোভ নেই তার। তারা দুর্জনে মিলে দারাকে পরাজিত করলে সাজাহান যদি পরলোকগত হন—আল্লার দোয়ায় তিনি যেন সেরে ওঠেন—তবে দিল্লির সিংহসন হবে তার অর্থাৎ মোরাদের। মদপ মোরাদের প্রতীক হলো এই আশ্বাসে। দ্রঃ... পরিজিত হয়ে পলায়ন করলেন পাঞ্জাবে, এক উৎসব রজনীর অবসানে সুরামত মোরাদ হলো বশী, আওরঙ্গজেব নিজেকে ঘোষণ করলেন সন্ত্রাটোরাপে। পিতা সাজাহানকে কয়েদ করে আবক্ষ করলেন আগ্রা দূর্গের এক কুসুম প্রকোটে।

আওরঙ্গজেবের জাহানারাকে দিতে চেয়েছিলেন বাদশাহ-বেগমের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান করলেন সে অনুরোধ। বেছায় বরণ করলেন সাজাহানের সহ-বন্দীত। পিতার পরিচয়ার জন্য। চতুর্দিশে ক্রুর প্রবণতা, সীমাহীন বিশ্বাসাত্মকতার ঘন অঙ্গকারের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা রাইলেন অচল, অটল, অকল্পিত দীপশিখার মতো দীপ্তিময়। সাজাহানের দ্বিতীয় কল্যাণ রোশেনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিলেন, হলেন তার প্রিয়পত্নী। দিল্লির সিভিল লাইনসে আছে তার উদ্যান। সেখানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে রোশেনাৰা ক্লাব, দিল্লির মাটিকার্লো। দশ টাকা পয়েন্টে টেকে ব্রিজ খেলার খ্যাতি আছে তার উদ্যন্ত ভারতে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড় ঝাতু। গ্রীষ্ম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভঙ্গন আছতি নিয়ে। বর্ষার মেষকক্ষজ দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে। বর্ণমূর্খের রাত্রির বিদ্যুৎ চমকে উৎফুল ভবনশিখীরা ন্যূ করে প্রসাদের মর্মর অলিন্দে। শব্দের আলো-ছায়া বিজড়িত প্রভাতে নদীতীরে কাশের বনের শাখে দোলা। হেমস্ত আনে কুহেল; শীত দেয় হতাহাস। বসন্তে খুলের মঞ্জরী আদোলিত হয় শিয়াবীর শাখা প্রশাখায়। আগাম প্রাসাদ প্রাচীরের অস্তরালে জাহানারার বশী জীবনে একটি করে বৎসর হয় বৰ্জি, আয় থেকে খসে পড়ে একটি করে বছর। কমহীন অবসরে শাহজাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।

একদা নিমীথকালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সাজাহানের কাছে এসে পৌছল একটি সুদৃশ্য মোড়ক। পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে উপহার। তবে কি অনুভূত পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার প্রথম নিষর্জন? ধার্হকলিপ্ত হলে বৃক্ষ সাজাহান খুলেনে মোড়ক। পরতের পর পরত। খুলতে খুলতে শেষকালে শাত থেকে গড়িয়ে পড়ল সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারাশিকোর খণ্ডিত মৃগ। সপ্রাট মুছিত হয়ে পড়লেন জাহানারার অক্তে।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাহানারা রাইলেন তার পাশে। ছবির পিতার পরিচয়া করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্যে। তার মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লিতে।

অবশ্যে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শাস্ত্রশীতল ক্ষেত্রে মৃক্তি লাভ করলেন বদ্বিনী। তারই ইচ্ছায় তার দেহ সমাধিত্ত হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে। সে সমাধির

উপরে না মইল মণ্ডপ, না মইল আজ্ঞানন, না মইল ধৈর্যের দেশব্যাপ্তি আভাস। তখু ভাইরই
স্বচ্ছত একটি কবিতা উৎকীৰ্ণ হলো তাৰ গায়ে,—

“বেগোয়ৰ সবজা না পোশাদ কলে মাজাৰে মায়া
কে কৰৱ শোবে গড়িবান হামিল্ শিয়াহ বস্তু।

“একমাত্ৰ ঘাস ছাড়া আৱ যেম কিছু না থাকে আমাৰ সমাবিষ উপৰে। আৱাৰ যতো দীন
অভজনেৰ সেই তো হোষ্ট আজ্ঞান।”

পূজ্যোক নিজামুদ্দিন আউদিয়াৰ অনুগামী সাজাহান দুহিতা নছৰ জাহানয়াৰ এই তো যোগা
সমাধি।

আমৰ সজ্জামাত্ৰ নিষ্ঠকভায় শ্রীকান্ত চিত্তে, সামনে ধাসে দীড়ালেয় আমৰা তিনি সৰ্বাবী। কামো
মুখে ছিল না কথা, কিন্তু মনে ছিল ভাৱ।

নব শায় দৰ্বাদল ছেয়ে আছে সুত নিৰলজাৰ সমাৰি। নিৰল নীল আকাশ থেকে ঝাঁকাই লিপীয়ে
সঞ্চিত হয় মিলু মিলু শিখিৰ, প্ৰাতাতে শৰ্প কৱে তৰণ অৱশ্যেৰ প্ৰথম কিমু রেখা, সজ্জাম ছাড়ায়ে
পড়ে পোধুসি আলোকেৰ সেনাবী আভা। তাৰা কি পায় শতাবিক বৰ্ষ পূৰ্বে সমাবিষ সেই অজ্ঞেৰ
অলিত সুযাস? পায় তাৰ সুনুমার বক্ষেৰ বীচে ভঙ্গিত হৃদয়েৰ মনু স্কুলক ধৰিব?

শাঁচ

প্ৰাতাতেৰ সবচেয়ে বড় সেজেশন। চৰনীয়া একটি সংবাদলত্ত্বে বেগিয়াছে কীলস প্ৰাতাবেৰ সবৰ্যম।
মিজন্স সংবাদদাতাৰ বিশ্বস্ত্যে পাওয়া বিবৰণ। শোনা গোল, গৰ্ভাবেন্ট বিচলিত হয়েছে এ সংবাদ
প্ৰকাশ। গোমেলা বিভাগেৰ বড় কৰ্তৃতা কল্পনা কৰেছেন সংবাদেৰ সূত্ৰ সল্পকৰে।

সাম্বাদিক মহলে উডেজনারা সৃষ্টি হলো। কৰকম প্ৰস্তাৱপুলিস কিছুটা আচ আমৰা সবাই
শোয়েছিলো গত ক'দিন থকেই। একাশ কৰা হয়নি, কেল্টিম্যানস বায়ীমেট অৱশ কৰে। ইহুৱেজ
ও আমেরিকাম সহ-সংবাদদাতাৰা অনুমান কৰলৈন, ভাইসেন্যাস কাউলিলেৰ কোন যোহানা
সলালোৱ বছু পুৰুষে বেগিয়াছে এ বক্তৰ।

জনস্মৃতি এই যে, কীলস যে-সিম একদম, কোন সাড়ে বাবোটা থেকে অনাহাৰে ভাইসেন্যাস
হাস্তে হীম অস্তাৰ্থসৰণ কৰা অল্পেকা কৰেছিলৈন এই যোহানীয়া সমস্যাগুল। বেলা দুটোৱ একদেশ
কীলস। লচ্ছ চিনিয়ায়ো আজাপ কৰিয়ে লিজেন হীম সকলে সামিলী দণ্ডযোগান বিজ সহকৰীযোগে।
কীলস কৰৰ্যমন কৰলৈন সবৰাৰ সকলে, মিহানজ কষ্টে আবৃত্তি কৰলৈন, “হাউ দু ইউ দু ?” বিজীয়া
বায়া উচ্চারণ না কৰা সুনুর্তে আছাইত হৈলৈন আপৰ নিষিট কৰে।

তাৰ আশা বাহুচৰ্জিতেন সেজেশনেৰ সকলে বাবাতেৰ পূৰ্বে কীলস হীম প্ৰত্যাব আলোচনা কৰাবেল
তাদেৰ সকলে, আলতে ভাইসেন্যাস হীমৰ অভিমত। সেকিম লিয়েও হত্তাৰ হৈলৈন। কীলস প্ৰাতাবেৰ
সবৰ্যম অনুমানটি বৰ্তীল হীমেৰ কাছে। আলৰ্য বাৰ যে, হীমা কুৰা হৈলৈন। একৰিকিউটিভ
কাউলিলেৰ হৈলোৱ, হীমাম হোৱ, মালুমেৰ পৰীক তো। শোনা যাবা, অল্পেৱে ভাইসেন্যাসেৰ সুপারিশে
বিগত বাবে বাটি প্ৰাতালে অনুষ্ঠিত এক জোৱা-সভায় কীলস হীম প্ৰত্যাবেল চৰক জানিয়েছেল
তাদেৰ। আজুই প্ৰাতাতে সংবাদলত্ত্বে উল্লেখী মিজন্স মিল্পোটাকেৰ জৰানীতে ঘটল তাৰ প্ৰকাশ।
মৃম বায়া যদি শৰ্পজোৱ বৰি অনুমান কৰা কল্পন হয়, তবে বিজীয়ী সংবাদদাতাদেৰ সম্মেহ একেবৰেৰ
অগ্ৰহ্য কৰা কঢ়িব।

সংবাদ ‘সুন্দৰ’ কৰাৰ অধিকাৰ সাম্বাদিকেৰ আছে। কিন্তু তাৰও একটা অঙ্গীকৃত যাজা আছে।
জাতিৰ বা দেশোৱ কৃতজ্ঞ ব্যৱানে জড়িত, সেখালো সাম্বাদিকেৰ আপৰ বিকেৰ সেকলৰ কৰে
তাৰ কথি। এডোয়ার্ড সি এইচট্ৰুথেৰ বাজা তাগেৰ ঘটনা মনে পড়ছে সুস্থিতি। যে মাস থেকে
ক্লিটেলেৰ সকল সংবাদলত্ত্ব জৰানতো সিল্পনন্দ-এডোয়ার্ড প্ৰায় কাহিনী। কীট কীটে কলাধূৰ্যা

তনেছেন অনেকেই। কেউ প্রকাশ করেনি মুদ্রিতাকরে। সরকারী দপ্তরের কোনো অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোনো আইনগত বাধা। একদিন আমানীর বিবরে সেকেও হট হবে। কোথায়, কোনখনে করবে মিডিশিপ্স আক্রমণ সে-তথ্য জানা হবত সত্ত্ব হতে পারে সুয়ার্ট গেল্টার বা ড্রু পিয়ার্সেরে। ঠারা কদাচ প্রকাশ করবেন না সে সবোস, বরিং ট্রীপস্ প্রস্তাবের চাইতে সে কম বড় 'স্কুপ' নয়।

সকল প্রমের বড় প্রথম সততার। ট্রীপস্ আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভারতের কল্যাণের নামে। আমরা সবাই সম্মতি দিয়েছিলেন বিন্যু প্রতিবাদে। পূর্ব প্রকাশের স্বারা এই ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ করলেন সে প্রতিক্রিতি। তাই লজ্জিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়েরা। জেন্টলম্যানরা যদি জানলিস্ট হতে পারেন, জানলিস্টরা জেন্টলম্যান হতে পারবেন না কেন?

ভাইসরয়'স হাউস থেকে ক্রীপস্ এসেছেন তিনি নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার এগুক ক্লো-র বাংলোয়। ক্লো আসামের আগামী গভর্নর। গদি দৰখনের আগে দু'মাসের ছুটি নির্যে গেছেন মুসৌরী না আলমোড়ায়, বিশ্বাম মানসে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারদের বাড়িগুলি সরকারী। সুদৃশ্য। একতলা দালান। ইষৎ পীতাম্ব রং; সামনে অতিভিত্তি অঙ্গন। এত বড় যে দু'দিকে গোলপোস্ট খাড়া করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গেলের ম্যাচ খেলা যায়। সবুজ ঘাস, লন-মৌর দিয়ে পরিপাটি হাঁটা। মাঝখনে বৃক্ষাকার ফুলের কেরারী। তাকে বেঠন করে টকটকে সাল সুরক্ষিত রাস্তা; মোটর দ্বোরাতে বেগ পেতে হয় না এতুকুও। ফটকের গায়ে একগালে কাচের উপরে বড় হয়ে লেখা বাড়ির নম্বর। কাচের একদিকে ছোট একটু খুপরি। বাতিলেৰায় তাতে লঠন ছেলে রাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ির নম্বরটা চেখে পড়ে। দালানের সমূখে পোর্ট, তার মীচে গাড়ি দীড়ায়। বারাদ্দার দু'পাশে দুটি ছেট কুঠুরী। সেখানে অনারেবল মেষারের সেক্টোরী ও স্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

হ্যাঁ একই ধরনের ছাঁটি বাড়ি। সেক্টোরিয়েটের সুমুখ থেকে দুই বাহুর মতো দু'দিকে প্রসারিত দুটি বাস্তা—কিং এডোয়ার্ড ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের উপরে। যেন ছাঁটি যমজ ভাই, ডিয়োনি কুইন্টেন্টেসের দোসর।

আতিশয়ের স্বার অভ্যন্ত ভালো জিনিসকেও যে কতখানি হাসাকর করে তোলা যায় তার দৃষ্টিক্ষণ আছে নয়াদিনীর নগরপরিকল্পনায়। মুনিফিমিটির বাতিকে পাওয়া হ্যাপ্টিকা শহরটাকে ত্রী দিতে গিয়ে হাঁচ দিয়েছেন, বাড়ি দিতে গিয়ে ব্যারাক। বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে মলগত ঐক্য প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। গজ, ফুট বা ইঞ্চিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের নাম নকলনবিলি। প্রথমটা যিনি করেন তাকে বলি বুকা, বিড়িয়াটা যিনি করেন তার নাম বিশ্বকর্মা। প্রথমটার মধ্যে আছে আর্ট, পরেটার মধ্যে আছে ক্রাফট।

প্রাকালে নগর-পান্তনের গোড়াতে ছিল ন্পতি। রাজাৰ অবহিতি ও অভিক্রিচি অনুসরণ করে গড়ে উঠতো জনপদ, তার প্রাসাদকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহেরো তুলতো সৌধ, সাধারণেৰা বাধতো বাসা, প্রেক্ষিয়া সাজাতো বিপশি। রাজশাহিস্ব পতন অভ্যন্তরের সঙ্গে রাজধানীৰ ভাগ্যে এসেছে বিশ্বর্য, নগর নগৰীৰ ঘটচে বিলুপ্তি বা বৃক্ষি। আগা, আওরঙ্গবাদ ও ফতেপুর সিঙ্কিতে আজও রয়েছে তাৰ নির্ভুল বিদৰ্শন।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদম বেশী। সেউ ভাজারের স্বামীৰ মতো রাজার মহিমাও এখন আৰ আপন বীৰ্যবন্ধু নয়, প্রজাদেৱ বাণিজ্য-বিস্তাৱে। শুধু ভাৱতবৰ্তে নয়, অন্য দেশেও এখন বণিকেৰ মানদণ্ড পোহালে শৰীৰী দেখা দেয় রাজদণ্ডপো—কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে। তাই এ-যুগেৰ মহানগৰীৰ center of gravity থাকে ক্লাইভ স্ট্রীটে বা হলবি রোডে। তাদেৱ প্ৰেৱণার মূল চেষ্টাৰ অব প্ৰিলেস নয়, চেষ্টাৰ অব কমাৰ্স। তাই ওয়াশিংটনেৰ চাইতে নিউইয়র্কেৰ শুৰুত হয় বেশী, লক্ষ্মীকে ছাপিয়ে ওঠে কানপুৰ, পটুনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় টাটানগৰ।

আধুনিক ভারতবর্ষে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে স্টক এরচেলের পড়ত নেই। সেখানে বৈশ্য নেই। ব্রাহ্মণও না। আছে শুধু ক্ষত্রিয়। অবশ্য তাদেরও আয়ুগের পরিবর্তন ঘটেছে। মডার্ন ক্ষত্রিয়েরা অসিজীবী নয়, মসিজীবী। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা বৃহৎ রচনা করে হাত পাকিয়েছিলেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই ক্রমাগতিক। আধুনিক ক্ষত্রিয়েরা ফাইল হেটে হেটে হাত এবং চুল দুই-ই পাকিয়ে দেন, তারও নির্দেশ হলো *precedent*। সুতরাং নয়াদিল্লীর পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর সব কিছুই পিছনে আছে কেবলই এক রকম হওয়ার প্রয়াস। সোকান-পাট থেকে শুরু করে রাস্তা, পার্ক, কোয়ার্টৰ, মায় পথের পাশে জামগাছের সারি পর্যন্ত সব কিছুই যেন খাকী কোর্টা-পরা পটনের মতো সঙ্গীন উচিয়ে এটেনশনের ভঙিতে খাড়া দাঢ়িয়ে আছে।

নতুন আনন্দায় ক্রীপসের সভা বসন পাত্র-মিঠি নিয়ে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক কৃপল্যাণ্ড, এবং ক্যানাডার সমাজজন্তী গ্রেহাম প্রাই আছেন তাঁর দপ্তরে।

কৃপল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লভনের এক বিতর্ক-সভায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য আছে যথেষ্ট, শুদ্ধার্থ আছে কিনা জানিনে।

ক্রীপসের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন মৌলানা আজাদ, গাজীজি, পশ্চিত নেহুন-ও মিস্টার জিয়া। আজাদের সঙ্গে মোভারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর একজন-কংগ্রেসী মুসলমান। ব্যারিস্টার মিস্টার আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশ, কর্মসূন্ধান দিল্লী, খন্দরবাড়ি বাংলায়। তাঁর শ্রী অরুণ আসফ আলীর পৈতৃক উপাধি ছিল গাঙ্গুলী, অঙ্গ নিকট আঞ্চলিয় সম্পর্ক আছে রয়েছেনাথের কল্যাণ মীরাদেবীর সঙ্গে।

পশ্চিত জওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই মতো বহুবিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর তৃত্য ইংরেজী রচনাকুশলী বড় বেশী নেই, একথা স্থীকার করেছেন বহু ইংরেজ সমালোচক। গাজীজির ইংরেজী জওহরলালের ন্যায় সাহিত্যপ্রধান নয় কিন্তু তাঁর স্বচ্ছতা ও অলঙ্কারহীন মাধুর্য বহুক্ষেত্রে বাইবেলের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিস্টার জিয়া ছিলেন প্রতিষ্ঠিত্যশা ব্যাবহারজীবী। ইংরেজীতে সওয়ালে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। ক্রীপসের সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ করেছেন—ক্রীপসের ভাষায় নয় নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয় উর্দ্ধভূতে। যদিও কাজ চালাবার গত ইংরেজী তিনি জানেন বলে জনশ্রুতি শুনেছি বহু বার। মৌলিকতা আছে মৌলানার। তাঁর জয় হোক।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়, কিন্তু ইংরেজী আমাদের শিখতে হয়। তাতে ক্ষোভ নেই। হয়ত লাভই আছে। স্বাজ্ঞাতিকতার আধুনিক ধারণা, ইংরেজীতে যাকে বলে ন্যায়ব্যালাইজেশন, তাঁর বেশীটা আমরা পেয়েছি ইংরেজী শিকার ফলে। কিন্তু এদেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মকুলতার মাপকাটিও দাঢ়িয়েছে ইংরেজী বলা ও দেখাব কৃতিত্বে। এটা হাস্যকর। কলেজে পরীক্ষার খাতায় যে-ছেলে ভালো ইংরেজী লেখে, চাকুরির বাজার থেকে বিবাহবোগ্য কন্যার উদ্বিধা জননী পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর আদর আছে। এ-দেশের নেতৃদের সম্পর্কেও তাই বিদ্যুলি পর্যটকেরা যখন বলেন যে he speaks faultless English আমরা তখন আনন্দে গলগল হাই। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা সতেজ প্রতিবাদ আছে মৌলানা আজাদের আচরণে। ক্রীপসই হোন, ভাইসরয়ই হোন, কিংবা স্বয়ং জর্জ বি ফিফথই হোন, যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভাষা না বলতে চান ব্যান পারেন তবে আমিই ব্যান তাঁর ভাষা বলতে যাব কেন? সাবাস!

গাজীজি ক্রীপসের কক্ষ থেকে নিন্দাত্ব হলেন প্রায় তিনি ষষ্ঠী পর্যটকেরা যখন বলেন যে অবধি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্রীপস। মুহূর্তমধ্যে সাংবাদিকেরা চক্রবৃহৎ রচনা করলেন তাঁকে ঘিরে। তোধে তাঁদের জিজ্ঞাসা, মুখে তাঁদের আগ্রহ, উপস্থিতিনা ও উঠেগের ছাপ। স্মিথহাস্য উহুলে জনতাকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বিনাবাক্যে নিরস্ত করলেন বহু উদ্যত প্রশ্ন।

ক্রীপসের রসবোধ আছে। রহস্য করে বললেন, গাজীজির হাসি মেখে সাংবাদিকরা যেন ক্রীপস প্রস্তাবের গুণ বিচার না করেন। ঘর থেকে বেরোবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি গাজীজিকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রবল হাস্যধর্মি উদ্বিত হলো এই কৌতুকালাপে।

কিন্তু কাশীর পাণ্ডা, বিয়ের ঘটক এবং ধীমার দালালের চাইতেও নাহোড়বান্দা আছে জগতে।

তার নাম রিপোর্টার। গাজীজির আলোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তারা। অঙ্গুলিনির্দেশে ক্রীপসকে দেখিয়ে উভয় করলেন মহাশ্বা, “ওকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছু বলা নেই।”

“প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক ?” প্রশ্ন করলেন এক খানু সাংবাদিক।

“You naughty boy” বলে প্রসম হাসে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোটরে উঠে যুক্ত করে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে। প্রস্থান করলেন বিড়লা ভবনোদ্দেশে।

ইনফরমেশন বিভাগের ক্যাম্প হয়েছে পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, সাংবাদিকদের সুবিধার্থে। সেখানে হানা দিছি আমরা রিপোর্টারের দল প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে, বিকালে ও সন্ধিয় অভিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন তার বেটী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান থেকে।

ক্যাম্প আপিসের কর্তা জগদীশ নটরাজন, ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার এর প্রতিষ্ঠাতা বৰ্ষের বিখ্যাত সাংবাদিক কে-এস- নটরাজনের পুত্র। পাইওনীয়রের সম্পাদকগোষ্ঠী থেকে এসেছেন গর্ভন্তমেটে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য জানেন অনেক, ইংরেজী বলেন বছদ্দে, উচ্চারণে নেই তামিলজনোচিত ধ্বনিবিকৃতি। একদিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তার গৃহে।

নটরাজন গৃহিণী মাঝাজী নন,—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তার পিতৃকুল বৃক্ষ পরিবারের খ্যাতি আছে টেনিস খেলায়, মাতৃকুলের মূল অনুসন্ধান করা যায় বঙ্গদেশে। তার মাতামহী ব্যানাজী-কন্না ছিলেন, সে হিসাবে বলাল সেনের সৃষ্টি কোলীন্যে দাবী আছে। পিয়ানো বাজাতে পারেন চমৎকার।

আধুনিক অনেক প্রগতিশীল বাঙালী পরিবারেও ভারতীয় রূপটি খুব স্পষ্ট নয়। গৃহের কর্তা হয়তো বিদ্যুর্জন করেছেন বিদেশে। অর্কফোর্ড ইংরেজী, প্লাসগোতে এঞ্জিনিয়ারিং, এডিনবৰায় ডাক্ষণ্যী বা লিফসন্স ইনে ব্যারিস্টারী পড়ে দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কর্মজীবনে, অর্থার্জন করেছেন অজস্র ধারে। তাদের বসনে স্যুট, অশনে সুপ এবং আসনে কৌচ। তাদের গৃহিণীরা পাটি দেয়, ক্রাবে যায়, তিজ খেলে পুরুষ বস্তুবান্ধবদের সঙ্গে অসঙ্গোচে। সে গৃহে চাকরেরা বয়, মায়েরা মেসদাৰ, এবং মেয়েরা মিসিবাবা।

বিলাতে না গিয়ে থারা সাহেব, তারা আরও দুর্ধৰ্ষ। কংগ্রেস থেকে লীগে যোগ দেওয়া মুসলমানের মতো, হিরোডকে করেন আউটিহিরোড। প্লিং পায়জামা না পরে ঘুমানো বা ছুরিকাটা দিয়ে না খাওয়াকে তারা প্রায় মধ্যযুগের গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন বা সতীদাহের ন্যায় রোমহৰ্ষক বৰ্বরতা জ্ঞান করে থাকেন।

তবুও একথা মানতে হবে যে, ইংরেজ অথবা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিয়ে করে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মূল থেকে যেমন নিঃশেষে উৎপাটিত হই এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙালী গৃহিণীরা যতই চুল খাটো করুক, গিমলেট গিলুক, রং করা ঠোঁটের মধ্যে জুলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিস্তী উচ্চারণে ভুল ইংরেজী বলুক, সংস্কার থাকে Coly বা ম্যাকসফ্যাক্ট্র-ঘৰা চামড়ার তলায়। রক্তে থাকে ঠাকুরমা দিস্মাদের অঞ্জিকাসের রেড কর্পাস। তাই মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করতে খোজ পড়ে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার, স্বামীর অসুথে লুকিয়ে মানত করেন সুবচনীর, ছেলের কল্যাণ কামনায় স্বষ্টির দিনে থাকেন উপোস। পুরুষেরা হোটেলে যতই থান স্টেক বা ভিল, মা-বাৰার আজু করেন শুরু পুরোহিত ডাকিয়ে যথারীতি।

সব চেয়ে দুর্ভাগ্য ভারতীয় ও যুরোপীয় জনক-জননীর সন্তানেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচ্ছৃত, মাতার সমাজ দ্বারা বর্জিত। তারা না ভারতবৰ্বরে, না ইংলণ্ডের। কোন দেশের প্রতি তাদের দেশাস্থবোধ জাগবে, কোন জাতির প্রতি মমস্থবোধে ? তারা বাবার কাছে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছে থেকে পাবে গায়ের রং, কার কাছ থেকে পাবে মনোভাব ? তারা সজিত্বহীন বৰ্ণসঙ্কর, শুধু জন্মে নয়, আকৃতিতেও ও প্রকৃতিতে। ভারতীয়-যুরোপীয় বিবাহজ্ঞাত সন্তানেরা আজু পর্যন্ত হয়নি কেনো উচু দরের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের দৌড় বড় জোরে রেলের বড় সাহেব নয় তো টেলিগ্রাফের ডি঱েক্টর।

যুরোপের সমাজ অনেকটা সার্বজনীন। ইংলণ্ড থেকে ইটালী পর্যন্ত যোটামূটি ভাস একই রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেরিয়ানের প্রায় একই বেশ, একই পরিবেশ, একই আচার-আচরণ। সমগ্র যুরোপে লোক-ক্রেকফাস্ট, লাঙ্ক, ডিনার ও সাপারে বসে ঘড়ি ধরে, খায় চুরি কাঠায়। ধিয়েটারে যায় শনিবারে রাত্রে, গিঞ্জাম জানুপেতে ভজন করে রাবিবারে। ভাবার বিষেদ ছাড়া যুরোপের এক প্রাণ্ত থেকে আর এক প্রাণ্তে সামাজিক মিল আছে সর্বত্র। লভনের ইংরেজ স্বামীর অঙ্গুয়ান ঝীৱে দেখেছি অন্য আর পাঁচজন ইংরেজ গৃহিণীর মতো অন্যান্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তার গৃহের সঙ্গে অন্য আর পাঁচটি ইংরেজ পরিবারের নেই তফাত। ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠে ঠিক অন্য আর পাঁচটি ডিক, পল বা হ্যারিংটন পুরুষ-কন্যার মতো।

অবশ্য সমস্যা যে একেবারে নেই, তা নয়। সে সমস্যা প্রাতিষ্ঠিক জীবনে প্রত্যক্ষগোচর নয় কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্বামী-ঝীৱের মনে। যেমন লর্ডসে টেস্ট ম্যাচের সময় কোন পক্ষের প্রাপেজ লাভ কামনা করবে ইংরেজ স্বামী আর অঙ্গুয়ান ঝীৱী? মহাযুদ্ধে কার জয়লাভে উৎযুগ হবে জার্মান মিটোর, কোন পক্ষের পরাজয়ে মুহামান হবেন তার রাশিয়ান মিসেস?

তবুও দূর ভবিষ্যতে কোন দিন যুনাইটেড স্টেট্স অব যুরোপ যদি গড়ে উঠে, যদি সংজ্ঞ হয় এক কথ্য ভাষা, তবে কজন্মা করা কঠিন নয় যুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর বৈবাহিক যোগাযোগ। তখন স্পেনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নরওয়ের তরুণী ঠিক যেমন এখন করে স্বচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোঞ্গোরের কলেকে ঘৰে নিয়ে আসে বরিশালের বৰ।

ভারতীয় ও যুরোপীয় জীবনের মর্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একাব্দীর্তা পরিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাজ কেবল ব্যক্তি ও তার স্তুপ্রের মধ্যেই নিবন্ধ নয়। বহু আবার্য-পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত্ব এবং সম্পর্কের ধারা তার প্রভাব ও ক্ষেত্র দুরপ্রসারিত। তাই পূর্ব পশ্চিমের বৈবাহিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন সুখের হওয়া হয়তো বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু তা আরা কোনোকালে ঘটবে না দুই মহাদেশের সামাজিক মিলন। যুরোপের ঝীলোক মাত্রই আমাদের পক্ষে পর্যবৃী।

নটরাজনের ডোজ সভায় পরিচয় ঘটল এক মারাঠি আজগের সঙ্গে। বয়স চালিশের অনেক উপরে, মাথায় কালোর চাইতে সাদাৰ ছোপ বেলী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশংসন লসাট, উৱত নাসা। সব চেয়ে আশ্চর্য তাঁর ঢোখ দুটি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুরের আৰু ভারতীয় চিকিৎসার অর্জুনের মতো। তাতে অপরিসীম ঝুঁটিৰ ছাপ। দৃষ্টিতে যুক্তিৰ দীপ্তি আছে বটে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে আষাঢ়ের জলভারনত ঘনমেঝের মতো কালো গঢ়ীৰ ছাপ। সাধারণতঃ ঢোখে পড়ে না পুৰুৱের এমন অসাধারণ ঢোখ।

কিন্তু নয়াদিলীর সোসাইটিতে চালনদস্ত আধাৰকাৰেৰ খ্যাতি পানীয়বাটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ জইকি পান কৰতে পাৱেন অবলিলাকুমে। ঢোখেৰ পাতা কাঁপবে না এটুকু। সেটা অভূতপূর্ব নয়। আৱো দুচার জন পাৱেন তা। কিন্তু আধাৰকাৰেৰ কৃতিত্ব শুধু পানীয়েৰ গ্ৰহণে নয়, উদ্ভাবনেও। সংখ্যাতীত মিৰিং আনা আছে চালনদস্তেৰ। কক্ষটেল তৈৰীৰ বহু পক্ষত তাঁৰ নথাপ্তে। ডিনারে, পাটিতে নিমজ্ঞকারণীৰা আগে ভাগে পৰামৰ্শ কৰেন আধাৰকাৰেৰ সঙ্গে। মহানন্দে ঝুঁটা দেন তিনি। “কে কে আসছে, কতজন আসছে? যদি তিনি রাউন্ডেই ঘৰেলু কৰতে চাও, তবে প্ৰথমে দাও রাম অৱেৱে, তাৱশ্পৰ জিন অ্যাণ লাইম। তাৱশ্পৰ হইকি। মেঘেদেৱ জন্য মাঝখানে আৰু দিতে পাৰ জিজ্ঞাসেৰেৰ সঙ্গে মিলিয়ে। কী বললে, রাম-অৱেৱে কেমন কৰে কৰবে জানো না! হোয়াট এ পেটি! আজ্ঞ শিখিয়ে দিছি। shaker-এৰ মধ্যে সিকি ভাগ নাও ইটালিয়ান ভাৱমুখ। ইটালিয়ান নেই? আজ্ঞ অভাৱে ফ্ৰেঞ্চই দাও। মেশাও সিকি ভাগ কমলালেবুৰ রস, অৰ্ধেক ঢালো রাম। বেলী কৰে বৰফ, আৱ সামান্য একটু দাঙ্গচিমিৰ রস। ব্যস। আজ্ঞ কৰে মিলিয়ে এবাৰ কক্ষটেল প্লাসে পৰিবেশন কৰ।”

নটরাজন গৃহিণী বললেন, “মিনি সাহেব, (আমাৰ মিনি সাহেবে নামটা সেন সাহেবেৰ অন্দৰমহল থেকে বাহিৰ বিশে ছড়িয়ে পৱেছে বজ্জনেৰ সকৌতুক সৰোধনে) যদি নতুন নতুন

ক্লিন্ট চালতে চাই তো মিস্টার আধারকারের বুকি নেবেন।”

শিশু হাজে আধারকার বললেন, “হ্যাঁ, চাকরি থেকে রিটায়ার করে আমার রেসিপিশনের পেটেন্ট নেবে ভাবছি। কাগজে আগজে বিজ্ঞাপন দেবো—If it's a drink, consult আধারকার। ঘরে ঘরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আশমারিতে থাকবে আধারকার'স বুক অব ড্রিস্ক।”

কিংবু আমার জন্মে এ সবের ঢেয়েও বড় বিজয় অপেক্ষা করছিল। ভোজন পর্বের শেষে অতিথিদের সন্ধিক্ষণ অনুরোধে বেহালা বাজিয়ে শোনালেন আধারকার। দরবারী কানেড়ার সুর। মৎ নয়, তথ্য আজাপ। প্রায় মিসিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপূর্ব মন্তব্য। বাঙ্গনা শেষে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, “বলতে শারো কী সুর বাজালেম, মিনি সাহেব?”

বিস্তরে হত্তবাক হয়ে রইলেম বানিকক্ষল, উত্তর দেওয়ার কথাই মনে রইল না : পরিষ্কার বাজ্ঞা।

“কী, একেবারে থ' হয়ে রইলে যে?” এবারও বাংলায়।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেম, “আপনি আকর্ষ্য। বাংলা শিখলেন কেমন করে?”

“একি একটা প্রশ্ন? তুমি ইংরেজী শিখেছ কেমন করে?”

“আমি শিখেছি পেটের দাঁড়ে।”

“আমি শিখেছি প্রাণের দাঁড়ে। না, না, আর প্রশ্ন নয়, curiosity is a feminine vice.”

বিদায় দেওয়ার আশে আজুরিকতার সঙ্গে করম্পর্টন করে বললেন, “মিনি সাহেব, ‘তুমি’ বলছি বলে চটেনি তো মনে মনে? তুমি তো বয়সে অনেক ছেটাই হবে। আমি থাকি রটেশনাম রোডে, বাইশ নম্বর। এস একদিন সন্ধ্যাবেজা, বাংলা বলবো, বেহালা শোনবো, আর দেব টেপ-হ্যাট। টেপ-হ্যাট জানো তো? জানো না? অর্ধেক জিন, সিকিউরিটি ফ্রেক্ষ ভারমুথ, সিকিউরিটি ইটালিয়ান। একক্লিটি বিটাৰ্স, তার সঙ্গে ঘুৰ বানিকটা বৰফক।”

আধারকারের বাড়িতে গেলেম। টেপ-হ্যাটের লোডে নয়, লোকটির আকর্ষ্য আকর্ষণে। একদিন গেলেম, দুদিন গেলেম। তারপর প্রত্যাহ। কখনও বা সকালে এবং বিকেলে। অনেকদিন ক্রেকক্সট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সবই সমাধা হয়েছে তাঁর ওখানে। অল্প সময়ে আজুরিকতা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে, আধারকার পুরুষ না হলে নিন্দুকের কুৎসারটানায় কলক্ষিত হতে পারতো আমার নাম। তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকলে নয়াদিল্লীর গৃহিণীরা সজ্জবপর বর কলম্বন করে মুখরোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অলস মধ্যাহ্নে।

কিংবু কল্যাণুরে থাক, কল্যাণীর চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না অকৃতদার আধারকারের গুহে। গোটা তিনি চার চাকর, বেয়ারা থানসাম নিয়ে আধারকারের হোম গভর্নেমেন্ট। তার একমাত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের ভার তাঁর নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেজিস্লেটিভ, মায় জুডিশিয়ারী পর্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। খাঁটি প্রজাতন্ত্র। মজাতন্ত্র বললেও ক্ষতি নেই, ভূতাদের পক্ষে।

তর্ক চলে, আলোচনা হয়। রাজনীতি, ধর্ম, ওয়ার স্ট্রাটেজী, মায় সিলেমা স্টোর পর্যন্ত। কেন বিষয় বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে হয় কাব্যালোচনা। রবি ঠাকুরের বহু কবিতা ও কবিতাংশ আধারকারের কঠিন। গভীর কঠে আবৃত্তি করেন—মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি হাজার মরশে, মৃশুরের মতো বেজেছি চৰণে চৰণে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, “বল, কোথায় আছে?” বলতে পারলে বলেন, “সাবাস! Now you have earned a drink, নাও একটা অরেঞ্জ গিম্জেট—বানিকটা জিন ও কমলাসেবুর রস। এই বয়, সাবকোবাস্তে—” কোনো দিন বলেন, “আজ পরীক্ষা। বল, কেম্পার আছে—আমারে যে তাক দেবে তারে বারংবার এ জীবনে ফিরেছি জাকিয়া; সে নারী বিচ্ছু বেশে, মৃদু হেসে, খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।”

“পারলে না? আজ্ঞা আর পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। তবু পারলে না, শঃ, হঃ, বাঙালী হয়ে বাজ্ঞা কবিতার বাজিতে অবাঙালীর কাজে হারলে। লোকে শুনলে বলবে কী হে? আজ্ঞা আগে মাথা সাফ করে নাও। বয়,—লাও একটো বুক্লীন। একটা টাইপলের অর্ধেকটা বৰফের টুকরো, কিছুটা ক্লেক্সটাইল ভারমুথ, কিছুটা ড্রাই জিন। আজ্ঞা করে নেড়ে দুঁফোটা অরেঞ্জ বিটাৰ্স।

ডিলিস্ ।”

একদিন জিঞ্চাসা করেন, “মিনি সাহেব, প্রেমে পড়েছ কথনও ?”

“না ।”

“বল কী ছে, ইয়ং ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, একথা বিশ্বাস করবে কে ?”

“বিশ্বাস করা উচিত । There are more things in heaven and earth...”

“কিন্তু There are more girls in Piccadilly and Leicester Square-গুচ্ছে বটে ।”

“আসল কথা কী জানেন ? প্রেমে পড়লে চেহারাটা বজ্জ বোকা বোকা দেখায়, সিনেমায় দেখেছি । সে ভয়ে এগোতে সাহস করিনি ।”

উক্ত হাস্যে ফেটে পড়লেন আধারকার । “বোকা বোকা দেখায়, হাঃ, হাঃ, হাঃ, Just imagine প্রেমে না পড়ার কারণ । বার্নার্ড শ্ৰী এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না । তুমি একটি genius । না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পারলে মান থাকে না । Try রাম বুইয়ট । চার চামচে রাম, এক চামচে সাইম, এক রাষ্টি চিনি, আধ পেয়ালা ব্র্যাক কফির সঙ্গে মিশিয়ে । ওয়ান্ডাৰফুল ।”

দিনের পর দিন বাড়ে বিশ্বাস । ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই এই মারাঠা ভাস্কগের প্রতি । আকৰ্ষণ এর জীবন । কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অনুরাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা । আয় করেন প্রচুর, ব্যয় করেন প্রচুরতর । সঙ্গীর ভাগই মদ খাওয়া এবং খাওয়ানোয় । অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কথনও । দম্পত্তি করে বলেন, “মিনি সাহেব, তোমাদের শরৎ চাটুয়ে লিখেছেন,— যে মদ খায় সে কোনো দিন না কোনো দিন মাতাল হয়েছে নিশ্চয় । যে অশ্বিকার করে সে হয় মিছে কথা বলে, নয় তো মদের বদলে জল খায় । শরৎ চাটুয়ে দেখেননি চাকুদণ্ড আধারকারকে । দেখলে বই থেকে ঐ লাইন দুটি তুলে দিতেন ।”

শ্রী নেই আধারকারের সে-কথা সবাই জানে । কিন্তু আশ্চৰ্য, পরিজন ? কারণও জানা নেই কোনো তথ্য । হাসিতে, ঝুশিতে, গরে, শুজবে, সরগরম রাখেন মজলিস, মুখ্যরিত করেন নিজ গৃহের প্রাতাহিক বৃক্ষসমাগম । তবু চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এই বাহু । কী এক গভীর দুঃখের ভার পুঁজীভূত হয়ে আছে এই ভারান্ত নয়নের অস্তরালে, নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস । কিন্তু কৌশলে প্রশংসিত গীয়ে আবৃত্তি করেন আধারকার,—

আমারে পাহে সহজে বোৰ তাইতো এত শীলৰ ছল ;

বাহিৰে যাব হাসিৰ ছটা, ভিতৰে তাৰ চোখেৰ জল ।

ছল

দুঁজন ইংরেজ একত্র হ'লে গড়ে একটা ঝুঁঝ, দুঁজন শচ একত্র হ'লে খোলে একটা ব্যাঙ, দুঁজন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি । দুঁজন বাঙালী একত্র হ'লে করে কী ? দলাদলি ? তা করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাজাহাই করে । কিন্তু তাহাড়া আৱৰণ একটা জিনিস করে । স্থাপন করে একটি কালীবাড়ি । উত্তর ভারতের এমন শহর দুটি যেখানে বাঙালী আছে কিছু সংখ্যক অথচ কালীবাড়ি নেই একটি ।

হিন্দু দেবদেৰীর মধ্যে কালীমূর্তি সুখসূশ্য নয় । কীবাদিনী সরবর্তীৰ সুয়মা বা কমলাসনা লক্ষ্মীৰ শ্রী নেই তাৰ মৰীচকৃষ্ণ দেহে । ভগবতী দুর্গার হাত দশটি, প্রহরণ সমপরিমাণ । কিন্তু কালীমূর্তিৰ কাছে তাঁকে অনেক শাস্তি ও সুকুমাৰ মনে হয় । কঠে তাৰ নৱমুণ্ডেৰ মালা, কঠিতে তাঁৰ ছিমবাহৰ গুচ্ছ, এক হাতে ধৃত মুকুট কৃপাণ, আৱ হাতে দোলে বশিত শিৰ । অতি বিস্তৃত আনন্দেৰ কোনোখানে নেই কমলীয়তাৰ লেশমাত্ৰ আভাস, নয়নে নেই পিঙ্কলত দৃষ্টি । নিরাবৰণ বক্ষ, নিরাভৱণ দেহ । লোলায়িত রসনা । স্বদেশীয় ভজ্ঞাৰা বলেন, মা ভয়কুৱা ; ক্যাথারিন মেয়ো বই লিখে বলেন, বীভৎস ।

এই ক্লুস ভয়াল মূর্তিকে ভালোবাসে বাঙালী । শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিশোত আনলেন তাৰ চিহ্ন রাইল একটি মাত্ৰ বিশেষ প্ৰেৰিতে । কালীৰ ভজ্ঞা আছেন দেশব্যাপী । শুধু শাকদেৱ মধ্যেই তাৰ

ପୂଜାରୀରା ନିବକ୍ଷ ନୟ । ତାର ପୂଜା ନିରକ୍ଷର ଆମ୍ୟ କୁଟୀର ଥେକେ ଧନୀର ପ୍ରାସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ପୁରାକାଳେ କାପାଳିକେମୋ ଶବାସନେ ସାଧନା କରେଛେ ଦେବୀ କାଳିକାର, ତାଙ୍କେମୋ ଆରାଧନା କରେହେ ଶ୍ୟାମାଯାମେଇ, ଦସ୍ୟଦଲ ଲୁଟ୍ଟନ ମାନଙ୍କେ ନିର୍ଗତ ହେଯେହେ ନୃଷୁଣମାଲିଲୀ କାଳୀର ଅର୍ଚନା କରେ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗେ ଓ ଅସୁର୍ବ ଆୟ୍ମାଯେର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାୟ ବାଙ୍ଗଲୀ ମେଯେରା ମାନ୍ୟ କରେନ ମା କାଳୀର କାହେ, ପଞ୍ଜିଯେ ମହାମାରୀ ଦେଖା ଦିଲେ ସରଲାଟିଙ୍ ଅଧିବାସିରୀ ପୂଜା କରେ ଭକ୍ତିଭରେ । ଠାକୁର ରାମକଞ୍ଚ ତାର ଧ୍ୟାନ କରେଛେ ନ ଦକ୍ଷିଣେରେ, ତାରଇ ଡଜନା କରେଛେ ସାଧକ ରାମପ୍ରସାଦ ; ରଚନା କରେଛେ ଅପ୍ରେ ଶ୍ୟାମା-ସନ୍ତିତ ।

ବାଙ୍ଗଲୀର ପକ୍ଷେ ଏହି କାଳୀପ୍ରାତି ଆପାତଦୃତିତେ କିଛୁଟା ବିଶ୍ୟକର ମନେ ହେବ । ତାର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଗଠନ ବାଙ୍ଗଲୀକେ ଆକୃତି କରବେ କୋମଲତାର ପ୍ରତି, ସ୍ଵିକ୍ରତାର ପ୍ରତି, ମାଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି,—ଏହିଟେ ଆଶା କରା ସାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗଲୀକେ ଧୀରା ଘନିଷ୍ଠଭାବେ ଜାନେନ, ତାର ପ୍ରକୃତିକେ ଧୀରା ଯଥାର୍ଥକୁଣ୍ଠେ ଅନୁଶୀଳନ କରେଛେନ ତାଙ୍କେ, ଏହି ଆପାତବିରୋଧିତାଇ ତାର ଚରିତ୍ରେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । କୁରୁମେର ମୃଦୂ ଏବଂ ବଜ୍ରର କାଠିନ୍ ଅଙ୍ଗାଳିଭାବେ ଉଚ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରକୃତିତ । ତାଇ ଭୀକୁତାର ଅପ୍ରବାଦ ବେଳନ ତାର ବହୁପାରିତ, ଚରମ ଦୁଃଖାଶିକତାର ଜୟତିଲକ୍ଷ୍ମ ତାରଇ ଲଲାଟେ ।

ଭାରତବରେ ଜ୍ଞାତୀୟ ଆଶ୍ରୋଲେନେର ଓ ସଂଘାତ ସଂଘର୍ ଆଜ ବହୁବ୍ୟାପ୍ତ, ଆସମୁଦ୍ରିତିମାଳ ତାର ବିକାର ଓ ବେଗ । ସ୍ଵାଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂଘାମେ ଯୋଗ ଦିଯେହେ ଜ୍ଞାତିଧରମିର୍ବିଶେବେ ସର୍ବ ପ୍ରଦେଶେର ସର୍ବସାଧାରଣ । ମାରାଠୀ ଏସେହେ, ମାରାଠୀ ଏସେହେ, ଏସେହେ ଶୁଜାରାତୀ, ପାର୍ଶ୍ଵୀ ଓ ବେହାରୀ । ଭରେହେ ଜେଲ, ସ୍ୟାତେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଧୀନଭାବ ଅଧିକରଣ ଅଦମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟାଯ ବାଙ୍ଗଲୀରେ ସାଧନ କରେହେ ଅଗ୍ରିମ୍ବେର, ଦିଯେହେ ଦକ୍ଷିଣା, ଜୀବନ ଦିଯେ ପରିଶୋଧ କରେହେ ଦେଶମାତ୍ରକାର ଖଣ । ଏକମାତ୍ର ବାଙ୍ଗଲା ଛାଡ଼ା ଭାରତବରେ କୋଥାଯ ଶ୍ଵରୁର ଛେଲେ ବରଣ କରେହେ ଫାସି, ମେଯେରା ହୁଡିଦେହେ ପିଣ୍ଡଲ, ପଲିତକେଳ ଅଞ୍ଚପୁର୍ବିକା ବୁକ ଏଗିଯେ ନିଯେହେ ଶୁଣୀର ଆଘାତ ?

ରିଡିଂ ରୋଡ଼େର ଉପର ଯେ କାଳୀମନ୍ଦିରଟି ହସିତ ହେଯେହେ ମିଲିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଆର୍ଦ୍ଧିକ ପ୍ରଦେଶୀୟ, ତାର ଜ୍ଞାନ ନ୍ୟାଦିଲୀର ବାଙ୍ଗଲୀ ସମାଜେର ଗର୍ବ କରାର ଅଧିକାର ଆଛେ । ଆସ୍ତାବାତୀ ବୁନ୍ଦିର କରମନଶା ହଠକାରିତାଯ ମେ କେବଲିକି କରେ କଳହ, ଘଟାଯ ତେବେ, ଧ୍ୱନି କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ,—ଏ ଅପ୍ରବାଦ ବାଙ୍ଗଲୀର । ବୋଧ ହ୍ୟ ଏକବାରେ ଅମ୍ଲକଣ୍ଠ ନୟ । ଏକକ ପ୍ରତ୍ୟୋତ୍ୟ ବାଙ୍ଗଲୀର କୃତିତ୍ୱ ତୁଳନାହିଁ । ତାର ମେଧା ତାର ଅନ୍ତି, ତାର ମୈପୁଣ୍ୟ ସର୍ବଜନସ୍ଥିତିକୁ କରେ ମନ୍ଦିରଟି ହସିତ କରେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏକଟା ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼େ ତୋଳାର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯନି ବାଙ୍ଗଲୀ—କଥାଟା ଗଭିର ପରିତାପେର ସମ୍ବେଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକାର କରାତେ ହ୍ୟ । ତାଇ ଏହି କାଳୀବାଢ଼ିଟି ଦେଖେ ମନ ଖୁଲୀ ହ୍ୟ । କୋନୋ ରାଜନ୍ୟବାଚିତର ଅନୁହେ ନୟ, ନୟ କୋନେ ବିଷ୍ଣୁଶାଲୀର ଏକକ ଅର୍ଥନ୍ତ୍ରଳେ, ପ୍ରବାସୀ ବାଙ୍ଗଲୀଦେର ପ୍ରଦୃତ ଓ ସଂଗ୍ରହିତ ଚାଦାର ଗଢ଼େ ଉଠେଛେ ଏହି ମନ୍ଦିର, ହସିତ ହେଯେହେ ବିଶ୍ଵାଶ ।

ସରକାରୀ ଦୁଷ୍ଟରଥାନାୟ ଜୀବିକାର୍ଜନେର ତାଗିଦେ ଉତ୍ତର ଭାରତେର ଏହି ମହାନଗରୀତେ ଏସେହେ ବାଙ୍ଗଲୀ । ତାଦେର କେଉଁ ଏକିକିଟୁଟିଟ କାଉସିଲେର ସଦସ୍ୟାରେ ଆୟ କରେଛେନ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, କେଉଁ ସାଧାରଣ କେବାନୀର କାଜେ ପେଯେହେନ ପରିମିତ ବେଳନ । ତାର ସବାଇ ଦିଯେହେନ ଦାନ, —ବେଳ୍ଯୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା । ଅର ଅର କରେ ଜ୍ମେହେ ଅର୍ଥ, ଭରେହେ ଦେବୀର ଭାଗୀର । ସାଧୁବାଦ ଦିଇ ତାଦେର । ତାରା ଧନ୍ ।

ମନ୍ଦିରଟି ପରିକଳନ କରେଛେ ଯେ ଶ୍ଵପନ୍ତି ତାର ନାମ ଜାନି ନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶନ୍ଦୋ କରି । ଆଦ୍ସବହୀନ, ବାହ୍ୟ-ବର୍ଜିତ, ସହଜ, ସରଳ ଗଠନ । ବଡ଼ବାଜାରେର ଗନ୍ଧ ନେଇ, ନେଇ ମାର୍କିନୀ ଟଂ-ଏର ଅତି ଆଧୁନିକ ଫ୍ରୀଲେଇନ । ଦୂର ଥେକେ ଦେଖେ ତୋଥ ତୃପ୍ତ ହ୍ୟ, କାହେ ଗେଲେ ମନ ଶୁଚିତାଯ ଭରେ ଓଠେ ।

ଶୁଟି କରେକ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଉପରେ ଉଠିଲେ ବିଶ୍ଵତ ଅଲିନ୍, ଇସ୍ୟ-ଉଚ୍ଚ ଜାଲିକଟା ପ୍ରାଚୀର ଦିଯେ ଯେରା । ମାରାଧାନେ ମନ୍ଦିର, ଚାରିଦିକ ଘିରେ ପଥ । ମେ ପଥେ ଦର୍ଶନାରୀର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ ବିଶ୍ଵାଶ, ବାରେ ଲସମାନ ଘଟା-ଧରି କରେ ମନ୍ଦିରେର ଧୂଳି ନେଇ ମାଥାଯ । ଆପନ ଅଭ୍ୟରେର କାମନା ନିବେଦନ କରେ ଭକ୍ତ ନରନାରୀର ଦଲ । ଆକଶେର ଅଳୋ ଏବଂ ବାହିରେର ବାତାସ ଆସତେ ବାଧା ନେଇ ଏତୋକୁଣ୍ଡ । ମନ୍ଦିରେର ଅଭ୍ୟରେ ନେଇ ଅଙ୍ଗକାର, ନେଇ ପୁଣ୍ୟପତ୍ର ଓ ଗନ୍ଦେଶକେର ହାରା ଆର୍ଦ୍ର ଅପରିଚିତ ଆବହାୟୋ ।

ମନ୍ଦିରେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ୍ଟି ସୁପରିସର । ଏକମିକେ ଆରାବାନୀ ପର୍ବତେର 'ରୀଜ' । ପାଥରେର ଖାଡ଼ା ଦେଯାଇ, ସିମେଟ୍ ଦିଯେ ଜୋଡ଼ା । ଅନ୍ୟଦିକେ ରାଜ୍ଞୀ ଏବଂ ରେଲିଂ । ପିଛନେ ଏକ କୋଣେ ପୁରୋହିତେର ବାସନ୍ତାନ । ଛୋଟୁ ଏକଟି କୋଯାଟାର ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତପକ୍ଷେର ତୈରୀ ।

সুজলেন দেৱীৰ নিৰমিত পূজাৰ আৱোজনে পুৱোহিত সংগ্ৰহ শুৰু হৰি। বাঙ্গলা খেকে কাউকে এনে বাখতে হলে চাই ঠার জন্য নিৰমিত আৱোৰ ব্যৰহা। ঠার পৰিজন প্রতিপূজানোৱ
নিষিদ্ধ আৰাম। তাই মণিতেৰ কৰ্তৃপক্ষ পুৱোহিতেৰ জন্য নিৰ্দিষ্ট কৱেজেন মালিক মালোহারা।
তাৰ গ্রেড আছে, ইনক্রিমেট আছে, দুটিৰ ব্যৰহা আছে। আছে প্ৰদাৰ্মা, লন্দিনীয় প্ৰাপ্য অংশ
নিৰ্মাণিত। এ শুগে দেৱসেৰকোৱে জকৰিৰ কানামেজাল কৱলস্ মেনে ছালতে হৈ।

মানুবেৰ জীবন বৰন জাটিল হয়লি, তখন তাৰ অভাৱ ছিল সামান্য, প্ৰয়াজন ছিল গৱামিত।
সেলিনে আৰামপৰে পকে আৰুষ্যক ছিল না বিভেন্ন। সে বিদ্যা দান কৰতো ছাত্রকে, আন বিতৰণ
কৰতো শিষ্যকে, তজন পূজন কৰতো নিষিদ্ধ নিৰ্বিত্তে। সে বিৰ্লোভ, মিৱাসুক, তকাচৰী,
সাহিক। সে-কিম বিগত, তাৰ সঙ্গে সে আৰামপত তিওহিত। একালে পুৱোহিতেৰও সংসাৰবাজাৰ
উপকৰণ হয়েছে বৃক্ষ। তাৰ শীৰ জন্য চাই সাৰা, সেমিজ ও ড্ৰাইভ, ছেলেৰ জন্য মেলিস কুড়,
মেৰেৰ জন্য হেজলীন হো। ইহকলোৰ সমাজ, সংসাৰ ও পাৰিপার্শ্বকেৰ প্ৰতি উদাসীন হয়ে শুধু
বজহানেৰ পৰাকৰ্মীন মৰল ঢিকা কৰলে তাৰ নিজেৰ পৰকল ঘনিয়ে আসে। তাই মণিতেৰ
পূজারীৰ জন্য বাখতে হয়েছে বিনাভাঙ্গৰ বাস্তুল, তাতে বিজলী আলো আছে, কৱলেৰ জল আছে,
আছে তহ বৰষবিতু বাঙালী পৰিবাৰেৰ উপহোৰী সাধাৰণ স্বাঞ্ছন্দেৰ আৱোজন।

তিকিৰ পাখে জুতা শুলে ত্ৰে উঠলেম মণিতে। অকৃপণভাৱে পুৱোহিত দিলেন দেৱীৰ
পালোক, দিলেন নিৰ্মাণ্য ও প্ৰসাদকশিকা।

কলকাতাৰ সতো মণিতৰাঙ্গণে স্থূলপুৰা বাঙালীৰ উপহীতি এখনকাৰ সমাজে পৰিহাসেৰ
উচ্চে কৰে না। কাৰণ বসনকে এখানে বৰ্তমানৰ পৰিবেৰ বলেই গণ্য কৰে, মনোভাবেৰ
পৰিচয়ৰাপে নহ। এটি সম্ভৱ হয়েছে শুধু শহৰে বিভিন্ন পৰিজনেৰ মানুবেৰ অৰহাইতিৰ কলে।
এখানে মাজালী আৰাম, পাজালী সিং, মহাবাজীৰ দাঁই, বাঙালী বিধৰা আসে প্ৰণাম নিবেদনে।
তাদেৰ বেশ, তৃষ্ণা, এমন কি বৰু পৰিবাসেৰ সীতিনীতি সমষ্টি বিভিন্ন। তাৰা ভক্ত, ইঁথেই তাদেৰ
কেক্ষাৰ পৰিচয়, পৰিজন্মো তাদেৰ শীৰ, অক্ষত ও নৰতা নিবাৰণেৰ উপকৰণ মাত্।

মণিতেৰ সামনে উচ্চু প্ৰাণত হৈ। দেৱানে শৰৎকোলে তিপলজৰা মণ্ডণে দূৰ্গাপূজা হয় মহা
আচৰণে। বাঙালী ছেলে-মেৰেন্দেৰ হাতেগোড়া কাৰ্ত্তিকীৰ প্ৰদৰ্শনী বসে। দিনেৰ বেলায়
বালকবালিকারা পার প্ৰসাদ, মিশাবোণে পিতোটোৱে গোপ কামিয়ে মিহি খৰে মেয়েৰ পাঠ কৰে
সবেৰ দলেৰ তৰুণ সজৰণ।

কালীমন্দিৰে প্ৰতি অমাৰ্বল্যেৰ কালীকীৰ্তন হৈ। শ্যামাৰিবৰক গান, কীৰ্তনেৰ পক্ষতিতে মূল
গায়েন ও দেৱাহা হিলে গোপণা হৈ। বজনা তক্তিমূলক, সুৰ বৈচিত্ৰ্যাহীন। তাতে মহাজন পদবৰ্জীৰ
লালিত্য নেই, নেই সাধকেৰ একক তক্তিবিবেদনেৰ পার্শ্বীৰ ও আবেগ। জিনিসটা সঙ্গীতশাস্ত্ৰে
প্ৰক্ৰিপ্ত এবং তক্তিতত্ত্বেৰ দিক থেকে অনাৰুধক অনুভূতি। সব দিক দিয়েই অসাৰ্থক। কালীৰ
অজনে রামপ্ৰসাদী সুৰে ভজনৰ কষ্ট—'শৰান তামো বাসিস বলে শৰান কৰেছি দুদি,' জাতীয়
গানই হচ্ছে শ্ৰেণ কথা।

গানেৰ আসন্নে বে প্ৰোট ভজনোকেৰ সঙ্গে গভীৰ পৰিতয় ঘটল ঠার নাম মোহিতকুমাৰ
সেনগুপ্ত, বয়স পঞ্চাশেৰ ওপত্তে, শ্ৰীৰ অৰূপ, দৈৰ্ঘ্য সাধাৰণ বাঙালীজনোচিত, অডিট একাউটেস
সার্টিফিসেৰ লোক। সুন্দৰ অক্ষিলাৰ বলে বাপি আছে সৰকাৰী মহলে। বৰ্তমানে যানবাহন
বিভাগেৰ আৰ্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদমৰ্যাদা দুই-ই শুৰুত্বপূৰ্ণ। এৰ আৰ দু'ভাইয়েৰ নাম
বালাদেশে কলেজেৰ ছাত্ৰছাত্ৰীৰেৰ কাছে সুপৰিচিত। পৰীক্ষাৰ আগে এম. সেনেৰ ইকনমিজ ও
মিহিৰ সেনেৰ সিডিৰ পড়েনি এস্কুলকে এমন বিদ্যাৰ্থীৰ সংখ্যা বেশী নেই। ছাত্ৰজীবনে সেনগুপ্ত
নিজেও প্ৰথিতযশা ছিলেন। প্ৰেসিডেন্সী কলেজে ম্যাগাজীনেৰ তিনি দ্বিতীয় ছাত্ৰ-সম্পাদক।

ভদ্ৰলোক মৃতদার, অমায়িক এবং নয়াদিলীৰ বাঙালী সমাজে ঘণ্টেষ্ঠ সম্মানিত। বাঙালীদেৰ
সমুদৰ ক্ৰিয়াকৰ্মে যোগ আছে ঘণ্টিত। কীৰ্তনেৰ আসন্নে ঠার উপহীতি দেখা যায় অবৰারিত।

ফ্ৰেট ফ্ৰাইট আছে বনতেৰ কাগজ, সেভিল ৱোতে সৰজী। নয়াদিলীৰ রিডিং ৱোডেও তেমনি

মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাজাটির নাম টেস্পল স্ট্রীট হলে ক্ষতি হিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্ষে বর্তমান জ্ঞানীতে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ মেৰনিবাস। শুধু আকাশে নয়, গঠন পরিপাট্টে ও অর্থব্যাপের বিশ্বালতার এর জড়ি আছে বলে জানা নেই। দুর দূরাঞ্জ থেকে আসে লোক। শুধু চতুর্ভুজ নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক, প্রিটান। আসে মুরোশীর ও এমেরিকান টুরিস্ট। সকালে সক্ষায়, মধ্যাহ্নে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে বালি করে ক্যামেরার স্প্লু।

প্রায় বারো বছর আগের কথা। পিতৃনাম চিহ্নিত করে যুগলকিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির যেখানে হিন্দুমাহেরই থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিড়লাদের আভিবাস জয়পুরে, সেখানে এ-মন্দিরের সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক যায় সেখানে, ক'জন খবর রাখে সেখানকার? স্থান নির্বাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী,—শুধু আজকের ভারতবর্ষের নয়, শুধু সহস্র বৎসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রাচ্ছে রাজস্ব-করেছে। মহাভারতের কুরুপাণির বাস করেছে সংস্কৃত পঁঢ়ীরাজ। শিশিরে ছিল সপ্তাষ্ট কৃতবুদ্ধিন, লাল কেজুর রাজস্বও ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। যমুনার দুই তীরের বিশ্বীর্ণ প্রাস্তর, আরাবণীর বনভূমি, অখন বিলুপ্ত জনপদের পথশুলিতে কত শক হুন্দল, পাঠান, মোগল একদেহে হলো শীন। ভাবিকালের ভারতবর্ষেও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমি। আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না ওয়ার্তা।

উনিশ শ' বর্তিশ সালে শুরু হলো মন্দিরের নির্মাণ কার্য। বহু কর্মী, শুণ্ঠ শুণ্ঠ রাজমিস্ত্রী, মুটে মুটুর খাটতে লাগলো ছ'বছর ধরে অবিশ্রাম। উনিশ শ' আটবিশ সালে সম্পূর্ণ হলো মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনার স্থান, ধনকুবের বিড়লা ভারতবর্ষের জনক রাজা বলদেও দাস বিড়লার নামে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরের গঠনভঙ্গিটি ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর নির্মাণ। লাল পাথরের চূড়া, ধারণভঙ্গিতে আছে গৈরিক। মনে হয় যেন লাল জমিতে গেছুয়া পাড়। রাজপথ থেকে বেং পা পাথরের অতি বিশ্বীর্ণ সিডি উঠে গেছে উপরে। সেখান থেকে উঠেছে মন্দির। মেঝে ও দেয়ালে বিভিন্ন বর্ষের প্রত্নত্বথেকে-সমাবেশে রচিত বর্ণাদা আলিঙ্গন ও পৃষ্ঠাসংজ্ঞা। প্রাচীর গাত্রে আছে অজস্র ছেঁয়ে পেটিছিং। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের শিল্পীরা অঙ্কন করেছে সে-সব চিত্র। তাদের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনচাতুর্য প্রশংসনীয়। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ—কোশল মুখার্জি—তিনি বাঙালী; নব্য বঙ্গীয় চিক্রিকলার উদ্ভাবক নন্দলাল, অসিতকুমার, সমর শুণ্ঠ প্রভৃতির সতীর্থ। বিড়লা মন্দিরটির পরিকল্পনায়ও আর একজন বাঙালী স্থপতির যথেষ্ট অংশ আছে, এ কথা জেনে আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে আমাদের।

মন্দিরের মধ্যে বিশ্বাহ আছে খেতপাথরের। প্রত্যহ অগশ্মিত নবনারীর কুসুমার্ঘে প্রায় আছে ক্ষেত্র চৰণ ও পাদশীঠ। দ্বারে লোহ-পেটিকা, উপরের ছিপপথে ভঙ্গেরা রাখে প্রশামী। মন্দিরের বাম পার্শ্বে বিরাট ধৰ্মশালা, সোটি বিড়লা জননীদের স্মৃতিরক্ষার্থে। ধৰ্মশালার সংলগ্ন নাট মণ্ডপ। তাতে প্রত্যহ সংস্কায় ভজন সংগীত করেন সুকৃত গায়ক। সহস্রাধিক শ্রোতা অন্যান্যে বসতে পারে সে সভায়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে বাইরে সর্বসাধারণের শ্রবণায়ন করার ব্যবস্থা ও নির্মুক্ত। মন্দির-প্রবেশের বহু দূরে থাকতেই কানে এল সে গান—গ্ৰীষ্মামচন্দ্ৰ কৃপালু ভজ মন হৃষণ ভব ভয় দারুণম।

মন্দিরের পিছনে একটি বৃহদাকার পার্ক। এটি পৰবৰ্তী রচনা। সাধারণ লোকের চমক লাগার মতো অনেক আয়োজন আছে এই পার্কে। পাথরের বিৱাটিকায় হংসী, তাৰ শুড় দিয়ে কোয়ালাৰ জল ঘৰছে বৰ ঘৰ ধৰায়। আছে পাথরের কুমীল, তাৰও মুখ দিয়ে নিৰ্গত হচ্ছে জল। কোয়ালা, পুল্মীযুক্তিকা, কৃত্রিম শ্ৰোতৃস্থৰী ও গিৱিগহৰ প্রভৃতি একাধিক আকৰ্ষণ আছে বালক, বালিকা ও দেহাতীদের। প্রতিদিন অপৰাহ্ন বেলায় ভিড় জমে তাদের। কেউ বসে বিশ্রামবৈতীতে, কেউ দোলে দোলনায়, কেউ বা পৰিকৃষ্ণ কৰে এদিক থেকে শুনিক। অর্থব্যায়ে কার্পণ কৰেননি শেষ যুগলকিশোর। যুক্তপূর্বকালের অর্থমুল্যে মন্দির ও পার্কের নির্মাণে বায় হবে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা।

বিড়লা পরিবারের তিনজন, পাঞ্চাবের আৰ্য প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধি তিনজন এবং স্থানীয়

সন্নাতন ধর্মসভা থেকে ডিনজন মিলে এক ট্রাস্ট। তাগাই রক্ষণাবেক্ষণ করেন মন্দির এবং তার সংলগ্ন উদ্যান, ধর্মশালা প্রতিতি। আধুনিক মনোভাবের পরিচয় আছে পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রতিনিধিমা প্রতি তিনি বৎসরাত্তে নির্বাচিত হন। ছোটখাটো ব্যাপারেও আধুনিকতার ছাপ আছে।

মন্দির প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে মাঝবার ব্যবস্থাটি চমৎকার। সিডির ঠিক গোড়াতেই একটি স্কুল কক্ষ। দেয়ালে জুতা রাখার যাক। সেখানে জুতা জমা দিতে হয়। মাল্টিকক্ষে দিওয়া হয় সংখ্যাগুলু কাউন্টোরের একটি চাকতি। অনুরূপ আর একটি চাকতি খাঁটে মাঝ জুতার গায়ে, যাতে একজনের হাইইল লেডিস সু'র সঙ্গে অন্যজনের কাবুলী চগ্গল বদল না হয়ে যায়। চাকতি ফেরত দিলেই ঠিক নিজের জুতাজোড়া এনে হাজির করে জুতাঘরের কর্মচারী যেমন স্যাভেন্য, অভন্ন বা কলকাতার হেট ইন্স্টার্নে টুপী, ছাতা কিংবা লাঠি।

মহাশ্বা গাঙ্কী দ্বার উদ্ঘাটন করেন এ মন্দিরে। তার চাইতে যোগাতর পুরোহিত ছিল না এ-অনুষ্ঠানের। আঙুগ, শূন্ত ও হরিজনের সমান প্রবেশাধিকার যে মন্দিরে, তার দরজা তিনি খুলবেন না তো খুলবে কে? বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রাইল এ-সুন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাঞ্চার নাম।

বিড়লা মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তৃতীয় মন্দিরটি মূলতঃ বিড়লাদেরই আর্থানুকূল্যে নির্মিত। সেটি বৌদ্ধদের। বাঙালী কালীমন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মাঝখানে এই স্কুল মন্দিরটির অবস্থিতি ও গঠন কারুর দৃষ্টি এড়াবার নয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান তথাগতের ধ্যান-গঙ্গীর মূর্তি। পীতিবসন ভিক্ষু আছেন কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন রবীন্নাথের বিশেষ অনুরূপী ছিলেন। কবিত্ব স্মৃতিচিহ্নস্থলে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন মন্দিরাসনে। রবি-বকুল বৃক্ষ রোপণানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন বাঙালী ঐতিহাসিক। ডষ্টির সুরেন্দ্রনাথ সেন। তারত সরকারের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষক, কিপার অব ইলিপোরিয়েল রেকর্ডস।

সেন মহাশ্ব এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুল্যতার অধ্যাপক ছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তার গবেষণার মূল্য ঐতিহাসিক মণ্ডলীতে প্রদ্বার সঙ্গে স্থির। স্থীর বেতনের সরকারী চাকুরীতে অন্যায়স জীবন যাপন করেও যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্যচর্চা করেন এবং অঙ্গফোর্ডের ডিকী পাওয়ার পরেও যে স্বল্পতর ঐতিহাসিক বাংলায় ইতিহাস রচন করেন, বঙ্গবাণীর সে সেবকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেন বিশিষ্ট। এর পৈতৃকবাস বরিশাল জেলায়। বাচন তঙ্গীতে তার আভাস পাওয়া যায়।

রিডিং রোডের একপাশে মন্দির, অন্যদিকে কোয়ার্টার। গড়ন্মেটের কেরানী ও অনুরূপ কর্মচারীদের বাসস্থান। লম্বা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইঁরেঞ্জী L অক্ষয়ের মতো একপ্রান্ত প্রসারিত, কোনটার বা E র মতো আকৃতি, শুধু মাঝখানের বাড়তিচুক্ত বাদ। সামনে খানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোয়ার্টার,—সুন্দর এবং কুৎসিতের এত নিকট অবস্থিত সচরাচর দৃঢ়গোচর নয় কোনোথানে। এক একটা ব্যারাকে তিশি, চালিশটি পরিবারের বাসস্থান। অন্য বেতনের কর্মচারীদের জন্য সুলভ সরকারী আয়োজন। এ-পাড়াটা নয়া দিল্লীর ইন্স্ট য়েন্ট।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নয় এই কোয়ার্টারগুলি। বিশেষ করে সুলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে না। বেতনের এক দশশাখণ্ড ভাড়া। মাসের শেষে আলিস ধেকেই কেটে নেয় নিয়মিত। সেক্ষেটারিয়েটের কেরানীদের স্বানিধি বেতন ষাট টাকা। সুরারং ছাঁটাকা ভাড়ায় বাড়ি। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা রাজার, একটি ভাড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট বারান্দা। জেলের কল আছে, বাথকুম আছে, আছে ইলেক্ট্রিক আলো এবং—চমকে উঠো না যেন,—আছে বড় একটি সিলিং ফ্যান। বাড়িতে রোদ আসে, বাতাস আসে এবং খুলিবাব বাধা নেই। কলকাতা শহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ি কোটিকে শুটিক মিলে না।

শুধু বাড়ি নয়। ফার্নিচারও। বিবাহ সভায় সালকারা কল্যান মতো গড়ন্মেটের বাড়িও আসবাবপত্রসহ পাওয়া যায়। সেক্ষেটাল পি-ড্রেনেট-ডি'র ফার্নিচার। দু'টাকা মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যায় দু'খানা তত্ত্বাপোশ, একটি আলমারি, একটি টেবিল ও তিনখানা চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনে খোলা মাঠচুক্তি নিত্রে এক একটা 'ক্ষোয়ার'। অধিকাংশই

ভারতে ত্রিপ্তি সাধারণ প্রতিষ্ঠাতাদের নামের স্থারা গৌরবাবিত। ক্লাইভ স্কোয়ার আছে সেই ইংরেজ উপর্যুক্তের নামে যিনি পল্লীর আন্দকাননে ভারতবর্ষে ত্রিপ্তি সাধারণের ভিত্তিক্ষেপন করেছিলেন। যিনি আলী টাকা বাংসরিক বেতনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরানীরাপে ভারতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালীরাপে। ১৭৪৪ সালে মাঝার্জে আগত খ্যাতিহীন, বিস্তুর রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ৯ই মে যখন সেনানায়ক ক্লাইভ রাপে প্রত্যাবর্তন করলেন ইংল্যান্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টসমাউথ বন্দরে, তখন ইংল্যান্ডের এ্যান্যুলে রেজিস্টারে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য ছিল,—“এই কর্নেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় দু’ কোটি, তাঁর দ্বীর গহনার বাত্রে মণিমুক্তা আছে দু’ লাখ টাকার। ইংল্যান্ড, ফ্রেন্স্যান্ড ও অয়ল্যান্ডে তাঁর চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।”

স্কোয়ার আছে লর্ড ডালহোসীর নামে, যিনি একে একে পাঞ্চাব ও ব্রহ্মদেশ যোগ করলেন ভারত সাধারণে, জোর করে দখল করলেন পেশোয়াদের সাতারা, কেড়ে নিলেন ধীরী, নাগপুর, নিজামের বেরার, নবাব ওয়াজেদ আলী শার কাছ থেকে অযোধ্যা।

স্কোয়ার আছে ওয়ারেন হেটস-এর নামে, যিনি কাশীনগরে চৰ্দিঙ্গের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বহু লক্ষ মুদ্রা, অযোধ্যায় বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন নৃনাথিক দেড় কোটি টাকার। যার কুশাসন ও কুকার্মের সুদীর্ঘ তালিকা ত্রিপ্তি পার্সামেন্টের বিচারসভায় অভৃতপূর্ব বাহিনীয় উদ্ঘাটিত করেছিলেন এডুমণ বার্ক। সে অপৰ্যাপ্তির গ্রামহর্ষক বর্ণনা শুনে পার্সামেন্টকে দর্শকের গ্যালারীতে মৃছিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ-বন্ধী।

আর আছে সিপাহী যুক্তের ছোট বড় মাঝারি ইংরেজ সেনাপতিদের নাম। হেভলক স্কোয়ার, আউটোরাম স্কোয়ার, উইলসন স্কোয়ার, নিকলসন স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কোয়ার নেই শুধু মেজের জেনারেল হিউম্যেটের নামে যিনি ১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীগাট সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহীকে হাতে পায়ে লোহার শক্ত বেঢ়া পরিয়ে সমষ্ট সৈন্যদের সামনে লালিত করেছিলেন। সেদিন নিরপেক্ষ ভারতীয় সিপাহীরা সাড়িয়ে দেখেছিল তাদের সঙ্গীদের এই অবশ্যাননা। তাদের মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চোখে ছিল আগুন। সে আগুন সহজে নেভিন।

পরম্পর রবিবার। সভ্যার প্রাক্তালে আসুন রজনীর ঈবৎ অঙ্ককার নামল শীরাটের ছাউনিতে। ত্রিপ্তি সৈন্যরা তৈরী হয়েছে চার্ট-প্যারেডের জন্য। ভারতীয় সৈন্যরা করছে কী? বোধ হয় বিজ্ঞাম। এমন সময় অক্ষয়াৎ আওয়াজ এল,—

গুড়ুম!

পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘূরিয়ে থরেছে বৃত্তিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে + বন্দুকের বোঢ়া টিপছে ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর ও আন্তর কাপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম ! গুড়ুম !! গুড়ুম !!!

উভয় ভারতে সিপাহী যুক্তের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্ববিহীন অসঙ্গবন্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনা বিহীন পক্ষতি, বিভিন্ন অংশে ঘোঘাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও একথা আজ ধীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ত্রিপ্তি শাসনের অবসান ঘটাবার ও স্বাস্থ্য গঠনে ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মীগাটের সিপাহীরা বোঢ়া ছুটিয়ে পরাদিন প্রভাতে এসে পৌছল দিলীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন দিলীর মসনদে বায়বের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব বা আওরঙ্গজেবের রংগুলিশীলতার লেপ ছিল না এই বৃক্ষ মূল সভাটের চরিত্রে। সিপাহীদের শৌর্য, শক্তি ও যুক্তোক্ত কাজে লাগাবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। জনসাধারণের সংগ্রামেক্ষু ত্রিপ্তি-বিহীনকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

মিল্লীর পরিধি সাত মাইল। অধিবাসীরা উন্মেষিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজের অন্তর্মন্ত্রে সজ্জিত চালিশ হাজার রংগনিপুর সিপাহী তাঁর পাহারা। নগর প্রাচীরের উপরে চোকচি বৃহদাকার কামান। দুর্গাভাস্ত্রে বৃহস্পতি বাস্তবখন। তা ছাড়া আছে আঁশও বাটি ছোট ছোট কামান। আছে বহু সুদৃঢ় গোলম্বাজ; —বেশীর ভাগই দুর্দিন পূর্বে ছিল ত্রিপ্তি সৈন্যদলভূক্ত।

তারা মুরোপীর মুক্তীরিতিতে সুশিক্ষিত, সুনিশ্চ এবং সুশৃঙ্খলাবক্ষ। দিল্লী দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় এজিনিয়ারেরা বারা আধুনিকতম এজিনিয়ারিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিল্লী অধিকারের ক্ষীণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত প্রিটিশবাহিনীর মনে। সেশমাত্র বৃক্ষসূক্ষ্ম সজ্জাবনা ছিল না দুর্গপ্রতলের।

কিন্তু তবুও সিপাহীয়া হারল। দিল্লী দখল করল ইংরেজ। ভারতে মুঠিম রাজাদের ঘটেল সমষ্টি। প্রিটিশবিহুর পূর্বে নির্বিত্ত সন্তাউ সাজাহানের লাল কেলার শীর্ষে উত্তোলিত হলো প্রিটিশ পতাকা।

নগরপ্রান্তে 'রীজের' ইংরেজ-শিবিরে সৈন্য সংখ্যা ছিল টোক হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এরা সবই মুরোপীয় নয়। আর সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই। আড়াই হাজার সৈন্য—বলা বাহ্য, তারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজনুগামী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাদের জন্য আজ একুশ, এগাঠো বা পাঁচ সাত করে তোপহস্তিয়ি বিধি আছে।

কর্মাল থেকে গ্রান্ট ট্রাক ওয়েডে প্রিটিশবাহিনী এসে শিবির হাশপন করল 'রীজে', যেখানে এখন দিল্লী বুনিভাসিটি। বর্তমান সবজীবিহুর ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী অনেক বশ যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যদের সেই অস্ত্রযী আবাস ভূমিতে পথে রাচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা, ফিজির, কেমেন্ট্রি বা ইকনমিজের নেট টোকে। তারই অন্তিদূরবর্তী একটি ভবনে উনিশ শ' চৰিশ সালে তিনি সপ্তাহের অনশন করেছিলেন মহাক্ষা পাণ্ডি,—দিল্লীর সাম্রাজ্যিক দাঙার প্রতিবাসকক্ষ। প্রথম সর্বমুক্ত মিলনের প্রচেষ্টায় সংগ্রহেন আহ্বান করেছিলেন পতিত মালবীয়াজি।

ইংরেজ জানতো, অন্তিভিলসে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ষে প্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূমসাংহ হবে চিরতরে। তাই সর্বোপর পথ করল তারা। জিতি তো বাদশাহ, হারি তো ফরিদ। ত্রিপুরার আর্কডেল উইল্সন তখন প্রিটিশ শিবিরের অধিনায়ক। তিনি জয় সংগ্রহে আশাবিত্ত হিসেবেন না।

গ্রীষ গোল, বর্ষা অঙ্গীত, শরতের প্রথমার্ধও বিগতপ্রাপ্ত। অর্ধেকের উপর ইংরেজ সৈন্য কুম, উদয়াম্বর ও অন্যান্য ব্যায়িতে কুম। পাঞ্জাব থেকে সেনাপতি লালেল ক্রমাগত উৎকৃষ্টিত পর পাঠাইলেন,—আর কতনিন? দিল্লী বিজয়ের আর বিলুপ্ত কত? সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাবেই সিপাহীয়া তরুণও আছে অনুগত, আহালার সেনানিবাসে দেখা বায়নি বিক্ষেপ। কিন্তু আর বেশী দিন শাস্তি রক্ষা কঠিন হবে। দিল্লী, দিল্লী, দিল্লীর উপরেই নির্ভর করছে ভারতবর্ষে জন কেন্দ্রসীমার ভাগ্য।

অবশ্যে সেন্টেন্টের পোড়ার দিকে কিরোজপুর থেকে হত্তিপুঁষ্ট বাহিত প্রচুর গোলা বাকুদ ও অন্যান্য আঝোরাজ এসে পৌছল 'রীজে'র ছাউনীতে। প্রিটিশ-সেনানামকদের প্রাপ্ত কিরে এল ভরসা, মনে এল সাহস। সেনাপতি উইল্সনকে অতিক্রম করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল জন নিকলসন।

চৌদই সেন্টেন্টের। গ্রামি আর নিশ্চেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজবাহিনী আকুশম করল দিল্লী দুর্গ। পূর্ববর্তী জয় দিন দিবারাত্রি ব্যার্লি গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর প্রাচীর বিফর্জ করা হয়েছে ধীরে ধীরে,—মূল অকুশমের মুখবজ্জ্বলণে। কাশীরী গেটের দিকে বশ বশ মনে হনো দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামান গর্জনে দুর্ক দুর্ক কম্পিত হলো দূর দূরাত্তের গহণবাক, তাদের অভিবর্ষণের রক্ষিত আভার সীমান্তীয় সিথির মতো রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই হরপশ্চ যুদ্ধ চলল প্রহরের পর প্রহর। অবশ্যে বিকট শব্দে কাশীরী গেটের কল্পনার বিষ্ফলতা হয়ে পড়ল ধূলার।

এজিনিয়ার বিভাগের ক্ষুস্ত একটি দল সরীসূপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্তোরকে অগ্নি সংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় কাশীরী গেট। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের। ইংরেজের ঐতিহাসিকেরা স্থীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে অটুভন ছিল ভারতীয়।

সেই বাহার পথে জয়মন্ত ভিটিশবাহিনী আক্ষে করল ভীমবেহে । বিশেষকে আক্রমণ করল বিশেষ তেজে । উচ্চুক্ত তরবারি হচ্ছে সেলাপতি নিকলসন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যসন । জানেক সিগাই নিশানা করল তাকে । মুকুট আর্টিলারি করে ধূমায় লুটিয়ে পড়ল নিকলসন । ওপি লেগেছিল তার কশালে ।

পরাজিত বৃক্ষ বাহাসুর শাহ প্রজ্ঞান করলেন দুর্গ থেকে । আজগোপন করলেন শিখী আশাদের চার মাইল দক্ষিণে ব্যাঘুনের সমাবি সৌধে । সেখানে এক মূলভাব ফরিদের নিলেন আবৰ । জনকৃতি এই যে, সেই ফরিদই তাকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের উপর বিভাসের এক তরুণ কর্মচারী হত্যানের হাতে ।

হাত্যা আজ সত্ত্বে
গাঁওয়ের নালা কুমারু,
শান্তি, আজ সত্ত্বে
বেশ্টান ফরিয়াদ ।

নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় বসিয়ে দেয়, তখন, হে শান্তি, অপনের হাতে মাঝে আওয়া নিয়ে আর যেদ করে লাভ কী !

বৰ্ষী সন্ধানে হত্যসন্ধান পালকী করে নিয়ে এল শিখীতে । সেখানে বিচার হলো তার । দণ্ড হলো নির্বাসন । ব্রহ্মদেশে । সেখানে পাঁচ কুরু পত্রে বৰ্ষীদাশীয় জীবনান্ত ঘটল তার । হত্যাগা বাহাসুর শাহ—তারতের শেষ যুক্তি সম্ভৱ !

ঠিক হেবানে বাহাসুর শাহ গৃহ হন, হ্যামুল্স চুইই প্রদলিন হত্যসন হেতুর করল আর তিনটি প্রাণত্বক । বাহাসুর শাহের মৃত্যু ও এক শোক । তারা বেঙ্গাই বয় দিয়েছিলেন । তাদের আশাস দেওয়া হয়েছিল যে, তাদেরও বিচার হবে বাহাসুর শাহের মতো ।

হত্যসন হালের একটি ঘোড়ার গাড়িতে জালিয়ে নিয়ে এল শিখীতে । শিখী পেটের কাছে এন্টে হত্যসন ধারাল সে গাড়ি । বকুল নিয়ে নিজ হাতে পুর পুর উপি করল বৰ্ষীদের ঠিক বুকের আকাশানে । রাজবৃক্ষ বর বর যাবার গাড়িয়ে পড়ল শিখীর ব্যক্তিমূর্তির পথে । মৃতদেহ নিয়ে চাঁদী চুকের উচ্চুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য অসমীয়া জাপে যাবা হলো তিন দিন । সন্ধানব্যবস্থারের বিকৃত মৃতদেহ দেখে নিউরে উচ্চ, পথচারীর দল, ব্যবহার অঙ্গসিক্ত চক্ৰ হার্জন করল নিউশে ।

সাত

সাতী শী, শিথুতত্ত্ব পুরা, আত্মহত্যাল অনুজ এবং প্রচুরাল দেবকের সৃষ্টি আছে আশাদের পুরাণ ইতিহাসে একাধিক । জনকতন্ত্রা শীতা, সন্দৰ্ভাত্মক বামচৰ, সুমিত্রানন্দন সংজ্ঞে এবং রামানুজের হনুমানের বাহিনী জানে আদেশের আশার সাধারণ । কিন্তু পুরী-অনুগত বাহীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্বান্তো দেবে আসা প্রয়োজন বৰ্ণনিমূল বাহী ইন্দুষ্টী বাজের বর প্রিয়নাথবাবুকে । ইন্দুষ্টীচৰণ-চারল চৰকৰ্তা বী প্রিয়নাথ রাম ।

প্রাকবৈবাহিক জীবনের পরিচালিতিতে ইন্দুষ্টী ছিলেন দাসগুপ্ত । দোকানেতে পড়েছেন ইংরেজী, সঙ্গীত সঙ্গীতনীতে শিখেছেন সেতার । বুল ছিভসের ইউকেজ পাত্রে নিয়ে মাঝেসবের লিনে ব্রাজসবাজে উপাসনায় কঠোরেন গান—গুচ্ছ, দুর্মি আশাদের পিতা । তার এক দাদা ডেলের অফিসার, অন্য ভাই ব্যারিস্টর ।

ইন্দুষ্টীর বাবার সিন্দুকে জালা ছিল প্রচুর, কিন্তু নিজের দেহে জাল ছিল না একটুকুও । ফলে কয়েক বছর আই. সি. এস, বিলাত দেশত, ডেস্টি প্রতিশির জন্ম অবধি অশেক্ষণ পর অবশেষে ঘোষণার প্রাপ্ত সীমায় পৌছে এক শত মাঘে যাদি শত্রুপকে পক্ষমাং তিয়ো কঠলমা হলেন প্রিয়নাথবাবুর । বিয়ের পরে কলের বদল হলো পদবী, বরের বৃক্ষ হলো পদ ; এ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে

সুপারিস্টেডেট। পয় আছে বটে আমাদের ইন্দুমতীর।

প্রিয়নাথবাবু তার শ্রীর নাথ তো নিচয়ই, বোধ করি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার পক্ষে —। থাক সে কথা। আমি তো আর তাকে জামাই করছি নে।

মহাদেও রোডে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িটি 'বি' টাইপ কোয়ার্টার। নয়া দিল্লীতে বাজারে ডিম থেকে শুক করে বসত বাড়ি পর্যন্ত সবই গ্রেড করা। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হীরার বিচার ঘৰ্জল্যে, মসজিদের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্মচারীর মূল্য নিকাশিত হয় বেতনে। পি. ডি. ভিল্ড. ডি'র খাতায় বেতন অনুযায়ী ভাগ করা আছে বাড়ি। পাঁচ শ' থেকে ছ' শ' টাকা মাহিনার কর্মচারীর জন্য 'এ' টাইপ কোয়ার্টার, চার শ' থেকে পাঁচ শ' ওয়ালারা পায় 'বি'। ছ' শ'র উপরে মাহিনে যাদের তারা পায় বাল্লো। তারও শ্রেণী বিভাগ আছে। শুধু গঠন বা ব্যবস্থায় নয়, অবস্থানেও। ঠিকানা ঘনেই বলে দেওয়া যায় লোকটার বেতনের পরিমাণ। হেস্টিস রোডের বাসিন্দা পায় তিনি থেকে চার হাজার, তোগলক রোডে তার নীচে। এক হাজারের বেশী না পেলে বাল্লো মেলে না রাইসিন। রোডে।

নম্বর মিলিয়ে সঞ্চান করলেম বাড়ির। বারাদ্দার পাশের ঘরে আধময়লা গেঞ্জি গায়ে একটি ভৃত্য ইলেক্ট্রিক ইঞ্জি দিয়ে একখানা চকোলেট রং-এর বেনারসী শাড়ির পরিচর্যায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেম, “এইটো প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি?”

“হ্যা, মিস্টার রায়ের বাড়ি।”

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কৃষ্ণিত ব্রেকার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল বাবু সঙ্গেধনটা ক্রোতার পক্ষে অবগুর্নেক্টর নয়। সূতরাঃ শ্রম সংশোধন করতে হলো।

“মিস্টার রায়কে একটু ব্যবহ দিতে পার?”

“আমিই মিস্টার রায়।”

গড় সেভ দি কিং। মিসেস ইন্দুমতী রায়ের স্বামী যে সকাল আটটার সময় শাড়ি ইঞ্জি করবেন তা, করনা করব কেমন করে? কিন্তু এখন তো আর বিমবার উপায় নেই। ন' মাসিমার সঙ্গে তাঁর শ্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলো, দিতে হলো সংক্ষিপ্ত আল্পপ্রিচ্ছয়। মিস্টার রায় অস্তর থেকে যথারীতি নির্দেশ কৈ করে প্রয়ঃ কর্মে নিয়ে বসালেন। ‘উনি’ চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে না আব্দাস দিলেন।

ড্রয়িং-কুম্পটির মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা, তার উপরে ছেট রিঞ্জাপুরী কাপেট। টিপাই-এর উপরে পুল্পহীন জাপানী কাঁচের ফুলদানী। এক কোণে একখানা ভাঙ করা কেবিসের ইঞ্জিচেয়ার। মাথার কাছটা উপরেলেকারীদের তেলসিক্ষ শিরের অজ্ঞ চিহ্নের দ্বারা মণিন। দেয়ালে কাঁচ দিয়ে ধাঁধানো খান ছুই সুটিপিলের নমুনা। এই শিবল কাঁককর্মের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুমাত্র সংশয় বটে সেজন্ম বড় বড় হয়তে এক কোণে সেখা আছে ‘ইন্সু’। একটাতে একটা ঝুঁড়ি তাতে করেকটি গোলাপ মূল। আর একটাতে একটা বিচ্ছি বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রং-এর যদৃঢ় এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার; ‘ডিবজিও’র বললেই হয়। কুকুরটির মাথার উপরে ইঁরেজী অক্ষরে লেখা —গড় ইজ ডড। বোঝা গেল গৃহস্থানী ধর্মশীলা, কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য তো সারমেয়ের প্রয়োজন হিল না। বোধ করি, সেখার ভুল। ডগ ইজ গুড হবে।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে খানিক আলাপ করা গেল। আলাপ অর্ধে তিনি বক্তা, আমি শ্রোতা। প্রায় সবটাই ‘উনি’ প্রসঙ্গ। উনি আবার বিছানায় এক পেয়ালা গরম চা না পেলে উঠতে পারেন না। উনি রোজ নিজে দাঢ়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল ডাল মেপে দেন। বাজারের খাবার উনি বাড়ির প্রিসীমানায় অসতে দেন না। নয়াদিল্লী বজ মহিলা সমিতির যা কিছু তা তো সব উনিই করেন। লেজি মিত্র তো উনি ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ରାଯ়ର ପ୍ରବେଶ । ମି: ରାଯର ଉତ୍ଥାନ । ଏଟା ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ମୀତି ।
ଗୃହସମୀକ୍ଷାରୀ ରାଯ ଆସନ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଗୁହେ ହାଲାଭାବେର ବିକ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣା ଦିଲେନ । ତଥେ ଛାମ୍ବ ପରେଇ ଶୁରୁହୋଯାରା ଝୋଡ଼େ ବାଂଳୋ ପାଓୟାର ଆଶା ଆଛେ । ଏବାଡିତେ ସବଦୋର ଇଚ୍ଛେମତୋ ସାଜାତେ ପାରେନନି । ତବୁও ତୋ ସିମଳା ଥେକେ ଯେ ଆସବାବପତ୍ର ଏନେହେଲ ତାର ସବ ଏଥନେ ପ୍ରାକିଂ ଖୋଲା ହୁଯନି (ସିମଳା ଥେକେ ଏମେହେଲ ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟମାସ ହଲୋ) । ଫି ବହର ଦିଲ୍ଲୀ-ସିମଳା କରେନ । ଶ୍ରୀଅକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀତେ ଏହି ପ୍ରଥମ । ଏବାର ଗଭରମେଟ୍ ଅବ ଇନ୍‌ଡିଆର ଶୈଳ-ବିହାର ବଙ୍ଗ । ନତୁନ କମାନ୍ଦାର-ଇନ୍-ଟୀଫ ନାକି ବଲେହେଲ, ସିମଳା ଗେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟେ ବିଷ ଘଟିବେ । ଶୋନ ଏକବାର ଯତ ଅନାସ୍ତିତିର କଥା ! ଆରା ବୈଶି ଗରମ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ତିନି ସିମଳା ନା ଗିଯେ ପାରିବେନ ନା, ତା ବାପୁ, ତୋମରା ଯାଇ ବଳ ନା କେନ ।

ବେବି—ଅର୍ଥାତ୍ ନ' ମାସିମା ଏଥିନ ଆଛେ କୋଥାଯ ? ତାର ମେଯର ବିଯେ କତ ଦୂର ? ଛେଲେ ପଡ଼େ କୋନ କ୍ଲାପେ ? ତାର ନିଜେର ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖାର ଅଭ୍ୟାସ କମ । ଅବସର ଓ ପାନ ନା । କତ ଯାମେଲା । ଏହି ତୋ ଆଜି ଚାରଟାଯ ଆଛେ ଏକ ପାଟି । ହାଗା ଶାଡ଼ିଟା ଇତିରି କରେ ମେରେହେ ତୋ ? ପ୍ରିୟନାଥବାସୁର ପ୍ରତି ।

ହାତେବ ଘଡ଼ିର ପାନେ ତାକିଯେ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେମ ।

ଏଥନି ଉଠିବେ ? ହ୍ୟା, ବେଳା ହୁଯେହେ ବଟେ । ଆହ କିମିନି ? ଦିଲ୍ଲୀ ଥେକେ ଯାବେ କୋଥାଯ ? ବିଲେତେ କୀ ହଲୋ ? ଯୁଦ୍ଧ ନା ଥାମଲେ ତୋ ଆର ଯେତେ ପାରଇ ନା । ବସିଂ-ଏର ସମୟ ଲଭନେ ଛିଲେ ବୁଝି ? ମେଖାନକର ଅବହ୍ଵା କି ରକମ ? ବାଜାରେ ଡ୍ରିନ ସ୍ୟାମ୍ପୁ ପାଓୟା ଯାଯ ? ଟ୍ୟାଙ୍କି ଲିପ୍ତିକ ? ଏଥାନେ ତୋ ତାଇ କିଛି ହିଲେ ନା ! ଆଜା, ଏକଟୁ ଚା ଟାଓ ତୋ ଥେଲେ ନା । ଓର ଆବାର ଆପିସେର ବେଳା-ହଞ୍ଚେ, ଆଜା ଆର ଏକଦିନ ଏମେ ଥେଯେ ଯେଓ କିନ୍ତୁ ।

ଆରା ଏକଟି ଭରତୋକେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖି କରିବାର ଫରମାଶ ଛିଲ । ଠିକାନା ଜାନା ଛିଲ ନା । ପ୍ରିୟନାଥବାସୁ, ଧୂଡ଼ି, ହିନ୍ଦୀର ରାଯକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେମ,—“ତି. ଆର. ଭେକ୍ଟଶେରଗେର ବାଡ଼ିଟା କୋଥାଯ ଜାନେନ ? କୋନ ଡିପାଟିମେଟ୍ରେ ଯେଣ ଏୟାସିସ୍ଟ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ଟେଟାରୀ ?”

ପ୍ରଚଗ ବିଷେରଗଣ ବଲେ ଏକଟା କଥା ବାଂଳା ପତ୍ରିକାଯ ଆଜକାଳ ପ୍ରାୟଇ ଦେଖି ଯାଇ । ମେଟୋ ଠିକ କି ରକମ ଜାନା ଛିଲ ନା । ପ୍ରିୟନାଥ ରାଯର ଅବହ୍ଵା ଦେଖି କିଛିଟା ଅନୁମାନ କରିବେ ପାରିଲେମ ।

“ଏୟାସିସ୍ଟ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ଟେଟାରୀ ! ଭେକ୍ଟଶେରଗଣ ବଲେହେ ବୁଝି ? ଚାଲ, କେବଳ ଚାଲ । ଚାଲ ଦିଲେ ଦିଲେଇ ଗେଲ ମାଦ୍ରାଜିଟା । ଜାନେ, ଆପଣି ନତୁନ ଲୋକ, ଧରିବେ ପାରିବେନ ନା । ଏୟାସିସ୍ଟ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ଟେଟାରୀ, ହଂ । ରିଟାଯାର କରାର ଦୁ’-ଏକ ବରଷ ଆଗେ ଯେ ହେତେ ପାରେ ମେ ତୋ ଭାଗ୍ୟବାନ ! ଏଥି ଯୁଦ୍ଧର ବାଜାର । ତାଇ ମେକେନ୍ ଡିଭିଶନ କ୍ଲାର୍କେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପାରିଟେନ୍ଡେନ୍ଟ ହଞ୍ଚେ । ନିଲେ ମଶାଇ, ଏୟାସିସ୍ଟ୍ୟାନ୍ ହତେଇ ଯେ ଚାଲେ ଶାକ ଧରେ । ଆମି ଯେବାର ସୁପାରିଟେନ୍ଡେନ୍ଟ ହଲେମ, ଉତ୍ତରେ ସାହେବ, ସାର ଜନ ଉତ୍ତରେ, ପରେ ବାଂଳାଦେଶର ଗଭରନ୍ସ ଅଧିକ ଉଠିଲା,—ଡେପ୍ଟି ମେକ୍ଟେଟାରୀ । ଡେକେ ବଲିଲେ, “ରଯ, ତୋମାର ମତେ

ଏମନ କାଙ୍କର ଲୋକ—” ।

ଅଭାବ ଅନୁତଷ୍ଟ ହଲେମ । ଅନିଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ନିଜେର ଅଞ୍ଜାତେ ଓ ଯେ ଅପର ଲୋକେର ମନ୍ତ୍ରାପେର କାରଣ ହତେ ହୁଏ, ତାରି ଦୃଷ୍ଟିଷ୍ଟ ।

ଭେକ୍ଟଶେରଗେର ଗୃହ ଆଛେ: ଗୃହିଣୀ ନେଇ । ଥାକୁଳେ ବିପଦ ଛିଲ । ତିନି ପ୍ରାଚୀନ-ପଢ଼ୀ ହଲେ ତାକେ ପାଲାଯ ପଢ଼ି ଦିଲେ ହେତୋ, ଆଧୁନିକା ହଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୟାମୀର ବକ୍ତ୍ର ମନେ ପାଲାଯନ ଓ ପରେ ବାଂଳୋ ସିନେମାଯ ଲାଗିଥାଏ । ମାତାଭାବ ବର ନିଯେ ଘର କରା ଯାଇ, କଲହ କରା ଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟାରୀ ସ୍ୟାମୀର ମନେ । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍‌ଦୀନ ମାତ୍ରିକା ଶ୍ରୀ ହନ୍ଦୀର ମନୋ ଦୂର୍ଗା ନେଇ ଜଗଗେ । ପ୍ରେମ ଭାଲୋ, ବିଦେଶ ଦୁଃଖରେ, କିନ୍ତୁ ସବ ଚେଯେ ମାନ୍ୟାକ ଟିକିଫାରେସେ—ଯେ କାହେଉ ଟାନେ ନା—ଦୂରେଓ ଠିଲେ ନା—ଶୁଧୁ ତୁଲେ ଥାକେ ।

ଭାବେରା ବାଧେନ, ଧାନ, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରନ ମମନ୍ତ୍ରିଷେ ଭଗବାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ହଲେ ଦୈତ୍ୟର ଲାଭ ଘଟେ ନା । ଯାଧ୍ୟବାର ଅର୍ମନିବାସ ୬

বরদারাজলু ডেক্টরণ উগবান প্রাণ্তির জন্য উদ্বৃত্তির নন। কিন্তু ভক্তের একান্তিকতা নিয়েই আরাধনা করছেন সেক্রেটারিয়েটের। আপিস, আপিস, আর আপিস। কাজ, কাজ আর কাজ।

সকালে সাড়ে নটায় সবে মাত্র ফরাস যখন ঘর ফৌট দিয়ে গেছে তখন এসে বসেন টেবিলে। অপরাহ্ন গড়িয়ে যায় সঙ্গীর আধারে, উর্ধ্ব ও অধস্তুন কর্মচারীরা চলে যায় নিজ নিজ বাসায়, সহকর্মীরা একে একে করে প্রস্থান। এক ডেক্টরণ কাজ করে যান অনন্যমন। বাড়ি ফেরেন কখন রাত আটায়, কখনও বা তারও পরে। শ্রীষ্ঠি, বর্ষা, শীত, বসন্ত এ একই ধারা। ছুটি নেই, ক্যাসুয়েল সীভ নেই। রবিবারে দুপুরে অনেক দিন চলে আসেন আপিসে। কাইল দিয়ে লেখেন নেট, ফ্লাগ দিয়ে সাগ দেন “ফ্রেশ রিস্ট” অথবা “পি. ইউ. সি—পেপার আভার কনসিডারেশন।” বজ্রু বাঞ্ছবেরা ঠট্টা করে বলে, ডেক্ট, কেবল খেটেই গেলে, জীবনটা ভোগ করবে কখন?

ডেক্টরণ হাসেন আর ডাইনে থায়ে মাথা নাড়েন। বোধ হয় মনে মনে বলেন, কী আহাম্মক! হোয়াট্ট ফুল-অ! ভোগ? হঃ, থার্ড ডিভিশন ক্লার্ক থেকে সেকেন্ড, সেকেন্ড থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট, এ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে সুপারিস্টেণ্ট, সুপারিস্টেণ্ট থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। অনেকটা পাই। ভোগের জন্য জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রযোশন, চাই উন্নতি। চাকুরি যে তুর মর শ্যাম সমান।

ডেক্টরণের এক অনুজ ছিলেন বিলাতে। আই. সি. এস. মানসে। সেখানেই পরিচয়। ভাই-এর অধাবসায় লক্ষ্য করেছি তাঁরও চরিত্রে। আশা করি, একদা সিভিল লিস্টের পাতায় নাম ছাপা হবে সঙ্গীরবে।

ডেক্টরণের স্বজ্ঞাতিয়েরা নয়াদিলীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতায়। লালদীঘির কাছে যে বাড়িতে এখন বালোর লাট ধাকেম, সেখানে বসতি ছিল ওয়ারেন হেটেস থেকে লর্ড হার্ডিংের। তখন সেক্রেটারিয়েটে বাঙালী ছিল বহু। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। তখন থেকে তাদের সংখ্যা হ্রেচে হ্রাস, অতঃপর পাঞ্জাবী, মারাঠী, পুরুষাটি নানা জাতি এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকরির মসনদ। সে অভিযানে মাদ্রাজীয়া সর্বাশ্রে। তারা খাটে বেশি, কথা কয় কম, ফাঁকি দেয় কদাচিং।

নয়াদিলীতে মাদ্রাজীদের ক্লাব আছে, সংজ্ঞ আছে, ফুল আছে। বোর্ডিং হাউসও আছে একাধিক। সেখানে স্কুলের ডেরের মতো ছোট ছোট টেবিল। তার উপরে কদাচিপত্রে আহার। চার আনায় মিলে স্থাথম, কুরু, সহর ও আঘালম। একজন ভায়িল বা অঞ্জ সেক্রিয়ের নিয়মিত খাদ্য। কোনোদিন ওর সঙ্গে পাওয়া যায় তৈয়ারপত্রচত্বি অর্ধেৎ নায়কেরের ঝুঁটি সহযোগে দৈ। সেবিন তো সীতিমতো ভুরিভোজন।

শুধু অশনে নয়, বসনেও যথেষ্ট মিঠাচারী/দাঙ্কিণাত্তোর লোক। একখানা চাদর দ্বিখণ্ডিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ ফুটয়া গাঢ়াবরণ। ফাঁধে একটি তোয়ালে, পায়ে একজোড়া স্যান্ডেল। বাস। আপিস ছাড়া সর্বত্র স্বচ্ছচিত্তে চলাফেরা করে এই বেশে। আর যাই হোক, পোষাক নিয়ে শোক করে না মাদ্রাজী কোনদিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাহল্যবর্জিত। ভূত্য পরিমিত। অবশ্য সংখ্যায়। মূল্যে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী গৃহিণীরও কানে আছে হীরার ফুল। তার দাম শুনে অনেক বাঙালী স্বামী চোখে সর্বে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাদ্রাজী তরঙ্গীদের রূপ নেই, কিন্তু রূচি আছে। তাদের গৃহস্থার সকালে সঞ্চায় আলিপ্পনের দ্বারা সুদৃশ্য, তাদের কবরীয়েজন পুষ্পস্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে দক্ষতা আছে প্রায় সবারই।

সদ্য পরিচিত একজন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনারের। ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা

পৃষ্ঠান্ত

মাঝে পান। অথচ আনন্দের অভিযন্ত মেঘে দমনের ক্ষেত্রে তবু জলপিণ্ড হওয়ার উপরোক্ত। কিন্তু তার দ্বির পারদর্শিতা আছে দীপ দমনে। অসূর সূর দুটি বন্ধনের ভাবাব্দ্য। জগৎ যদিও এই অভিযন্ত প্রথমে হজর মধু-কৃষ্ণ। হস্তম চিন্তে পদ্ম করা দেখ তার জোড়া-সজড়ার ক্ষেত্রে আবেগুর্ণ।

খাঙ্গালীরের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের ভবান এইখালে। আগতার এবং আনন্দের পাঞ্জাবীর শুধু মজার্ম মংগ, আলট্রা মজার্ম। যুবক, বৃক্ষ সদাই ছিলে কর্মজ উর্বশাসে বিজ্ঞানীর মহল। শুধু হেলেনের হলে কাঁচি ছিল ন ন। মেয়েরাও।

যেস, ক্লায় ও কানিভাল—অতি আধুনিকতার এই তিনি ভীর্তসেন্ট পাঞ্জাবী মহিলাদের প্রধান পাতা! তারা জার মাউন্ট শ্রেণী সাধার করতে পারেন হাসতে হাসতে। রঞ্জনীর শ্রেণ প্রহৃষ্ট কল্পটুট নাচতে পারেন অঙ্গুষ্ঠ চৰাগে। তাঁদের মেহে শোভার চাইতে সন্তান অধিক। তারা বিজেয় আলিতে শৰী, আজে বিপুল। তাঁদের বৰ্ণ শৌর, কিন্তু আলম লালিতালীন। চাকর-চাকরুনীদের শাসনকার্যে রহতে উত্তম-মধ্যম ঝোয়াগ করতে বিধা করেন না একচুকুও। মেহে কিবো মনে পাঞ্জাবীদের নহিকো কোমলতা।

তারতবর্ষে যুরোপীয় ভাবধারার প্রথম উত্ত্বে ঘটিল বাল্লা দেশে। ইংজেলী শিক্ষা ও সভাভাবকে প্রথম বরণ করল বাঙালী। সে-যুগের বাঙালীর প্রাপ্তির্ভু ছিল আরু, প্রতিভা ছিল প্রাপ্ত। উৎসেরে শাহিদ্য, বিজ্ঞান ও সত্যাকার সে গুলাধৰকৃত করল না, করল আরু। আপনি জীবিত্য ও মর্ত্ত্যের জ্ঞানক রসে পরিপাক করে জীবক সে অন্যান্য করল। পশ্চিমের চিত্তাধারাকে সে ধার করল না, ধারণ করল। তাই অঙ্গুষ্ঠীর মধ্যে সভ্য হলো মাইকেল মধুসূন, বিবেকানন্দ ও চিত্তগুণেন দাশ। সাহিত্যে শিয়ে ও লেখিকাদ্বাৰা বাল্লাদেশ সুচনা করল সমৃদ্ধিশুক্র মন্দিগুপ্তের, আলম দেশাঞ্চাবোধের অভূতপূর্ণ প্রেরণা। মৌবলকে দিল অস্ত্যয়মাৰ, নয়ীকে দিল আঘাতেনন। পৈদিন সর্বভারতীয় অধিনায়িকার অন্দেনে অধিষ্ঠিতা হলোন কজজমনী।

যুরোপের সংস্পর্শে জেহেছে পাঞ্জাব। বাল্লার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় সেড় শত নৎসুর পরে লর্ড ডালহোসী স্বত্ত্ব কয়েছিলেন পাঞ্জাব। কিন্তু যুদ্ধাপকে পাঞ্জাব অন্তরের মধ্যে পার্যনি, শুধু বাহিরে থেকে কয়েছে অন্বর্তন। যুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে অনুসৃত করেনি, অনুকরণ করেছে। সে তারতবর্ষে দেয়ানি কাব্য, দেয়ানি সঙ্গীত, দেয়ানি বিজ্ঞান। দিক্ষে পারেনি দেশসেবার আদর্শ। আধুনিক তারতবর্ষে তার দান একলাম পি. ডালিউ. ডি'র এজিনীয়ব, পৈনাদলের সুবেদার এবং আই. এম. এসের তাত্ত্বার। একমাত্র লাজপৎ রায় ছাড়ি পাঞ্জাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কেলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীবির আকাশ চতুরুক্ষ। কিন্তু এখনকার পোলমার্কেট সার্থকনাম। সেই পোলই বট। চারটি রাস্তার সংগমে স্থলে বৃত্তাকার ঘোষের মতো এ বাঙারটি। সেতুলা বাঢ়ি। উপরে ন্যাজীয় দোকান, নীচে শাকসবজী, মাছ, মাসে, ফুল ছিলোনি। পৃথক পৃথক কক্ষ। ইংজেলীতে লেখা আছে বিজ্ঞানি—কেন্টাকে মাছ, কেন্টাকে বা ধান। প্রবেশপথগুলিতে সুস্থ তামের জাল-ঝাটা দুরজ। স্ট্রীং দেওয়া আছে, যাতে আপনি এক হয়ে যায়। মাছের ঘরটিতে ঝুঁ সিমেন্টের বেলীতে রাখা হয় মাছ, জল উপর দিয়ে পেছে জলের কলের সচিদ্ব পাইপ। ছিহুপথে অবিরাম বিলু বিলু করে বরছে জল। আপনি ধূইয়ে নিজেহে গৈরিটি। আইসচেটের ভিতরে থাকে মাছ। পরিষ্কার, পরিষ্কার। মাঝিয়ে উপন্থিত নেই, কৰ্মমান্ত জল সিঁড়নে পফিল হওয়ার আশঙ্কা নেই। ক্রেতাদের বসন। মার্কেটের দু'ধারে মনোহারী দোকান, ধূলি ও ময়রা ইত্যাদি। বাঙালীর দোকান আছে কয়েকটি, তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সন্দেশ ও ধূমানা। বাঙালীর খাবার।

গোল মার্কেটের পথে আছে লেডি হার্ডিঙ্ক কলেজ, ভারতবর্ষে পুরুষের সম্পর্কশূন্য একমাত্র

মহিলা মেডিফেল কলেজ। বিদ্যার্থিনীদের মধ্যে গ্রাংলোইভিয়ান আছে, মাঝারী আছে, মারাঠী আছে, আসামী আছে। বাঙালী নেই একটিও। পাঞ্জাবী এক অসাধারণ বক্তুর শ্যালিকা পড়ে ফৌর্ণ ইয়ারে। সুর্দশনা। বাংলার বাইরে কলেজ যুনিভার্সিটিতে সুদৰ্শনীর সাক্ষাৎ মিলে। রাপের অঙ্গাবটাই সেখানকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কারণ নয়। পড়ানুটা নয় বিয়ের আগের স্টপ গত্তাপ।

মেয়েটি মেধাবী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পরীক্ষায়। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সার্জিনতে আছে বেলী। পাশ করে হবেন সার্জেন। সর্বশেষ।

প্রাচীনারা হাতে ধরতেন সম্মার্জিনী। ঘরের মেঝে থেকে অবাধ্য স্বামীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত সর্বত্র তার অপক্ষপাত ব্যবহারের দ্বারা সংস্রব্যাতাকে তার নিরুক্ত রাখতেন। আধুনিকাদের হতে শোভে ভ্যানিটি ব্যাগ। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্বামীর হাতয়ে ত্রাস এবং পরের স্বামীর হস্তয়ে চাক্কলের সংক্ষার করে। অতি আধুনিকারা যদি ধরেন ক্রসেপস তবে বেচারী পুরুষ জাতিকে আস্তরক্ষ সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিরে।

রসবোধ আছে তুরুণী। কলহাস্যে উচ্ছিসিত হয়ে উঠলেন।

লেড়ী হার্ডিংজে বাঙালী ছাত্রী না থাকলেও অধ্যাপিক আছেন একজন। মহিলার এক ভাই আই- সি- এস, এক ভাই এম- এস, দু' ভাই একাউন্টেস সার্ভিসে উচ্চপদস্থ অফিসার। এক মোম শিল্পী। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'জার্নেল অব সাইন্টিফিক আব্দ ইভান্টিয়াল রিসার্চ'-এর চিত্রসম্পাদিকা। অন্য ভাই বোনেরা সকলেই কৃষ্ণ। তিনি নিজে স্ট্রাইড- এম- এস. অর্ধাং আই- এম- এসেরই মহিলা সংস্করণের অঙ্গভূক্ত। মাইনে পান অনেক, ডাঙুরী করে আয় করেন যথেষ্ট, ভৱ ব্যবহার, অমায়িক ভাষ্য, সূচনা আচরণ। লেড়ী ডাঙুরীর গুরু নেই কোনখানে। কলেজের সংলগ্ন সরকারী কোয়ার্টার। সেখানে গৃহসজ্জায় গৃহকর্ত্তার সুরক্ষির পরিকৃট।

নয়াদিলীতে মহিলা ডাঙুর আছেন একাধিক। যুক্তপ্রদেশের আছেন জন দুই। লেড়ী হার্ডিংজের যিনি প্রিলিপাল তিনি দক্ষিণ দেশীয়। একটি আছেন পাঞ্জাবী। এর জনক ধরেমবীর পাঞ্জাবে সুপ্রিচ্ছিত, জননী যুরোপীয়। তারা উভয়েই জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মহিলা বিয়ে করেছেন একটি বাঙালী। এরা দুজনেই ডাঙুর। স্বামী ছী দুজনেই রাজনীতিক বা স্কুল মাস্টার হওয়ার চাইতে ভালো। পলিটিক্যাল ইন্সিনিয়ার মতো সাংগৃত্যেও ডিভিশন অব সেবার আছে। সেখানে ছীর অংশ কথা বলার, স্বামীর অংশ কথা শোনার। দুজনেই বক্তা হলে গার্হিত স্বাস্থ্য রক্ষার নিষ্ঠারণ বিষয় ঘটে।

কন্ট প্রেসকে বলা যায় দিল্লীর টেলিভি। সাহেবী এবং সাহেবী ধরনের সোকান পদার সেখানে। স্যুট বানাবার দজী, ফটো তোলার স্টুডিও, প্রতিসন্দেশের স্টোর, চুলে চেউ খেলাবার বিউটিপার্লার, লাক খাওয়ার হোটেল, সিনেমা দেখবার ছবিঘর,—সবই এই কন্ট প্রেসে। শুধু চোরঙী নয়, ক্লাইভ স্টুডিও। ব্যাক ও অপিসপাড়াও এইটৈই। যার্ড কোম্পানীর পেটেট স্টেশন, মাটিনের টাইলস, ডালাম্বায়র সিমেন্ট কিনতে হলে আসতে হবে কন্ট প্রেসেরই আশেপাশে।

কন্ট প্রেসের নামকরণ হয়েছে বাজা পত্রম জর্জের পিছুবা পরলোকগত ডিউক অব কন্টেয় নাম। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মেসের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদ সৃষ্টি হলে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করাতে ভারতে আসেন তিনি। জালীয়ানওয়ালাবাগের নরস্থান নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তখনও স্পষ্ট জাগ্রত ভারতীয়দের মনে। বৃক্ষ ডিউকের উদ্বোধন বক্তুত্যাগ তার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, হিসে আন্তরিকতার সূর,—“দু’পক্ষেই ভুল কৃটি ঘটেছে বিষ্টি। আজ তার পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সবাই অতীতের কথা বিস্মিত হই, পরম্পরাকে ক্ষমা করি। ফরগিত আজড ফরগেট।”

କିନ୍ତୁ ଫରାଗୋଟିନେସ ତୋ ଚଲେ ତୁମ୍ହି ସମାନେ ସମାନେ । ଶାସକ-ଶାସିତର ମଧ୍ୟେ ତାର ହିତି ପଞ୍ଚାତ୍ମକ ଜଳବିଦ୍ୟା ମତୋଇ କ୍ଷଣିକରେ । ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ନତୁନ କରେ ଶ୍ୟାରଗେର କାରଣ ଘଟେ ଏକ ପଢ଼କର କ୍ଷମତାଗର୍ବିତ ଆଶାଳାନ ଓ ଅପର ପକ୍ଷେର ନିରପାୟ ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ । ଜାଲିଆନାନ୍ୟାଲାବାଗ ଭୁଲାତେ ନା ଭୁଲାତେ ଆସେ ହିଜୀ, ତାର ଯୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଣୀ ମିଳାବାର ଆଗେ ଘଟେ କୌଥି ବା ତମଳକ ।

କଣ୍ଟ ପେସେର ଆକୃତି ଗୋଲାକାର । ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଦିକେ ମୁଖ କରେ ଏକ ସାରି ମାଳାନ । ତାର ପିଛନେ ଆହେ ଅନୁମତ ଆର ଏକ ସାରି । ତାମେର ମୁଖ ବାହୀରେ ଦିକେ । ସେଟାର ନାମ କଣ୍ଟ ସାର୍କାଙ୍ଗ । ଯୋମାନ ପଞ୍ଜଭି ବିରାଟାକାର ଧାମେର ଉପରେ ପ୍ରସାରିତ ବାରାନ୍ଦା । ଦେଖାନେ ଅପରାହ୍ନ ଫେଲାଯ ଭିଡ଼ ଅମେ ଶୁବେଶ ନରଲାରୀର, ସଙ୍ଗୀ କମେ ସୌଧୀନ କ୍ରେତାରା, ଆଲୋକୋର୍ଜୁଲ ଶୋ-କେସ ବିଚିତ୍ର ଭାବେର ଲର୍ମ ପାଯ କୌତୁଳୀ ଜନତା ।

দালামের পরেই প্রশ়্না রাজপথ। তার ঠিক মাঝখানে সাম্য দাগ দিয়ে পার্কিং-এর নির্মাণ, সেখানে থাকবে অপেক্ষমান মোটরকার ও টাঙ্গ। দু'পাশ দিয়ে চলে যানবাহন। রাস্তার ওপরে বিশ্বীন পার্ক। শৌগ্যসূচের দ্বারা ফুটপাথ থেকে বিছিন্ন। সেখানে বিজ্ঞামৰ্যাদার জন্ম আছে বেকি, ক্লিফটনগ্রাম শিশুদের জন্ম আছে তৃণজ্ঞানিত অঙ্গন এবং পুন্ডিলালীশ্বরের জন্ম আছে অভিজ্ঞ দুর্ঘটন ঘায়েজন।

ଖାଲ କିମ୍ବାଟାର ମୂଳ୍ୟ ଯେ କଣ ତା ଜାନା ନେଇ ବାଙ୍ଗାଦେଶେ, ଯେଥାମେ ଦୁଇମିନ ନା ହାଟିଲେ ପାଦ୍ୟର
କ୍ଷତ୍ରରେ ଗଜାଯ ଘନ ଘାସେର ବନ । ଅପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଘାସ ଥେତେ ବଳେ ଗାଲ ଦେଖ୍ୟାଇ ଉପାୟ ନେଇ ଉତ୍ତର
ତାଗାତ । ଡାତର ଚାଇତେ ସେଟା ଅନେକ ବୈଶି ଦୂଘଟ । ଶ୍ରୀପ୍ରକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜାପ ଯେଥାନେ ଏକ ଶ' ଭୋଲୋ
ଡିଗ୍ରିଗ୍ରେଡ୍ ଓଟେ ଏବଂ ସାରା ବହୁରେ ଯେ ଦେଶେ ମାତ୍ର କୁଡି ଇକ୍ଷି ବୃକ୍ଷି ହୟ, ସେ-ଦେଶେ ଘାସ ଜଞ୍ଜମେ ପ୍ରୟାସେର
ପ୍ରାୟକଳନ । ନୟାଦିଲୀର କନଟ ପ୍ରେସେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘାସ ହାତେ କଲେ ବୋଲା ଏବଂ ହାତେ ଧାରେ ଧୀତାନୋ ।
ତାର ଜନ୍ୟ ସରକାରୀ ହଟିକାଳଚାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ପରିମାଣ ଯତ୍ନ, ଜଳ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ୍ରମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟାପକନ ହାତେ ପାରେ ।

ফুল সম্পর্কে আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙালীরা যথেষ্ট সচেতন নই। ফুল এবং ঠাঁদের আলো একমাত্র কলেজ ম্যাগাজিনে কিশোর বয়স্কদের প্রথম পদ্য রচনা ছাড়া আর কোনো কাজে খাগ বলে তো জানা নেই। আঁটিস্টিক জাতি বলে বাঙালীর মনে যে আশ্চর্যভিমান আছে সে নিয়ে তর্ক চলে কিঞ্চ তথ্য মিলে না। সাধারণ স্বল্পবিষ্ট ইংরেজ পরিবারেও খাওয়ার টেবিলে বা বসার ঘরে সামান্য কিছু ফুলের সকান মিলে নিশ্চিত। অতি সচেল বাঙালীর গৃহে পুল্পগুজ্জের চিহ্ন দেখা যায় কদাচিত। অর্থের প্রশংসন নয়, কৃতির প্রশংস। বেণীর ভাগ বাঙালী পরিবারে ফুলের প্রয়োজন ১২। জীবনে মাত্র দুব্যাব, —ফুলশয়ার রাত্রিতে এবং শবাধার সম্ভায়।

পুরাকালে পরিবারে গৃহস্থেতার পূজার রীতি ছিল। সেজন্ত প্রয়োজন ছিল গৃহপুষ্পের। গাড়িতে থাকতো দু'-একটি ফুলের গাছ। আধুনিকতায় গৃহস্থেতার স্থান নেই। পূজা যদি করতেই হয়, তবে পাথরের ঠাকুর অপেক্ষা রক্তমাসের দেবতাদের তৃষ্ণ করাই বৃক্ষমানের কাজ। ফল মিলে হাতে হাতে। তাই এ-যুগে আমাদের ভজন-পূজন হয় আপিসের বড় সাহেব, জেলার মার্জিস্টেট এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের। আমাদের ঠাকুর ঘরের জ্যোগ্যা দখল করেছে ড্রাইং-ক্রম। কিন্তু কুবা, সোপানি ও নাগকেশ্বরের স্থান কার্নেশন, ডালিয়া বা ম্যাডিওলাস এসে পূর্ণ করেনি। মর্মাণপরিবৃত্তা আধুনিকি শক্তুন্ত্রাকে পৃষ্ঠাধীরিকায় তরু আলবালে জল সিঞ্চন্তত দখার সম্ভাব্যা-
মাত্র নেই। তার দশমাভিলাষে এ যুগের দুষ্প্রস্তুকে যেতে হবে লাইট স্ট্রাইন্স সিনেমায় নয় তো লেকে। কলকাতায় যে লোক ফল ঘরে রাখে সে নেছাটই ফুলবাস।

এ শহরে যুলের অভাব নেই। পথের দু'পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিহুত অবস্থা পুনঃসম্ভাসন পদ্ধতি। পথচারণে দলি মুক্ত হয়। বাজার চৌমাথাৰ বৃক্ষগুলি পার্কেজিতে আছে যুলো কেম্বেলী।

তাকছমের গায়ে, হাসপাতালের মাঠে, কুটি জাহাজ এবং মসজিদ কুল। কল্প গ্রেসে আহু' 'কানা' কুলের খাড়। শীতের লিঙে পুষ্পাভরণের অভজনা কল্পনা করা যায় শীতের ভগ্নাবস্থার সেই।

ন্যাদিলীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিয়ন্ত্রের হতাহাস, মাটিতে আছে উপরিমৌলির কাঠিন্য। কিন্তু তার পথপার্শ্বে স্যাত্তরোপিত তরঙ্গের পথচারীর জন্য প্রসারিত করেছে ছজছারা, তার শ্যামল তৃপ্তি পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে স্থৱীৎ অক্ষল, তার বহু বিচ্ছিন্ন কুসূমের দল রচন করেছে বর্ণাঞ্জ ইঞ্জাল। প্রণয়ীযুগলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেষ্টন আছে ন্যাদিলীতে। সজ্জার ঈয়ৎ অক্ষকারে তার জনবিলন, ধৰণিবিহৃত গুরু-আমোলিত পথে পাশাপাশি চলত গিয়ে সলাবিবাহিত তরণ-তরূপীর হৃদয় হয় উত্তেল, কঠ হয় ঝীল, চূপি চূপি বলতুত অভিলাষ হয় অত্যন্ত তৃচ্ছ কোনো কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সুভাব, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই তৎ সায়াহে একজনের বুমকা-গোলানো কলনের অত নিকটে তার একজনের মুখ আনন্দে গেলে তা' সু'-একবার লক্ষ্যচূর্চ হয়ে পড়াও একবারে বিচি নয়।

আঁট

সকালবেলা ঘূর্ম জাঁওলো একটি মেয়ের ঠেচামিতে। শুধু আজ নয়, প্রভাহই ভাণ্ডে। অবশ্য আমি বলি ঠেচানি। মেয়ের মা বলেন গান। মেয়েটি গান শিখছে।

পৃথিবীতে সঙ্গীত কে বখন সৃষ্টি করেছেন আলিনে। কিন্তু এতকাল এইটুকু বিশ্বাস হিল, যিনিই করুন, তার মধ্যে কেলো বিন্দুয় অভিভ্রান্ত হিল না। কিন্তু সে ধারণা বজায় রাখা ক্রমেই শুক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটির গলায় সুরের শেশ মাত্র মেই, অধিচ জোর আছে অসুরের। সেটা আরও সাংঘাতিক। ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা,—এই পাকা দু'টি ঘৰ্ষণ সে প্রভাব সঙ্গীতভ্যাস করে। সপ্ত সুরের সঙ্গে কৃত্তি করে বলেছেই ঠিক হয়। আশেপাশের প্রতিবেশীরা যে এখনও নন্দায়োলেন্ট আছে সেটা গাজীজির শিক্ষায় নয়, একান্ত বিক্ষিপ্ত হয়েই। সজ্জাতার অনেক দণ্ড আছে। তার মধ্যে এও একটা।

যুরোপ আমাদের অনেকগুলি মন্দ জিনিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কোনটা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাক্তারেরা বলেন সিফিলিস, গুরুজনেরা বলেন ফ্রি-শান্ত এবং গাজীজি বলেন কলকাতাখাল। আমার মনে হয় ডারতবর্ষে যুরোপের সবচেয়ে ক্ষতিকর আমদানি হ্যারমোনিয়ম। মানুষের স্বাস্থ্যত্বের ওপর নিদারণ অভ্যাচারের এমন বিতীয় যত্ন নেই। অশ্রু নয় যে, পশ্চিত অঙ্গহরুলাল বলেছেন, অনস্তায় অভিসন্দেশপত্র পাঠ করার আগে কেউ যখন হ্যারমোনিয়ম বাজিয়ে উজোধন সঙ্গীত শুরু করে তখনই তার অদ্যম অভিলাষ হয়, অনতার মাথাখানে খাপিয়ে পড়ে ঐ বাল্যজ্ঞাতকে পলায়ানের ধারা চূর্ণ বিচৰ্ণ করেন।

জড় পদার্থের একটা সুবিধা আছে। তার সহস্রালীভূত অপরিসীম। সে বিদ্রোহ করে না। দিনের পর দিন দু'ঘণ্টা বেসুরো চিকিৎসার সঙ্গে পালা দিয়ে আওয়াজ বের করা একমাত্র হ্যারমোনিয়মের পক্ষেই সত্ত্ব। গত দশকাব্দ ধরে সেই এক সুরে—'বৈধু তুম যে চলে গোলে, যিন্তে তো নাহি এসে'। ইধু লোকটা যে কে, ঠিক আলিনে। যেটু হোক, বেচারীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ ধাকলে হাতজোড় করে বলতেম,—বাহা, চলে যে গেছে, সে নেহাত আগের দায়েই গেছে। এবং তোমার এই গান না থামলে সে আর কিমছে না এও নিচয়। প্রেম যত গভীরই হোক আগের মায়া, অর্ধেৎ কানের মায়া চাইতে সে বড় নয়।

মেয়েটির অপরাধ নেই। তার মাকে দোষ দেওয়া বুধ। ভিন্ন জানেন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। পার্শ্বপক্ষ কলে দেখতে এলে গানের পরিচয় আছেই। সুজ্ঞাং তার জন্য মেয়েকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাই কিন্তু হয় হারমোনিয়ম, রাখতে হয় গানের মাস্টার, মেয়েকে প্রাপ্তির কসরৎ করতে হয় কঠভূমি।

এদেশে সর্বগুণান্বিতা হবার দাবী মেয়েদের উপরে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদ্যুতী, কলাবতী, সুন্ধীরা ও গৃহকর্মনিষ্পূণ। যে মেয়ে শিখিলে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি-পাশ করেছে তাকেও কার্পেটে ফুল তোলা শিখতে হয়, বড়ির ছোড়ন দিয়ে মোচার ঘট রাখতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বজ্জুলের সামনে কলে বাছনির সময় মহাঞ্চা গাঁকীর একটি অতি পরিচিত ফটোর ভর্তি মাদুরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতে হয়—'যে ছিল আমার স্বপ্নচারিণী তারে' ইত্যাদি।

বিবাহের দরবারে পুরুষের কাছে প্রত্যক্ষা সামান্য। ডাঙ্কার বরের মাসিক আয়ের খোজ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুশি থাকেন, তার ক্রীড়া-সঙ্গতা, অভিনয় পারদর্শিতা কিংবা বক্তৃতা শক্তি নিয়ে মাথা ধামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল, নয়তো ইনকেলোব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোনো একটা মাঝ কৃতিত্ব নয়, সব কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ রাপে, তারপর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যক্তিব্যালোকের পরিমাপে।

পুরুকালে রাজকন্যারা নিজেরা পতি নির্বাচন করতেন। পুরুষের হতো পরীক্ষা। বীর্যবস্তার পরীক্ষা। পুরুষকে তখন স্বয়ম্বর সভার নারীর বরমালোর যোগ্য হওয়ার সাধনা করতে হতো। একালে মেয়েরা সহজলভ্য। তাদের জন্য হৃৎধনু ভাঙতে হয় না, প্রতিবিস্ব দেখে মৎস্যচক্র বিক্ষ করতে হয় না। তাদের লাভ করতে বাঁধা মাইনের একটা চাকুরি হলেই যথেষ্ট। একালে রাজপুত্র, কোটালপুত্রদের কুঠবরণ কল্যার খোজে ঘৰ ছেড়ে বিদেশে বেরোতে হয় না। দুর্ঘাগরের জলের নীচে যে জপার কোটায় কালো ভোমরার মধ্যে আছে রাক্ষসের প্রাণ তার সঞ্চান করতে হয় না। সোনার কাঠি ঝুঁইয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘূম ভাঙতে হয় না। সরকারী দপ্তরখানার অফিসারের রকমা গ্রেটে তারা বীরদর্পণে প্রজাপতি খাযিকে দূরারে হাঁক দিয়ে বলেন—লে আও নিপুণিকা, চতুরিকা মালবিকার দল। তোমার রেংকু সেন, মাধুরী রায়, ডলি দস্ত বা অরুক্তী চ্যাটার্জীদের। একালের কেশবস্তী রাজকন্যারা নববই ভরি সোনা আৱ তিনপঞ্চ ফার্নিচারের খেয়া নৌকা চেপে আপনি এসে উষ্টীর্ণ হন বাসরঘরের ঘাটে। পথের টাকায় কারেশী নোটের মালা বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং যম।

আমার কর্ণপটহ-বিদীর্ঘকারণী সঙ্গীত-অভিলাখিলীকে ঢাঁকে দেখিনি। শুনেছি একেবারে রংপুরী নন। লেখাপড়াও ভালো ! তা' হোক। কিন্তু গান তাকে শিখতেই হবে। আমরা হতভাগ্য প্রতিবেশী,—আমাদের ললাটে দৃঃঘ আছে ; খণ্ডবে কে ?

দীর্ঘ নিশ্চাস ছেড়ে পাশ ফিরে আর একবার নিদ্রার উদ্যোগ করলেম। বৃথা। এবার গান নয়, কার্ড। দর্শনপ্রাপ্তী এক ভদ্রলোক ! কার্ডের উপরে ছাপা—পি. সি. সমান্দার, বি. এ., ডেপুটি একাসিস্ট্যাট কন্ট্রুলার। ভদ্রলোক আজ সকালে আসবেন কথা ছিল বটে। কিন্তু সকালে মানে যে পাড়ে ছাট তা ভাবতে পারিনি।

এই যে, নমস্কার ! ঘূমছিলেন না কি ? বড় অন্যায় হয়ে গেছে তা হলে। আমি ? আমি মশাই টিক পাটায় উঠে খানিকটা হেঁটে আসি। বারখাস্তা ধরে' ফিলোজ শা রোড, উইল্ডস প্রেস, পুরুষওয়ে হয়ে বাড়ি মালিল দুই হয়ে। আছি ভালো মশাই ! ডিসপেপ্সিয়াটা অনেকটা চাপা আছে। চা ? আজ্ঞা দিন এক কাপ, একবার অবশ্য হয়ে গেছে। অগ্নেয় বুঝি এখনও হয়নি। পাঠটাই আগে বিছানা ছাড়েন না ? খাসা আছেন মশাই ! মশটা-ছুটা আপিস করতে হয় না, কারো ঘোঘাকা নেই। হাই সার্কেলে মূড় করেন। হ্যা, ভালো কথা, জিজ্ঞাসা করেছিলেন নাকি নেহকুকে টি শিয়ালনেস এলাউন্সের কথাটা।

মেহফ মানে, বি. কে. নেহকু। ফিলাস ডিপার্টমেন্টের আভার সেক্রেটারী। পশ্চিত জহরলাল মেহফের সঙ্গে আঞ্চলিক আছে। ভদ্রলোক, নিজে আই. সি. এস. এবং স্ত্রী বিদেশিমী, কিন্তু ভারতবাসী প্রতি দৃঢ়নারাই সত্ত্বিকার টান আছে।

‘কৃতি বীকার করতে হলো’। স্মরণ ছিল না। কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছাড়বার পাত্র নন। বলচেম, আঝ একটু মনে রাখবেন। শুনেছি তো সাড়ে সতেরো পারসেন্ট করার কথা হয়েছে।

কিন্তু কত মাইনে অবধি এলাউলটা দেবে সেইটেই আসল কথা । পাঁচ শ' টাকার উপরে মাইনে হলে সেবে না বলে কেউ কেউ বলছে । দেখুন তো একবার অন্যায়টা । কেন, আমাদের অপরাধটা কী ? জিনিসপত্রের দাম তো আর শুধু পাঁচ শ'র নীচেওয়ালাদের জন্যে বাড়েনি । সুধের দাম টাকায় ছ' সেরের জ্যাগায় এক সের নিতে হচ্ছে তাকেও আমাকেও । বলুন সত্তা কি না ? তবে কেন ডিয়ারনেস এলাউলের বেলায় আমরা বাদ পড়ব ? এসব ইনজাস্টিসের জন্যই তো মশাই গবর্নমেন্টের কাজে ঘোষ ধরে যায় । গাজী মহারাজ কি আর অমনি শয়তানী গবর্নমেন্ট বলেন ?

গাজী ভক্তকে সবিনয়ে শ্রবণ করিয়ে দিতে হলো যে, গাজীজী পাঁচ শ' টাকার খেলী কারোর মাইনেই রাখতে রাজী নন ।

না, না, সেটা ঠিক নয় মশাই । তিনি মহায়া, তাঁর কথা আলাদা । অবিতৃল্য লোক । একটু ছাগলের দূধ পেলেই হলো । আর পাঁচজনের তো তা নয় । এই ধরন না আমারই কথা । আপনি তো ঘরের শোকের মতো, আপনাকে বলত আর কী ? আট শ' টাকা পাই । ইনকাম ট্যাক্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড কেটে নিয়ে হাতে আসে সাত শ' তরো টাকা পাঁচ আলা । ফি মাসেই শোবের দিকে টানাটানি হয় । কেনন্তা ন করলে হয় ? গাঢ়ি আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, জেলকে বিলেতে পাঠাতে হবে । পাঁচ শ' টাকার সীমা কিছু কাজের কথা নয় । স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং বাড়াতে হবে, তা না হলে ভারতবর্ষের উন্নতি নেই । দেখুন না বিলেতে, এমেরিকায় । হ্যা, সাহেবগুলিকে তাড়িয়ে দিন না । ওরা করে কী ? শুধু দন্তস্থত । যা কিছু তো আমরাই লিখে পড়ে দিই । কিন্তু পাঁচশ'র উপরে যদি মাইনে না থাকে, তবে চাপরাশীর মাইনে যে মাসে আট আনায় পাড়াবে ! পাড়াবে না ? বুঝ এখনকার চাইতে আরও বাড়বে ? অবাক করলেন মশাই ? কি জানি ; আপনাদের কংগ্রেসীদের কী বিচার-বৃক্ষি আপনারাই জানেন ।

কংগ্রেসীদের বিচার-বৃক্ষি ব্যাখ্যা করার মতো ধৈর্য বা সময় কোনোটাই ছিল না । প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ক্রীপস্ আলোচনার কথা তুললেম । দেখা গেল তাতেও আগ্রহের একেবারে অভাব নেই । জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হবে মনে হচ্ছে কি ? হলে বাচা যায় মশাই । ইংরেজ ব্যাটারদের আচ্ছ শিক্ষা হয় । ছিল বটে আগের দিনে সব দিলদরিয়া সাহেব । যথার্থ মা-বাপের মতো । আমি তখন সবে সেক্রেটারিয়েটে চুক্তেছি । আমাদের সুপারিস্টেডেন্ট ছিলেন মহাত্ম বাবু । মহাত্ম ঘোষ, খড়োয়া বাড়ি । বুড়ো হয়েছেন, বয়স সন্তরের কাছাকাছি । সার্ভিস বুকে লেখা আটচিলিশ : পেশনের আরও সাত বছর বাকী । চোখে একেবারেই দেখতে পান না, লিখতে হাত কাপে । একদিন ফাইলে টাইপকরা লেখার উপরেই দন্তস্থত করে বসে আছেন । আমরা তয়ে সারা । আজ আর রক্ষে নেই । মারে,—সার অ্যালেকজান্ডার মারে—সাহেব ছিলেন আমাদের সেক্রেটারী । ডেকে নিয়ে বললেন, মহাটপ, ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে ? না করে থাকে তো ক্ষতি নেই । কাল নিয়ে এসো ভর্তি করে দেবো । তুমি এবার রিটায়ার কর । অনেক খেটেছ এখন ডিসার্ভ ওয়েলআর্ন্ড রেস্ট । আর এখন মশাই আমার মেজ শ্যালক কলকাতা যুনিভাসিটির পাশুয়েট । দু'বছরের চেষ্টায় ঢোকাতে পারছি নে ।

শুধু মেজ শ্যালকের চাকরি প্রাপ্তিতে ব্যর্থ নয় । নিজের প্রমোশন সম্পর্কেও অভিযোগ ছিল ।

স্বারাজ না হলে আর চাকরি করে সুখ নেই মশাই । ইংরেজ ব্যাটারদের কাছে এখন মুসলমানেরা হচ্ছে বড় পিয়ারের । তাদেরই পোয়া বারো । কাজ জানুক আর নাই জানুক, মাথায় ফেজ থাকলেই হলো । পেটে বোমা মারলে এক কথা শুন্দি ইংরেজী বেরোয় না এমন সব লোক অফিসার হয়ে এসে বসেছে । খান-খলে 'আমাদের এক নতুন কঞ্চোলার এসেছে । আকাট মূর্খ । সেদিন এক ফাইলে রেফারেল লিখতে দুটা । দিয়ে বসে আছে । গত মাসে দু'বছরের জুনিয়র একজন মুসলমান আমাদের চার জনকে ডিঙিয়ে ডেপুটি চীফ হয়ে গেল । এসব অবিচার বি আর চিরকাল সইবে ? ইংরেজদের দিন থিয়ে এসেছে । তবে হ্যা, এও বলি, হবে নাই বা কেন ? মুসলমানদের ফেলো-ফিলিৎ আছে । চাকরি নিয়ে, প্রমোশন নিয়ে তাদের শীঊরেরা সব সময় লড়ছে । পান থেকে চুন থসেছে কি, অমনি এসেছলীতে পাঁচজন মুসলমান মেষার পাঁচটা প্রশ্ন করবে, উইল দি অনারেবেল মেষার বি প্রিজড টু স্টেট । একটা মুসলমান চাপরাশীকে কিছু বলেছেন তো

মিনিষ্টারেরা কৈফিয়ত তলব করবে। আর আমাদের হিস্বুরা ? সব কংগ্রেসী। তারা কেবল উচ্চাজ্ঞের কথা বলে থাকেই গেলেন। স্বরাজ, শার্ষীনতা ; কমপিট ইভিপেটেল। আরে চাকরি-ব্যাকরিঙ্গলি সবই যদি অনেকের হাতে গেল তবে স্বরাজ নিয়ে কি ধূয়ে খাবো ? আমি পঁচ কথা বলবো মশাই, আমাদের কংগ্রেসের কর্তৃতা প্রাকটিক্যাল পলিটিক্স একেবারেই বোধেন না তাই জীবন কাটাচ্ছেন শুধু জেলখানায়।

ভৱস্তুকে বাধা দিয়ে লাভ নেই, তর্ক করা নির্বর্থক। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অতি পরিচিত আবহাওয়ায় মানুষ। চাকরিকে জানেন জীবনের অনিবার্য অবলম্বন, গবর্নমেন্ট পোস্টকে আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য। তার ধ্যান, ধৰণা, চিন্তা ও স্বপ্ন সমস্তই এই চাকরিকে কেন্দ্র করে। ক্যারেক্টার গোল নিয়ে তার আরোপ, পেশন নিয়ে তার শেষ ! এবং এই আদি অঙ্গের মাঝখানে প্রমোশন দিয়ে তার বিস্তার।

আপিসের বেলা হচ্ছে। সমাদুরবাবু গাত্রোখান করলেন। আজ্ঞা এখন তাহলে উঠি। আপিস আছে। আজ আবার এ মাসের এরিয়ার স্টেটমেন্ট পাঠাতে হবে। বিবেকের দিকে আর একদিন আসব। বিকেলে বাড়ি থাকেন না ? তাহলে সকালেই আসব। আজ্ঞা, চলি এখন। ঐ ডিয়ারমেস এলাউয়েসের কথাটা কিন্তু আজ একবার কাইঙ্গলি—।

বিকালের দিকে চায়ের নিমজ্জন ছিল। নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাব টি পার্টি দিচ্ছেন সার স্ট্যাফের্ড ক্রীপসকে। ক্রীপস চা, লাঙ্গ ও ডিনারের বহু নিমজ্জন পেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রেস ক্লাব ছাড়া আর কোনো আমজ্ঞাই তিনি গ্রহণ করেননি। বললেন, তার প্রতি ভারতীয় সাংবাদিকদের সহ্য ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই চা চক্রে তিনি যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্রাকের প্রাঙ্গণে চা পার্টির আয়োজন। স্বদেশী ও বিদেশীয় সাংবাদিকদের নিয়ে নিমজ্জিত প্রায় শ'দেড়েক। কয়েকজন মহিলাও আছেন, অবশ্য। তারা সবাই বিদেশীনি।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাঙালী। উধানাথ সেন। ভারতে সাংবাদিকদের গুরুত্বন্যীয় ও এসেসিমেটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ষ্ট্রীয় কে. সি. রায়ের সহকর্মী ছিলেন। বর্তমানে এসেসিমেটেড প্রেসের অন্যতম কর্ণধার, দিল্লী আপিসের কর্ম-সচিব। রয়স ষাটের উপরে, শ্রীর সুগঠিত। বিরলকেশ তীক্ষ্ণনামা, উচ্চল দৃষ্টি। কথাবার্তা, চালচলন ও বেশভূষায় প্রথর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন আছে। ভৱস্তুক অবিবাহিত। নয়াদিল্লীতে কোনো দিন চিরকুমার সভা বসলে তিনিই হবেন সর্বজনসম্মত পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট।

টি-পার্টির পরে সাংবাদিক সম্মেলন। নয়াদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী ইতিহাসে এইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রেস কনফারেন্স। সাউথ ব্রাকের কমিটি ক্রমে তিল ধাগণের হান ছিল না। এই কনফারেন্সে ক্রীপস তার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন সাংবাদিকের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন। তার বাচনভঙ্গী, তার ক্ষিপ্ততা, তার অঙ্গুষ্ঠ উদ্যম উপস্থিত সমুদয় সাংবাদিকদের প্রশংসন অর্জন করল। তার রসবোধও আছে। মাঝখানে একবার হঠাতে বললেন, সবুর। তারপর গায়ের কোটটা খুলে রেখে আস্তিন গঠিয়ে বললেন, এবার আসুন ! বিপুল হাস্যরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠল কনফারেন্স।

সার স্ট্যাফের্ড বিলাতের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীদের অন্যতম। আইনব্যবসায়ী মহলে তার শার্ষীক উপর্যুক্তের পরিমাণ বহু লোকেরই ঈর্ষাঙ্গড়িত বিশ্বের উন্নেব করেছে। এই সাংবাদিক শেষকে যুক্তিতেক্ষে ব্যারিস্টার ক্রীপসের অসামান্য দক্ষতা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু মানুষ মাত্রেই ধৈর্যের সীমা আছে। সে-কথাটা অত্যন্ত অপরিহ্যন্যভাবেই ক্রীপসও সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধা হলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক অভদ্র প্রশ্নে অবশ্যে কঠিন ঘরে বললেন,—ডম্হমহোদয়গণ, আমার ধৈর্য অসাধারণ, কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রিটিশ পর্সনের সম্পর্কে কোন অভদ্র ইঙ্গিত আমি বরদাস্ত করতে জাজী নই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোর্টারদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কৃতিত্বও কম

ক্ষয়। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রবোধ নেই। তারা যে রাজনৈতিক নন একথাটা তারা কুমাটিৎ শরণে সংখেন। প্রেস না হলে পলিটির চলে না, কিন্তু পলিটির না হলেও প্রেস চলে। যথা—হারিজন। এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টার হয়েই খুলি থাকতে চান না, প্রথম শ্রেণীর পলিটিসিয়ানও হতে চান। তাই অনেক সময়েই অগ্রীতিকর পরিস্থিতির উভ্বে ঘটে। তাদের অপরাধ নেই। স্পেশিয়েলাইজেশনে এদেশে বিশ্বাস নেই। এখানে যে ডাক্তার ক্লারের চিকিৎসা করেন, তিনি গোড়াও কাটেন এবং দরকার হলে দীক্ষণ তোলেন।

ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে মতভৈরূপ দেখা গেল। প্রস্তাবটিপৰ সমষ্ট গুরুত্বই ভবিষ্যতে। জনজ্ঞতি এই যে, গাজীজি ক্রীপসের সঙ্গে প্রথম সাংক্ষেতের দিন এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন a post-dated cheque অতি উৎসাহী কোনো কোনো সাংবাদিক তার সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য যোগ করলেন, on a crashing bank। মুখে মুখে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিও গাজীজির মূল উক্তি বলেই চলতে লাগল। ইচ্ছাকৃত কিংবা অনবধানভায় সত্যবিকৃতির এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

সেদিন সজ্জায় দুই বছু নিয়ে গোলেন এক ক্লাবে।

নয়াদিলীর সবচেয়ে নামকরা ক্লাব আই. ডি. জি। ইলিপরিয়েল দিলী জিমখানা। ক্লাব বর্ণালৈ বিজোৱাম। প্রবেশাধিকার অভাস সীমাবদ্ধ। শুধু ব্যবাহাল্যের দ্বারা নয়, লিহিত অনুশাসনের দ্বারা। এ্যাডমিশন ফি ও মাসিক টাঙ্কা দুই-ই গুরুভার। তাছাড়া আই. সি. এস., আই. পি., অডিট একাউন্টস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর চাকরে ছাড়া সরকারী লোক আর কারণও পক্ষেই আই. ডি. জি-র সদস্য হওয়ার উপায় নেই। বে-সরকারী ডাক্তার, জানেলিস্ট, ব্যারিস্টদের পক্ষে ঠিক এরকম বাধা না থাকলেও নতুন সদস্য গ্রহণের সময় ক্লাব কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন যাতে একমাত্র তারাই মেষ্টার হন আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্যাদা ধাঁচের শীর্ষস্থানীয়, ইংরেজীতে যাকে বলে এ-ওয়ান। ক্লাবের কোলিন্য যাতে কল্পুষিত না হয় সেজন্য সজ্জাগ দৃষ্টি আছে কর্তৃপক্ষের।

ক্লাবের টেনিস জন আছে, সুইমিং পুল আছে, ব্যান্ড আছে। যায় নিজস্ব থোবা পর্যট্ট। নয়াদিলীতে এইটি একমাত্র ক্লাব যেখানে শুধু পান, ভোজন ও অবসর বিনোদনের নয়, স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থাও আছে। আই. ডি. জি. কেবলমাত্র খেলা বা আজ্ঞা দেওয়ার জায়গা নয়, পুরোপুরি ক্লাবই বটে।

দু' নংস্বর ক্লাব,—চেমসফোর্ড। সেক্রেটারিয়েটের কাছাকাছি রাইসিনা ও কুইন ডিক্ষোরিয়া গ্রোডের সঙ্গমস্থলে এই ক্লাবটি সব চেয়ে সরগরম। প্রথমতঃ এর দক্ষিণ তেহন সাংগ্রাহিক নয়, দ্বিতীয়তঃ এর অবস্থিতি অনেকটা সুবিধাজনক এবং তৃতীয়তঃ এখানে অভাবর্তীয় অল্প। সদস্য গ্রহণেও অতুল কড়াকড়ি নেই। চেমসফোর্ডের সুইমিং পুলে ফি বছর এখনকার সন্তুরণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি মঙ্গলবার মাত্রিতে হয় নাচ। শীতের দিনে ঘরের ভিতরে, গ্রীষ্মকালে বাইরে। বাইরে অবশ্য কাঠের ক্লোর নয়, শান ধাঁধানো। বাগবাজারের রসগোল্লার মতো চেমসফোর্ড ক্লাবের পক্ষেড়া—অর্থাৎ ফুলুরিয়ও নাম আছে।

মহিলাদের এখানে পৃথক টাঙ্কা দিতে হয় না। স্থায়ীর গরবে গরবিনীরা স্বজ্ঞস্বে এসে বসেন পুরুষ বংশুদের তাসের টেবিলে। সুদক্ষ পাটনার পেলে কেবলই তামি হন। না পেলে তিনি রঙের তিনখানা অনার্স কার্ড সহজ করে মিহি সুরে তাকেন,—চু নো-ট্রাম্পস্। দেনার সুদের মতো হারের হার বাড়ে হ হ করে। খেলার শেষে খাতায় সই করে আসেন নিঃশব্দে। মাসের শেষে স্থায়ী বেচারা কল্পিত হস্তয়ে মুখ বুজে চেক লিখে দেন আর বোধ করি মনে মনে জগবানকে শ্বাশ করেন।

আতিথমনিবিশেষে বেশীর ভাগ ভারতীয় অফিসারই চেমসফোর্ডের সদস্য। পাঞ্চাব, সিঙ্গুর, গুজরাট, মারাঠা, দ্বাৰিড়, উৎকল, বঙ—কোনো মেল্লীয়াই বাদ নেই। কিন্তু উপস্থিতির দিক্ক দিয়ে পাঞ্চাবীয়াই প্রধান। বিশেষ করে শিখ। তারা বিকালে এসে তিনি সেট টেনিস খেলেন, সজ্জ্যায় ধাঁচ

କାହାର ହିତ । ତିମ ଲେଖ କାହାଟି ଓ ତାର କୋର୍ସେର ଡିଲାର ଥେଯେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଵଗ୍ରହେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅର ଅଟେଇ ଇଂଲେଞ୍ଜ କାଲେଭାରେ ତାମିଦ୍ରେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି । ତାମେର ଗୁହିରୀଓ ପିଛନେ ପଡ଼େ ଥାବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ । କୁଣ୍ଡର ପାଞ୍ଚବି ଦିନ୍ପାତିଲେର ଦେଖିଲେ ସଂଖ୍ୟାମିଳି କଥାଟାର ମାନେ ବୁଝାତେ କଟ ହୁଏ ।

କୁଣ୍ଡର କୁଣ୍ଡର ଶହରେ ଅପର ପ୍ରାତେ । ଏଇ ଚାଦା ସାମାନ୍ୟ, ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବୈଶୀ ନମ୍ବର । ବାଢାଳୀ ଆହେ, ମାଝାରୀ ଆହେ, ଆମାଦୀ ଆହେ ଏବଂ ଆହେ ଆରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶେର ଲୋକ । ଏଠିଓ ଛେଲେ ଏବଂ ମେଜଦେର ସମ୍ପିଳିତ କ୍ରାବ । ଯେଯେଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେ କ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜେର ।

କ୍ରାବରେ କ୍ରେଜିଟ୍‌ଟାରେ ଯାଇ ଥାକ, ଦରେ ଯେଯେଦେର ସଂଖ୍ୟାଇ ଯେନ ବୈଶୀ । ପ୍ରାୟ ପନେରୋ ଆନାଇ କୁଣ୍ଡରୀ । ଗାରେର ରଂ କାଳେ, ନଥେର ରଂ ଲାଲ ଏବଂ ଗାଲେର ରଂ ଛାଇ-ଛାଇ । ବଲା ବାହଲ୍ୟ ଶେଷେର ଦୂଟୋ ତପକଳା ଖେଳ ମୟ । ତାର ପ୍ରଛେନେ କିମ୍ବାରୀ ପ୍ରାସାଦନ କୋମ୍ପାନୀର ଅନେକବ୍ୟାନି ହାତ ଆହେ । ବିଚିତ୍ର ବସନ୍ତ, ବିଚିତ୍ରତା ଭୂଷଣ । ଏକଟି ମହିଳା ପରମହେନ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗେର ଏକଟି ସାଯାର ଉପରେ ଏକଥାନା ମଧ୍ୟାମୀର ସେଟ, ତାତେ ସାଟିନେର ପାଡ଼ ବସାନେ । ଆର ଏକଜନେର ଲେସ-ବସାନେ ବ୍ରାଉଜେ ସୃତାର ବ୍ୟବହାରେ ଏତ କଠୋର ମିତବ୍ୟାଯିତା ଯେ, ତାର ଦିକେ ଚୋଖ ତୁଲେ ତାକାଳେ କାନ ଆପନିଇ ଲାଲ ହୁଯେ ଥାଏ ।

ଯୁଗ ବୈଶୀର ଭାଗଇ ତ୍ରିଶେର ଉର୍ଧ୍ବେ । ଦେହେ କାରୋ ବା ଇଉକ୍ରିଡେର ସରଳ ରେଖା, କେଉ ବା ଅନ୍ତ ଶାତ୍ରେର ଇଲିପ୍ସ । ଆମାଦେର ଯେଯେଦେର ଭୁଗୋଳେ ନାତିଶୀଳୋକ୍ତେର ଥାନ ନେଇ,—ହୁ ଉତ୍ସର ମେର, ମରାତୋ ଦକ୍ଷିଣ । କେଉ କରେନ ମାଟ୍ଟାରୀ, କେଉ ନାର୍ସ, କେଉ ବା ଟେନୋଆଫାର ।

କ୍ରାବେ ବ୍ୟାଡମିଟ୍‌ଟ ଆହେ, କ୍ୟାରମ ଆହେ, ପିଂ ପଂ ଆହେ । କିନ୍ତୁ ଖେଲାର ଚାଇତେ ତଂ ଏବଂ କଥାର ଚାଇତେ ନ୍ୟାକାମିର ପରିମାଣ ବୈଶୀ । ଏକଟି ପ୍ରୟାତ୍ରିଶ ବଜରେର ବିପୁଳା ମହିଳା କୋମୋ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ଅଭିନ୍ୟାର ଟିକିଟ ପିକ୍ରେର ଚେଟା କରିଛିଲେ । ତାର କଥା ବଲାର ଭାଙ୍ଗି ଓ ଆଚରଣ ମେଥେ ବାରବାର ଇଚ୍ଛା ହାଚିଲୁ, ଆଲାପ କରେ ବଳ, ଭତ୍ରେ ଆପନାର ନିଶ୍ଚାଇ ଧାରଣ ଯେ, ଆପନାର ବୋଲେ ବଜର ଏଥନ୍ତି ପାର ହୁଣି । କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେ କୁଡି ବଜର ଆଗେଇ କେଟେ ଗେହେ ମେ କଥା ଆପନାକେ ମ୍ରଗଣ କରିଯେ ଦେଓୟା ଦରକାର ।

ଜାନି, ଏଦେର ଉପରେ ରାଗ କରେ ଲାଭ ନେଇ । ଡଗବାନ ଏଦେର ରାଗ ଦେନନି, ଭାଗ୍ୟ ଦେଯନି ବିଷ । ଏଦେର ପିତୃକୁଳ ଆଭିଜାତୋର ଖ୍ୟାତିତେ ଗୌରବାର୍ଥିତ ନଥ । ଯୁଗ ଉର୍ଧ୍ବଗାମୀ, ଯୌବନ ଅପଗତପ୍ରାୟ । ଏଦିକେ ଠିକୁଜି ମିଲିଯେ ଅଭିଭାବକଦେର ପାତ୍ର ହୁଇ କରାର ଦିନ ପ୍ରାୟ କେଟେ ଗେହେ । ବୁଲେ ଛାତ୍ରିକେ ଜିବାନ୍ତିଲେ ଇନ୍ଫିନିଟିଭ ମୁହଁତ କରିଯେ ଦେହେ ଓ ମନେ ନେମେହେ ଝାପ୍ତି, ରାତ ଜେଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରିଚିତ ଝୋଗୀକେ ଥାର୍ମୋମିଟାର ଆର ଆଇସମ୍ବାଗ ଦେଓୟାର କାହିଁ ଧରେଇ ବିରାତି, ଆପିମେ “ଉଇଥ ରେଫାରେସ ଟୁ ଇଶ୍ଵର ଲେଟାର ନସ୍ବର” ଟାଇପ କରେ କରେ ଜୀବନେ ଏସେହେ ବିତ୍ତକା ।

ପ୍ରିୟ ଓ ପରିଜନ ନିଯେ ନୀଡ ରଚନାର ଚିରାଳନ ମୋହ ଆହେ ନାରୀର ରକ୍ତେ । ଏକଥାନୀ ଛୋଟ ଗୁହ ଏକଜନ ପ୍ରେମାସଂଗ ଶାରୀ ଓ ଏକଟି ଦୂଟ ସୁତ୍ର ସବଲ ଶିତ—ଏହି କରନା ମେ ଯୁଗ୍ୟଗ୍ୟ ଧରେ ପେଯେ ଆସିଥେ ମାଯେର କାହ ଥେକେ, ମାତାମହୀର କାହ ଥେକେ, ଜୁଗତେର ଆଦି ମାନବୀ ଆଦମପତ୍ନୀ ଇହେର କାହ ଥେକେ । ମେ କରନା ସଭ୍ୟ ହେତେ ପାରଲ ନା, ମେ କାମନା ସାର୍ବଧର ହୁଲୋ ନା । ଅତୁମ୍ଭ ବାସନାର ସହତ୍ର ନାଗିନୀ ଜାଗାଯେ ଜର୍ଜର ବକ୍ଷେ ମେ ବ୍ୟାହି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷା କରାରେ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳ । ତାର ଦେହେ ଏକଦିନ ରାପ ନା ଥାକଲେବେ ଶାନ୍ତ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଆଜ ତାର ଶ୍ରୀ ଗିଯେହେ ଦୁଚେ, ବ୍ୟାବିକ କମଲୀଯତା ହେଯେ ଦୂର ଏବଂ ନାରୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ ଯେ ଲଜ୍ଜା ତା ହେଯେ ଲୁଣ୍ଠ । ଅବଶ୍ୟେ ସବ୍ରିଦ୍ଧି ହୁଅଯେଇ ଅପରିସୀମ ବେଳନାକେ ତାକଣେ ମେ ପ୍ରାଣପଦେ ପ୍ରୟାମ କରାରେ ନାନାଭାବେ । କେଉ କରାରେ ମହିଳା ସମିତି, କେଉ କରାରେ ଝୋଡ଼ିଓତେ ବ୍ୟକ୍ତତା, ଆର କେଉ ବା କର୍ଜ, ପାଉଡ଼ାର ଓ ଲିପିସ୍ଟିକ ମେଥେ ପୁରୁଷେର ସଙ୍ଗେ କରାରେ ନିର୍ଜଳା ଝୋଟ ।

କ୍ରାବେର ପୁରୁଷ ସମସ୍ୟାଦେର ମଧ୍ୟେ କଲେଜେର ହାତ ଆହେ, ସେକ୍ରେଟାରିଯେଟେର କର୍ମଚାରୀ ଆହେ, ବୀମା ଦାଳାଳ ଆହେ, ଡାକ୍ତର ଆହେ । ପ୍ରାୟ ସବାଇ ତରୁଣ । ବିବାହିତ ସମସ୍ୟେର ବେଳନାକେ ବୈଶୀର ଭାଗ ହିନ୍ଦୁ । କାରଣ ସୁନ୍ଦର ।

ପର୍ମତମେ ଶିକ୍ଷା, ସଭାତା ଓ ଭାବଧାରା ଆମାଦେର ଦେଶେ ଏନେହେ ନୃତ୍ୟ ଆବେଦନ । ତାର କଲେ ଅଭିଯାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ଆମାଦେର କର୍ମେ ଏବଂ ଚିତ୍ତାୟ । ଆମାଦେର ଆହାର, ବିହାର, ବସନ୍ତ, ଭୂଷଣ

বদল হয়েছে। বদল হয়েছে স্থিতি, নীতি ও ধূম-ধারণা। এতকাল মাঝীকে আমরা শুধু মাত্র পুরুষের আর্দ্ধায় সাপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুরা, মিসিমা, মাসি, পিসি, মিসি, হোসি-কিছি শ্যালিকা। কিন্তু জননী, জায়া এবং অনুজ্ঞা ছাড়াও নারীর যে-আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সর্বী।

প্রাণী জগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্ত, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনেভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূলোরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটে।

একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিল সবপ্রধান। সেদিন পরিবারের পরিচালনা থেকে বশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার শীর্ষীত হতো মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কল মেম্ফিলি বিচ্ছুণ্ড হলো। রাজমাতার চাইতে রাজবারীর মর্মণ হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারে কর্তৃ হলেন জননী নয় গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল হেড়ে বড়-এর আঁচলে আস্থাসমর্পণ করল।

বলা বাহ্যিক, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশি হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রঞ্চার অন্য যুক্ত যোগণ করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই। শুধু উকাঁকাঁকী শান্তিতে আখ্যা পেয়ে নাটক, নড়েলে তাঁরা নিষিদ্ধ হলেন। যাঁরা বৃক্ষিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছদ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত বিচ্ছুণ্ড মাতৃকলের অনুস্ত অভিযোগ আজও জেগে আছে বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। যুরোপ ও এমেরিকার সমাজে পল্লীকৃত পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পর ছেলের সংসারে তাঁর মায়ের স্থান নেই, কিংবা থাকলেও সে স্থান উত্তেখযোগ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকার ঠিক্কের মতো তাঁর অস্তিত্ব আছে, শুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যেদিন ভাবী সঙ্গানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্তা মাত্র বুবাতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিব সবৈমিথ প্রিয় শিশা ললিতে কলাবিধী। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাহোই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এ যুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক শোভী। সে দশটা পাঁচটায় আপিসে যায়, কারখানায় থাটে, শোয়ার মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস কিংবা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যিকতা নেই। আগে সক্রীয় ধর্মাচারণ করতে হতো। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পার্বণে প্রয়োজন ছিল ভার্যার। কিন্তু ধর্ম এখন শুধু ইলেক্ট্রনে ভোটসংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এ-যুগে সহধর্মীর চাইতে সহকর্মীকে নিয়ে বেশী দোষাল লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তাঁর খাওয়ার জন্ম আছে রেস্টোর্যাঁ, শোয়ার জন্য হোটেল, রোগে পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও নার্স। সঙ্গান সন্তানিদের লালমপালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিল, বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেন্স হোমের উচ্চ হয়ে তারও সমাধি হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সংস্কৃতি হয়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশীটা বাজৰী। সে কর্তৃও নয়, ধার্তীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের নায়া ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিল ভরণ, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এ-যুগের স্ত্রীরা একাঙ্গভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়। দরকার হলো তাঁরা আপিসে থেকে টাকা আনতে পারে।

তাই স্বামীর শুরুত্ব এখন প্রধানতঃ কর্তৃরাপে নয়, বক্তৃরাপে।

ভারতবর্ষেও এই নব ভাবধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। ঢেউ এসে লেগেছে তাঁর সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবারের ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আর্দ্ধায় পরিজনের সুবৰ্জ সংজ্ঞণ হচ্ছে। প্রায় সভ্যতার ভিত্তি বিধুত্ব, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগর-নগরীর বিস্তৃতি ঘটে। শীঘ্ৰে ধীরে। তাঁর সঙ্গে নৃতন সভ্যতা, নৃতন দৃষ্টিদৰ্শী, নৃতন জীবন-ধর্মের উত্তুব অপরিহার্য।

এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভূত হয়েছে সর্বী; নারীর জীবনে সর্বী। সেটা ভালো কি মন তা নিয়ে তর্ক করতে পারো, মনু পন্নশের উত্তুব করে মাসিক পত্রে প্রবক্ষ লিখতে পারবে। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

শ্বেষিতাতে জীবনে সখাসৌধীর যে উপলক্ষ্মি, তার আয়োজননীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজকর্তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু পতিকে পরম শুরু এবং পাণ্ডীকে সেবিকা বালিয়ে দাম্পত্যে তারা সরীরের অবকাশ রাখতে পারেননি। ট্রাঙ্কফারড এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বৈমি এবং শ্বেষীর পক্ষে দেবরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সমীরে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জন্ম নেই।

সীতার সাধী ছিলেন লক্ষণ, তার অপর আর কোনো বক্ষুর প্রয়োজন ছিল না। বুংড়ে হলেও অধি বাল্মীকি সে-কথা জানতেন। পাঞ্চালীর পাঁচ পাঁচটা শ্বেষী ধাকতেও একটি দেবরের অভাব হোচেনি। তাই দেবব্যাসকে আনতে হলো,—শ্বেষী। তিনি শ্রোপণীর সখা,—সংকটে শরণ, সম্পদে শ্বেষীয়।

এযুগে জীবনযাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধা। যে লোক 'দুশ' টাকা পায় তার পক্ষে বউ কাছে রাখাই কঠিন, বৈমি দূরে থাক। মেয়েরা ও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হলে বরাই ভুট্টে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা খেয়ে মন দিয়ে মেনেছেন যে, বেশী আশা করে ফল নেই। একটি নির্ভরযোগ্য সহস্য বক্ষু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকস্থা বৃক্ষ দিয়ে বুঝেছেন যে, অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই ওধু একটি বাস্তবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাস্থীয় শ্বেষিতাতে বক্ষুরের পথ উশুক্ত নয়। সাধারণ মুসলিমান পরিবারেও নয়। সেখানে বাস্তবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথমে যে অনাস্থীয় নারীর সারিধা ঘটে, তিনি নিজের শ্বেষী। তাই ক্রাবে পার্টিতে বিলাতকরেত ও বড় চাকুরেদের ড্রাইক্রমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, আর কাউকে বলে বীগাবুটি কাউকে বা শুধু পদবীর আগে 'মিস' বা 'মিসেস' জুড়ে দিয়ে সংৰোধন করে—মিস শুণ, মিস আয়োজার বা মিসেস সোনেরা জাহীর।

নয়

তি঱িশে মার্চ সঞ্জ্যায় ফিরোজশাহ-কোট্টায় মুনগাইট-পিক্নিকের যিনি আয়োজন করেছিলেন, আইডিয়াল হোস্টেস বলে নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে তার প্রসিদ্ধি আছে। মহিলা সুন্দরী, পরিহাসপূর্ণ এবং প্রিয়ভাষিণী। বক্ষুসমাগমে আনন্দ লাভ ও আনন্দ দান করার দুর্বল ক্ষমতা আছে তার।

ফিরোজশাহ-কোট্টা দিল্লীর পঞ্চম নগরীর ধ্বন্সাবশেষ। তারতের শেষ হিন্দু সন্তান পৃষ্ঠারাজের সময়ে দিল্লী নগরী ছিল বর্তমান কৃতৃপক্ষের নিকটে মেঝেলীতে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ কিছু কাল পূর্বে এই রাজধানীর নগর প্রাচীর মৃত্যুকাগার থেকে আংশিক উদ্ধার করেছেন। জনপ্রবাদ এই যে, নিজ প্রিয়তমা কল্যান যমুনা দর্শনাভিলাপ পূর্ণার্থে পৃথিবীজ তৈরী করেছিলেন কৃতৃপক্ষ মিনার। প্রতাই অপরাহ্ন মেলায় প্রাথমিক সমাপনাতে রাজবন্দিনী আয়োহণ করতেন তার শীর্ষে, অবলোকন করতেন দূরবর্তী যমুনাৰ জলধারা। কিন্তু ঐতিহ্যসিদ্ধে এ কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাদের অভিষ্ঠত, পাঠান সংজ্ঞাট কৃতৃপুর্দিন আইবেক নির্মাণ শুরু এবং আলাকামাস শেষ করেন জগতের সর্বোচ্চ বিজয়বৃত্ত এই মিনার।

বিজীয় দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠাতা করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী। তার রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মুরশদ দস্যুস্ত ভাস্তুরভূত আকৃত্যে করল, হস্ত্যা ও সুর্চলেন দাঙ্গা বাছ নগরবন্দীর বিধ্বন্ত করে উপলক্ষ্মি হলো দিল্লীতে। দিল্লীর সমস্ত সুর্চলে তাদের প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। সংগীট পশ্চাদপসরণ করলেন কৃতৃপক্ষ। মুদ্রলের দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে আমীর ও মুসলিমদের ধনরাজ সুল্টান করল এবং সাধারণ কৃষকদের শস্যক্ষেত্র বিধ্বন্ত করল। অবশেষে দিল্লীর অসহায়ীয় শ্বেষীর প্রথমতায় ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে দস্যুস্তের পুনরাক্রম প্রতিরোধের জন্যে নির্মাণ করলেন সুমৃদ্ধ প্রাচীরবেষ্টিত নব নগরী, নাম দিলেন সিরি। এই নগরীতে সুলতান নির্মাণ করেছিলেন নিজের জন্য এক মহার্ঘ প্রাসাদ, তার ক্ষেত্র মৎখা ছিল এক সহস্র। আজ সে প্রাসাদের চিহ্ন মাত্র নেই।

আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন অসমসাহস্রিক শ্বেতা। রাজ্য-জ্যোতির সেৱা হিল তার গতে। তিনি রাজ্যপুত্রদের পরাভিত করে চিতোর অধিকার করেছিলেন। দাক্ষিণ্যতে অর্থম মুক্তিয অধিকারণও প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। সেই বিজয় পৌরবক্তৃ চিরস্মরণীয় করতে সির্পিং শুরু করলেন তিটীয় কৃতৃব। প্রথম কৃতৃবের পাশেই। প্রথম কৃতৃবের চাইতে এর আকার হবে ছিতগ,—এই অভিজ্ঞান ছিল সুলতানের মনে। কিন্তু আরুক কাজ শেষ করার মতে আয়ুর মিমান্দ ছিল না তার। অর্ধসমাপ্ত এই নব পরিবর্কিত কৃতৃবের চিহ্ন আজও দর্শকজনের কোতুল উৎসৈক করে। বর্তমান সিরিয় আরাক আছে শুধু প্রচুরতাপ্রিকের গবেষণায় এবং কিংবুটা বিরাট নগর প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক। রাজাৰ নামে রাজধানীৰ পরিচয় মুক্তিয রাজ্যদেৰ ইতিহাসে অভূতপূৰ্ব নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতেৰ মুক্তিয নৃপতিদেৱ মধ্যে ফিরোজশাহ তোগলক ছিলেন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। দীৰ্ঘ সাইতিশ বৎসৰ তিনি প্ৰথম প্ৰতাপে সুজনক পৰিচালনা কৰেছেন। দিল্লীৰ মুক্তিয বাদশাহদেৱ মধ্যে একমাত্ৰ আওৱসজেৱ ব্যতীত আৱ সহৰ চাইতেই তিনি ছিলেন বয়োবৃন্দ। মহম্মদ তোগলকেৰ মৃত্যুৰ পৰে তিনি যখন সিংহাসনে আৱোৱণ কৰেন তখনই তাৰ বয়স বাটৈৰ উৰ্ধে।

ইতিহাসে মহম্মদ বিন তোগলকেৰ নাম অব্যবহিতচিত্ত ও অপৰিণামসৰী নৃপতিৰ উদাহৰণ কৰপে কৃখ্যাত। কিন্তু একথা অৰ্থিকাৰ কৰাৰ উপায় নেই। যে, তাৰ চৰিত্ৰে বহু রাজেষ্ঠিত সদগুণেৰ সমাৰেশ ঘটেছিল। মহম্মদ বহু ভাষাবিদ, কবি, গণিতজ্ঞ এবং সুদৃঢ় জিপিকাৰ ছিলেন। সাহসী যোৱা এবং সজ্জনয় ভাজা বলেও তাৰ সুনাম আছে। আবাৰ নিষ্ঠুৱতাৰ জন্য নিশ্চাৰণ অভাব নেই। প্ৰসিদ্ধ আৱৰ্যী পৰ্যটক ইৱন বৃত্তার আঞ্চলিকে সমাট মহম্মদেৱ একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথৰ্থ বৰ্ণনা আছে।

“দান কৰা এবং হত্যা কৰা এই দুই ব্যাপায়েই রাজা মহম্মদ তুল্য ছিতীয় ব্যক্তি নেই। যে পথ দিয়ে তিনি যান সে পথে কোনো না কোনো অতি দৱিদ্ৰকে তিনি ধনী বানিয়ে যান, কোনো না কোনো জীৱিত ব্যক্তিকে তিনি পৰলোকে পাঠিয়ে দেন। একাধাৰে তাৰ মহাকুভবতাৰ ও বিষ্টুৱতাৰ শৈত শত গৱেলোকেৰ মুখে মুখে ফিরাছে।”

ইৱন বৃত্তা নিজে মহম্মদেৱ অধীনে কৰকে বছৰ দিল্লীৰ কাঙী অৰ্থাৎ প্ৰধান বিচারক ছিলেন।

মহম্মদেৱ নাম উজ্জ্বলবনী বুকি ছিল, কিন্তু সাধাৰণ কাণ্ডান ছিল না। বহু বিষয়ে পৰীক্ষা কৰায় তাৰ ঝোক ছিল। বেশীৰ ভাগ পৰীক্ষায়ই মাৰাঘক পৰিণতি ঘটেছে। উজ্জ্বল ভাৱত ধেকে দাক্ষিণ্যত্বে একাধিকবাৰ রাজধানী স্থানান্তৰিত কৰা, দিল্লী এবং দৌলতাবাদেৱ মধ্যে রাজধানীৰ সমুদয় অধিবাসীৰ গমন ও প্ৰত্যাগমন, বৌপ্য মুজৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ মৃত্যুৰ প্ৰচলন, চীন জ্যোতিৰ প্ৰয়াস ইত্যাদি মহম্মদেৱ সৰ্ববাণশা উদ্যোগেৰ একাধিক কাহিনী সুলপাপ্ত্য ইতিহাসে বাল্যকালে আমোদ পড়েছি।

জীৱনেৰ শেৰভাগে মহম্মদ আপন সেনাবাহিনী নিয়ে বৰ্তমান কৰাচীৰ নিকটবৰ্তী ধাট্টায় এক দৰ্গ অবৰোধ কৰেছিলেন। একদিন প্ৰভাতে সেখানে এক ধীৰুৰ সিজুনদে হঠাৎ এক অসূত মৎস্য শিকাৰ কৰেছিল। সে মৎস্য রাজসমীপে উপস্থিত কৰা হলো। সম্পূৰ্ণ অপৰিচিত আকৃতিৰ এই মৎস্য মানুৰেৰ রসনাৰ পক্ষে সুস্থানু কিলা সে পৰীক্ষাৰ বাসনা জাগল মহম্মদেৱ মনে। পাত্ৰমিত্ৰেৰ অনুৰোধ উপৰোধ আগ্ৰাহ কৰে সে মৎস্য সমাট আহাৰ কৰলেন। ইহলোকে সেই তাৰ শেষ পৰীক্ষা। সেদিনই জীৱনান্ত ঘটল তাৰ।

মহম্মদেৱ প্ৰতিভা ছিল, শক্তি ছিল। সে-সময়ে আলাউদ্দিন খিলজীৰ রাজধানী সিৱি ও প্ৰাচীন মেহৰোলীৰ মাঝখানে দিল্লীৰ বিশ্বশালী ব্যক্তিদেৱ বহু প্ৰাসাদ ও প্ৰমোদ্যান গড়ে উঠেছিল ধীৱে ধীৱে। কিন্তু যথোচিত রক্ষাব্যবস্থাৰ অভাবে মুঘল দস্তুদেৱ আক্ৰমণ সজ্ঞাবনা ধেকে সেগুলি মৃক্ত ছিল না। মহম্মদ তাৰ বিজ প্ৰাসাদ রচনা কৰলেন সেখানে। দুর্দেৱ প্ৰাচীৰ দিয়ে ধীৱে দিলেন সিৱি ধেকে মেহৰোলী। নব নগৰীৰ নামকৰণ কৰলেন ‘জাহানপুরা’—বাংলা ভাষায় যাৰ মানে হলো ‘ওগতেৰ আশ্রয়’। প্ৰাসাদেৱ সংলগ্ন ভূমিতে বৃহৎ এক হৃদ ঘনন কৰেছিলেন পানীয় জলেৰ সংস্থানে; কৃতৃবেৰ অনুৰোধতী বৰ্তমান খিৱকী গ্ৰামে আজও চোখে পড়ে এই প্ৰাচীৰেৰ

অবশিষ্টাংশ। তার গায়ে হুন্দে জল প্রবেশ-ব্যবস্থার চিহ্ন আছে পরিস্কৃট।

বর্তমান কৃতুব রোডের নিকটে সরকারী প্রচুরভাবিক বিভাগের খনন কার্যের ফলে অবিকৃত হয়েছে মহামদের স্নানাগার, তার জেনানা ও তার বিখ্যাত মঞ্চ, যেখানে বসে প্রত্যহ তিনি তার সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন। আলাউদ্দিনের সহস্রস্তুত কক্ষের অনুরূপ মহামদও একটি বিবাট কক্ষ নির্মাণ করেছিলেন, যার কিছু কিছু চিহ্ন আজও কোতুহলী দর্শকদের বিশ্বিত করে।

মহামদের মৃত্যুর পরে ফিরোজশাহ তোগলক সম্রাট হলেন। মহামদের তিনি আর্য্যায় এবং সেনানায়ক ছিলেন। সিঙ্গু থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দিল্লীতে। রাজ্যের গঠনকার্যে মনোনিবেশ করলেন অবিলম্বে। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, ফিরোজশাহই তারতের সর্বপ্রথম নরপতি যাঁর ধমনীতে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশে ছিল। তার জননী ছিলেন রাজপুতানী।

দুই বিভিন্ন ধর্মের সম্পত্তি প্রভাব তার চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। বিজ্ঞান ও শর্মণীয় বলে তিনি খ্যাত ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তার আকৃতিক স্মৃতি ছিল। সূর্যীয় যুগের প্রথম কৃতিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ফিরোজশাহ। আধুনিক ডেস্ট্রট যমুনা ক্যানেল নামে খ্যাত খালটি তিনিই খনন করেন। কর্নালের নিকটস্থ যমুনার মূল ধারা থেকে উৎসারিত হয়ে এর এক শাখা এসেছে দিল্লীতে, অপর শাখা গেছে হিসারে। ফিরোজশাহের আমলে এই খালের পরিধি বিস্তৃততর ছিল। সম্রাট সাজাহানের আদেশে তৎকালীন পূর্ববিভাগের অধিকারী মর্দান খা এই খালের সংস্কার সাধন করেন। এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সম্রাট সাজাহানের রক্ষণে হিন্দু প্রভাব ছিল। তার জননী যোধপুরী বেগমও রাজপুতানী ছিলেন। আহমদশাহ আবদুল্লাহ কর্তৃক দিল্লী অবরোধ কালে এ খালটি ফিরোজবার বিরুট হয় এবং প্রবর্তী যুগে ইংরেজ শাসকগণের চেষ্টায় তার পুনঃ সংস্কার ঘটে।

সৌধ নির্মাণে ফিরোজশাহের গভীর অনুরূপ ছিল। এদিক দিয়েও সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল ছিল। কৃতুব মিনারের উর্ভরতন যে সুটি তলা খেতে পাথরে গড়া তা ফিরোজশাহেরই কীর্তি। ভূমিকক্ষে কৃতুবের যে ক্ষতি ঘটেছিল তারও সংস্কার তিনিই করেছিলেন। দিল্লীর হিন্দুরাও হসপাতালের সংলগ্ন ‘বীজে’ এখনও তার নির্মিত মৃগয়াগ্রহের ভগ্নাবশেষ বর্তমান।

সিরি, বিজয়মন্ত্র ও কৃতুবে তিনি নগরী ধাকা সংস্কেত ফিরোজশাহ যমুনার ধারে আর একটি নৃতন নগরের প্রস্তর করলেন। একেবারে যমুনার ঠিক গায়ে নির্মাণ করলেন রাজপুরী ফিরোজশাহ-কোট্টা। আজ তোরণপথে চুকলেই বী দিকে চোখে পড়ে বিস্তৃত তৃণজ্বানিত অঞ্চল। একদা সেখানে ছিল ফিরোজশাহের দরবার গৃহ। আজ আমাদের পিকনিক পার্টির অসর ঘমল সেখানে।

দলটি কুস্তি নয়। ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রায় জন বারো। কিন্তু অধিনায়িকা আহাৰ্য যা জনেছেন, তা শিয়ে অন্যায়ে তার ডেল লোকের উদ্দৰ পৃষ্ঠি করা যেতে পারে।

পিকনিকে সব চেয়ে যিনি মনোযোগের যোগ্য, তিনি মিস্টার খোশ্লা। বহুল পরিচিত ব্যক্তি। শিশু করে মহিলা মহলে। মেয়েরা এগজিবিশন করেছেন, তার দরজায় ভলাটিয়ারী করেছেন। ১৯৮ মিস্টার খোশ্লা। মহিলা সমিতি দামোদর বন্দ্যো সাহায্য ভাগুরে টাক্ক তুলেছেন। ১৯৮৪ মের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘূরে টাদা আদায় করেছেন কে? মিস্টার খোশ্লা। টাদানী চক থেকে ফিল্মস মুখার্জীর উল কিনে আনছেন, মিসেস স্বামীনাথনের জন্য পাঁচ শেকান ঘূরে পতস ঝীম খেগাড় করেছেন। সমস্তই মিস্টার খোশ্লা। নয়দিনীতে মেয়েরা আছেন অর্থ মিস্টার খোশ্লা শেষ, এমন কোনো সভা, সমিতি, পার্টি, পিকনিক কেউ করলা করতে পারবে না।

শাপারণ পাঞ্জাবীর তুলনায় বেটো, দোহারা চেহারা। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। নির্বাক যুক্তের প্রিমারিমেন্ট ডগলাস ফেয়ারব্যাক্স-এর অনুকরণে দীর্ঘ জুলপি গালের মধ্যপথ পর্যন্ত প্রসারিত। ডিল্লারেণ মতো গোপের কায়দা। পরিশানে ব্রাউন রঙের কর্ডুয়ের প্যাট, পায়ের গোড়ালির কাছটা সক। প্যান্টের পিছনে হিপ-পকেট। তাতে মনোগ্রাম-করা লস্ব রূপার সিগারেট কেস যার

গর্ভে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেট রাখা চলে । গায়ে গ্যার্ডিনের কেট । প্রায় আজানুল্লাহিত । নীচের পকেট দুটি ইন্দের চাদের অ্যাক্টিভেট কাটা । সিজের সার্ট । টক্টকে লাল রঙের টাই, তাতে নীল রং-এর লতাপাতার ছাপ । মাথায় একটি সবুজ ফেস্টের টুপি, নীচের সিকে-নামিয়ে পরেন । পায়ে কখনও কহিনেশন সূ, কখনও বা বাক্লস আটা সুয়েডের জুতা । দিনের বেলায় ঢোকে এক জোড়া মোটা শেলের ফ্রেমযুক্ত সানগ্লাশ । রোদ থাক আর নাই থাক । মেয়েদের হাতে রিস্টওয়াচের মতো মিস্টার খোশলার গগলসও প্রয়োজনের জন্য নয়, শোভার জন্য ।

মিস্টার খোশলার প্রকৃত পেশা নিয়ে মতভেদ আছে । কেউ বলে তিনি কন্ট্রাক্টর, কেউ বলে তিনি দু' তিনটে বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, আর কেউ বা এমন কিছু বলে যার ইংরেজী উর্জমা করলে কথাটা দাঢ়ায়,—ফ্রেফ লোফার । তিনি নিজে কার্ডে নামের পিছনে লেখেন একটি শব্দ যা দিয়ে নলিনীরঙেন সরকার থেকে শুর করে বাবুগঙ্গের হাটে কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদ্বারা পতিতপাবন সাহাকে পর্যন্ত বুকানো যায় । মার্চেন্ট । কিন্তু কাজ তার যাই হোক, ব্যক্ততার অভাব নেই । এই সারল পেট্রোল রেশনিং-এর দিনেও সারাদিনই দেখা যায় তিনি তার বেবী অস্টিন নিয়ে ব্যক্তসমষ্ট হয়ে ছুটছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে । পথে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে এক মিনিট কথা বলেই বল্টেন “আজ্জা ভাই, এখন বড় ব্যস্ত । আবার দেখা হবে, শ্যাল সি ইউ এগেন !”

পিকনিকে খোশলা বিপুল উদ্যমে মেয়েদের আহার্য পরিবেশন করলেন । স্যান্ডউইচের প্রেট নিয়ে ছুটতে গিয়ে প্রায় আছাড় খেতে খেতে বেঠে গেলেন । সন্দেশের থালা নিয়ে হস্তদ্রু হলেন, কোনো মহিসাকে “প্রিজ” কোনো মহিসাকে বা “ফর মাই সেক”, বলে দুটো বেশী পেঁপ্তী খাওয়ালেন । একটি ডক্রী অন্য কার কাছে এক গ্রাণ জল চাইছিলেন । পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মিস্টার খোশলা । তার কানে যেতেই “জল, জল, মিস উপাধ্যায়ের জন্য জল” বলে এমন উত্তলা হয়ে জলের অবেষ্টে ছুটতে লাগলেন যে, মনে হলো, হাতের কাছে অন্য কোথাও না পেলে তিনি বুঝিব তৎক্ষণাত ডগীরধৰের ন্যায় গঙ্গা আনয়নের জন্য কৈলাসে ছুটবেন !

ত্রীমতী সুবা রাও প্রস্তাৱ কৰলেন চারিদিকে ঘূৰে দেখবাব । দেখাৰ মধ্যে যা আছে তা ফিরোজশাহ নির্মিত একটি মসজিদ । সুলতান পাত্ৰমিৰ নিয়ে জুয়াৰ দিনে প্রার্থনা কৰতে আসেন । অনুমান কৰা অন্যায় নয় যে, সেদিন এই মসজিদের শুরুত ছিল অসাধারণ । যদিও আজ ভগ্নদশা দেখে তার বিগত সৌষ্ঠব বৃথাবাৰ উপায় নেই । কিন্তু তার গঠন-পারিপাট্য লক্ষ্য কৰার মতো । ইংরেজীতে যাকে বলে ‘প্ৰোপোৱন’—ফিরোজশাহ-কোটেলার মসজিদ ও অন্যান্য প্ৰাচী-ভগ্নাবশেষে তা বিশেষভাৱে বৰ্তমান ।

ফিরোজশাহেৰ আমলে সৰ্ব প্ৰথম ভাৱতীয় স্থাপত্য হিন্দু ও মুঠিম পঞ্জতিৰ সিন্ধেসিস পটেছিল । প্ৰাক্যুলিম যুগের উত্তৰ ভাৱতীয় হিন্দু স্থাপত্য ছিল সম্পূৰ্ণ আলাদা ধৰনেৰ । অতি প্ৰাচীন হিন্দু মন্দিৰে এখনও তাৰ চিহ্ন আছে । বৰ্তমানে জৈন পঞ্জতি নামে অভিহিত এ স্থাপত্যেৰ সৰ্বজ্ঞেষ্ঠ নিদৰ্শন বোধ হয় রাজপুতনাৰ মাউন্ট আৰু পৰ্বতোপৰি বিখ্যাত মন্দিৰটি ।

সেদিনেৰ হিন্দু স্থাপত্য আৰ্ট—অৰ্থস্থাকাৰ গঠন—ছিল না । তাৰ বৈশিষ্ট্য ছিল চতুৰঙ্গ স্তৰে । এই স্তৰগুলি কাৰকাৰ্য্যাখ্যতি ! কোনোটাতে দেবদেৰীৰ সূতি, কোনোটাতে পুষ্পসজ্জা, কোনোটাতে বা বাটা কিন্তু গাছ । প্ৰস্তৱে গঠিত এই স্তৰগুলিৰ অলঙ্কৰণেৰ মধ্যে মিলত সেনিনকাৰ হৃষিভিত্তেৰ মণ্ডন-চাতুৰ্যেৰ পৰিচয় । সেকালেৰ স্থাপত্যে গঙ্গাজৰেও অন্তিম ছিল না । চতুৰঙ্গ স্তৰেৰ উপরে সমাপ্তৰাল প্ৰস্তৱখণ একটিৰ পৰ একটি সাজিয়ে দু দিক থেকে ক্ৰমশঃ মিলিয়ে আনা হতো মাঝখানে । তাৰ, গবাক্ষ ও প্ৰবেশপথেৰ উপৱাংশে আৰ্টিৰ পৰিবৰ্তে এই গঠন অনেকটা শাগ-কাটা সিডিৰ মতো দেখায় । আৰ্টেৰ ভাৱবহন ক্ষমতা অধিক এবং তাৰ ব্যবহাৰ যুৱোপ ও মধ্য এশিয়ায় প্ৰচলিত ছিল ।

এই স্থাপত্যেৰ প্ৰথম পৱিবৰ্তন ঘটল দ্বাদশ শতাব্দীৰ শেষ ভাগে । দাস বৎশেৰ কৃতুব্যদিন আইবেক দিল্লীতে এসে প্ৰথম তৈৰী কৰতে চাইলেন একটি মসজিদ যেখানে বসে তিনি আজ্জাৰ কাছে পাঠাতে পাৰবেন প্ৰচুৰতৰ অৰ্থ প্ৰবলতৰ প্ৰতাপ এবং প্ৰভৃততম শাস্তি কামনা কৰে প্ৰাতাহিক আবেদন । বলা বাহুল্য তার নিজ ভদ্ৰস্থান আঘণানিস্থানে যে ধৰনেৰ মসজিদেৰ সংস্ক

তিনি আশেশের পরিচিত তারই অনুরূপ ভজনালয় নির্মাণ করা ছিল তার বাসন। সে-মসজিদ পয়েন্টেড আর্টের, অনেকটা গণিত শাস্ত্রের দ্বিতীয় বজ্জনীচিহ্নের মতো খিলানের উপর তৈরী।

গোমানরা ব্যবহার করতো বৃত্তাকার আর্ট। আরবীয়েরা পছন্দ করতো পয়েন্টেড আর্ট। পশ্চিমের সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পয়েন্টেড আর্ট সম্বলিত স্থাপত্যের প্রথম নির্দশন হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত ইরাকের অস্তর্গত সামারীয় মসজিদটি। হিন্দু স্থপতিদের জ্ঞান ছিল না তার নির্মাণ কৌশল। কাবুল কাস্থাহার থেকে মুঞ্জিম কারিগর আনা ও সম্ভব ছিল না। সুত্রবাং দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে নির্দশন রইল সেটা হিন্দু ও মুঞ্জিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গোজামিলন। কৃতুব যিনার সংলগ্ন মসজিদে আজও তার প্রমাণ আছে। সে মসজিদের বারান্দায় ৫ দ্বারপথে অর্ধবৃত্তাকার গঠন সত্ত্বিকার খিলানের উপর নয়। তাতে ‘কী-স্টোন’ নেই।

মুঞ্জিম স্থাপত্যে দেবদেবীর মূর্তি বা পুষ্প ও বৃক্ষসমূহ উৎকীর্ণ করার সীমা ছিল না। কোরাণের এচন উদ্ধৃত হতো মসজিদের প্রাচীরের গায়ে ও আর্টের উপরে। আরবী লিপি ও কোরাণের রচনা সম্পর্কে কৃতুবদিনের মসজিদ নির্মাণের ভারতীয় রাজমিত্রীদের জ্ঞান ছিল সামান্যই। তাই কৃত্রিম আর্টের উপরে তারা বৃক্ষ অঙ্কন করে তার আশেপাশে আরবী বচন উৎকীর্ণ করার প্রয়াস করেছে কোনো মতে। হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন মসজিদের সংলগ্ন মণ্ডপে আরও অধিকতর প্রকট। তার স্তুতগুলি নিঃসন্দেহে কোনো হিন্দু মন্দির থেকে আহত। সেকালের মুঞ্জিম নরপতিরা মুঠনকে লজ্জার বিষয় মনে করতেন না। বরং অপহৃত স্বরের প্রকাশ্য ব্যবহারের দ্বারা তারা বিজয়স্তুত রচনা করে আপন অপকৃতির সাঙ্গ্য রাখতেন প্রবর্তীকালের জন্য।

সুলতান আলতামাস কৃতুবদিন রচিত মসজিদের বিস্তার সাধনে উদ্যোগী হয়ে গজনী থেকে আনন্দেন মুঞ্জিম স্থপতি ও কারিগর। তারা জ্যামিতিক পদ্ধতির মুঞ্জিম অলঙ্করণ প্রচলন করল ভারতবর্ষে। খিলজী যুগে অধিক সংখ্যক মুঞ্জিম রাজমিত্রী এল আফগান থেকে। তারা প্রবর্তন করল চতুর্কোণ স্তম্ভের পরিবর্তে ‘কী-স্টোন’-সৃষ্টি সত্ত্বিকার আর্ট, সমতল ছাদের বদলে গম্বুজ, চলতি ভাষায় যাকে বলে শিকারা, এবং ঘন্টা, পুষ্প, বৃক্ষ ইত্যাদির বদলে জ্যামিতিক রেখাকলন সজ্জা। ভারতে পুরোপুরি মুঞ্জিম স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হলো। কৃতুব সংলগ্ন আলাই দরওয়াজা ও নিঃসন্দেহের জামাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দু প্রভাববর্জিত একান্তভাবে মুঞ্জিম স্থাপত্যের নির্দশন।

তোগলক রাজত্বে, বিশেষ করে ফিরোজশাহের নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ ও অন্যান্য অট্টালিকায় হিন্দু স্থাপত্যের পুর্বব্যবহার দেখা গেল। সে যুগের স্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো অলঙ্কার ও বাটুল্যবর্জিত গঠন। সাধারণ পাথর ও চুন সুরক্ষির আন্তর দিয়ে তা তৈরী,—খিলজী আমলে ও প্রবর্তী মুঘল যুগে ব্যবহৃত লাল বা শেষে পাথরের চিহ্ন বড় নেই। বোধ হয় মুঘল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও দাক্ষিণ্যতা অভিযান প্রভৃতিতে ফিরোজশাহের পূর্ববর্তী রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছিল, ব্যবহৃত প্রস্তর ব্যবহার আর সম্ভব ছিল না। মহম্মদ তোগলক কর্তৃক গুরুবার দিল্লীর অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করার ফলে পাথরের কাজে দক্ষ রাজমিত্রীর অভিব

গঠিত বিচ্ছেদ নয়।

ফিরোজশাহের সৌধাবলীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, চতুর্কোণ স্তম্ভের ব্যবহার, দ্বারপথে ও গুণাঙ্গায় আর্টের বদলে হিন্দু পদ্ধতির গঠন এবং প্রশংসিত পদ্ম উৎকীর্ণ আটীর-সজ্জা। ফিরোজশাহ নির্মিত হাউজ খনের প্রবর্তী অংশগুলিতে আছে এর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মসজিদের গায়ে যে অট্টালিকার উপর অশোক স্তম্ভটি আছে তার আরোহণপথ খুব কঠিন নয়। শিল্পির ধাপগুলি কিছুটা উচু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গী নারীবাহন মিস্টার খোশলা থাকতে খেয়েদের চিত্তার কারণ নেই। প্রত্যেকটি মহিলা নিরাপদে উপরে না ওঠা পর্যন্ত তিনি নীচে নীচে দুরাক করলেন। বেশী পরিচিতদের হাতে ধরে উঠতে সাহায্য করলেন এবং সদা পর্যাপ্তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘মে আই—।’

অশোক স্তম্ভটি প্রাসাদের যে অংশে স্থাপিত সেটা ফিরোজশাহের অন্দরমহলের অস্তর্ভূক্ত ৩০% কাঁধও। স্তম্ভটি প্রস্তর নির্মিত। আস্থালায় নিকটবর্তী এক গ্রামে সম্প্রট অশোক কর্তৃক এই স্তম্ভটি

গাম্ভীর অমনিবাস ৪

স্থাপিত হয়েছিল প্রাইটজগ্রের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে। একদা ঘৃণ্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে 'তা' ফিরোজশাহের চোখে পড়ল। পুরাকীর্তিতে ফিরোজশাহের গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। সেখান থেকে সন্তুষ্টি তুলে নিয়ে এলেন তিনি দিল্লীতে, তার রাজধানী ফিরোজশাহ-কোটলায়।

বিয়ালিশ চাকার গাড়িতে চাপিয়ে শত শত মজুর টেনে এনেছিল এই সন্তুষ্টিকে। সন্তুষ্টির শৌর্ষে একটি স্বর্ণ নির্মিত আঙ্গুদান ছিল। পরবর্তী যুগে জাঠ দস্তুর দিল্লী লুটনকালে 'তা' আঘাসাং করেছে। বহুবর্ষ পরে সন্তুষ্টের গায়ে পালি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিপত্র পাঠোকার হয়েছে। অহিংসা ও সর্বজীবৈ দয়াপ্রদর্শনের অনুরোধ জনিয়ে ভগবান বৃক্ষের অনুগ্রামী সন্তাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে যে বহুশত অনুশাসন প্রচার করেছিলেন, এই সন্তুষ্টে তারই একটি সাক্ষ্য রয়েছে।

অশোক সন্তুষ্টের পাশে দৈত্য যায় অদূরবর্তী যমুনার জলশোত। ফিরোজশাহের আমলে যমুনার ধারা কোটলার পাদদেশ স্পর্শ করত সে কথা বুঝতে আজও কঢ়ুমাত্র কঢ় হয় না।

নীচে নেমে সদলবলে বসা গেল খোলা মাঠের মধ্যে। পাশে একটি কুম্ভ জলাশয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, বাটুলী। দারুণ শ্রীমতের দিনে সুলতান অবগাহন করতেন এর জলে, বিশ্বাম করতেন এর তীরবর্তী পাষাণ-বেদিকায়।

কে একজন বললেন, “তাস সাথে থাকলে একহাত খেলা যেত।”

আমাদের অধিনায়িকা অমনি তার তোরঙ থেকে বার করলেন দু'প্যাকেট সুদৃশ্য ঝক-ঝকে তাস, নবর লেখার ছাপানো প্যাড ও পেস্টিল।

সবাই জয়ধ্বনি করে বলল—“একেই বলে দূরদৃষ্টি। সকল কালের সকল রকম দরকারের কথা যিনি আগে থাকতে ভেবে রাখেন, তারই নাম অনাগতবিধাতা।”

ডাক্তার অধিকারী আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যোজ্যেষ্ঠ। আর্মিতে সেফটেনেট কর্মেল। অত্যন্ত রাসিক লোক। মাথার পাকা চুল দিয়ে মনের কাচা ভাবকে ঢেকে রেখেছেন। মাইল দশক দূরবর্তী ক্যাট্টমেন্ট থেকে এসেছেন পিক্নিকে যোগ দিতে। কন্ট্রাক্টরিজে তার ছুড়ি মেল ভার। ঝুশি হয়ে বললেন, “ক্রীপস আলোচনা চলছে। স্বরাজ হলে আমরা ওকেই প্রেসিডেন্ট করব। স্বাধীন ভারতে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট, মিসেস বিজয়া ব্যানার্জী কী—”

সবাই মিলিত কঠে উচ্চধ্বনি করলেন, “জয়।”

বাধা দিয়ে বললেম, “কর্মেল, প্রেসিডেন্ট বললেই মনে হয় পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃক্ষ। তার চাইতে বলুন মহারাজী।”

কর্মেল তৎক্ষণাত স্বীকার করলেন; “ঠিক বলেছ ভায়া। মহারাজী তালো। দিল্লীর বিভীষণ মহিলা সন্তানী। সুলতানা রিজিয়ার পরে সুলতান বিজয়া। অয় মহারাজী বিজয়া কী জয়। বদ্দে মাতৃরম, আজ্ঞা হো আকবর, হিপ্ হিপ্ হুবরে।”

তাবী সুলতানা সহস্র্যে জিজ্ঞাসা করলেন, “একসঙ্গে তিনটাই বলেন নাকি আপনি?”

“নিশ্চয়। গক্ষী মহারাজ, জনব জিমা ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে খুশি রাখতে হয়। যখন ধার হাতে ক্ষমতা আমি তারই দলে আছি। অবস্থা অনুযায়ী যার যত তাড়াতাড়ি মত বদলায় ইঁরেকীতে তাকেই তো বলে তত প্রগ্রেসিভ।”

মিস্টার জুবেরী সদ্য আই. সি. এস. হয়েছেন। বিলেভে শগুন সুল অব ইকনমিরে কিছুকাল পড়েছিলেন। সোশ্যালিজমে এখনও ভক্তি আছে। বললেন, “মহারাজী তো মনাক্ষিজম। ডেমোক্রেসির যুগে তা’ চলবে না।”

কর্মেল বললেন, “খুব চলবে। ঘরে ঘরে মনাক্ষিজম চলছে, আর ঘরের বাহিরে গভর্নমেন্টে চলবে না? ভায়া হো তোমার বয়স অৱ, শিখতে এখনও চের বাকী। ডেমোক্রেসি বকুটা আছে শুধু হ্যারেন্স ল্যান্ডিং বইতে। আমাদের মিস্টার ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তার বাড়িতে তাব জানলার পর্দা নীল হবে কি সবুজ হবে, সকালে সুজে রামা হবে কি ছেঁকি রামা হবে—এসব সিদ্ধান্ত ব্যানার্জীর ভোট নিয়ে ঠিক হয়, না মহারাজীর হুকুমে চলে? বিয়ে করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, হার মেজেন্টিস গভর্নমেন্টে আর যাই থাক, সীড়ার অব দি তাপ্পাজিশন নেই।”

অবল উচ্চ হাস্য উপরিত হলো সভায়।

লজ্জাজড়িত আস্থাপ্রসাদে মহিলার গৌর গুরুত্ব রক্ষিত হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আর কথা নয়। আসুন এবার খেলা যাক।”

হাত জোড় করে বললেম, “মাপ করবেন ও বিদ্যে আমার একেবারে জানা নেই।”

“বলেন কী? আচ্ছা তা হলে খেলা থাক। গান করুন।”

“কী সর্বনাশ! তার চাইতে বরং কৃতৃপক্ষ মিলারের উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে বলুন। না হয় আপনার খাতিরে তাই চেষ্টা করে দেখব। গান করলে অবশ্য লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা হবে আপনাদের।”

ব্যানার্জী বললেন, “তবে আবৃত্তি শোনান, রবি ঠাকুরের কবিতা।”

জবাবে বললেম, “ছোটবেলায় সংস্কৃত শব্দরূপ আর বড় হয়ে জুরিসপ্রুডেক্সের ধারা মুখস্থ করে করে কবিতা মনে রাখবার আর সময় পেলেম কখন?”

মিসেস বললেন, “আচ্ছা, তা হলে গল্প বলুন।”

ডাঙুর অধিকারী অ্যামেন্ডমেন্ট যোগ করলেন,—“প্রেমের গল্প।” হেসে বললেম, “কর্নেল, প্রেমের হলে সেটা যে গল্পই হবে, সত্যি হবে না, সে তো জানা কথা। কিন্তু সে গল্পও আমার জানা নেই। চান তো ভূতের গল্প বলতে পারি। জানেন, এই বাড়ীর ধারে ঠিক আপনার ডাইনে মিসেস মিত্র যেখানটায় বসেছেন, সেখানে রাজৱর্ষের দাগ আছে? সবাটি দ্বিতীয় আলমগীরকে এখানে হত্যা করা হয়।”

“ও মাপো!”—বলে তিং করে লাফ দিয়ে সরে একেবারে দলের মাঝখানটিতে এসে বললেন মিসেস মিত্র। বার বার নিজ শাড়ির দিকে পরিক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, সত্যিই রঞ্জের দুঁ একটি ছিটে ফৌটা তাঁর বসনে লেগেছে কিনা সেই আলঙ্কার। সবাই খানিকটা হেসে নিল। কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও যে একটু চক্ষু না হলেন তা নয়।

ফিস্টার খোশ্লা মিসেস মিত্রের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হলেন। বার বার বলতে লাগলেন এমন ভাবে মেয়েদের ভয় দেখানো যোগাই উচিত হয়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে শক্ত লাগলে সাজ্জাতিক ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিনায়কা দমবৰার পাণ্ডী নন। বললেন, “বেশ, বলুন ভূতের গল্প। সত্যি ভূতের হওয়া চাই কিন্তু। বানানো নয়।”

“মিসেস ব্যানার্জী, ভূত চিরকালই বানানো হয়ে থাকে। ভূতের গল্পের তো কথাই নেই। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় তাও আমি জানি নেই।”

মহিলা সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, “না না, আপনি কেবলই ফাঁকি দিচ্ছেন। তাস খেলা নয়, গান নয়, গল্পও নয়। একটা কিছু করুন।”

কর্নেল বললেন, “তাই তো হে, তোমার কেস খারাপ হচ্ছে। তুমি যদি কোনো কিছুই না পার তবে মহারাজার গভর্নমেন্টে তোমার জায়গা হবে না।”

মহিলা বললেন, “সত্যি তোঁ: আপনাকে নিয়ে করব কী? গান গাইতে জানেন না যে, বৈতানিক হবেন! পদ্ম কইতে পারবেন না যে, সভাপতিত্বের চাকরি দেব। গল্প বলতে পারেন না যে, বয়স্য করব। এমন অকর্মা লোক আপনি, হবেন কী?”

যুক্তকরে বললেম, “আমি তব মালকের হব আলাকার।”

বিপুল হাস্যরোল।

দশ

আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগীর অত্যাসুস মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরেও যে প্রফেসন্যাল নির্দিষ্টতা নিয়ে ডাঙুর প্রেসক্রিপশন লিখে যান, ক্রীপস আলোচনা সম্পর্কেও বর্তমানে আমাদের সেই মনোভাব উপস্থিতি। এর ব্যর্থতা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে সমাবেশে জানলিটেডের মনে এখন আর সংশয় নেই। প্রথম এখন শেষ মুহূর্তে হঠাৎ অভ্যাশিত কিছু ঘটবার নয়, প্রথম কবে আলোচনার অসাফল্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

অথচ মাত্র সপ্তাহ দুই পূর্বেও ক্রীপস্-দৌত্তের এই পরিগতি আশঙ্কা করার কারণ ছিল না । বরং এই রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা শীঘ্রই ভারতবর্ষে ও ব্রিটেনের মধ্যে একটা সম্মানজনক শীমাংসার ফলে ভারতে জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশাই বেশীর ভাগ সোকে পোষণ করেছে ।

উনিশ শ একচালিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান বৃটেন ও এমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল । প্রথম দিনেই পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হলো । তিনি দিন পরে বৃটিশ নৌবহরের অন্যতম গর্ব ও নির্ভুল প্রিস-অব-ওয়েলস ও রিপালস জাপানী বোমার আঘাতে প্রশংস্ত মহাসাগরের গর্ভে সলিল সমাধি লাভ করল । দেখতে দেখতে হংকং ও মালয় জাপানীরা কেড়ে নিল । বোলাই ফেরুয়ারী সুন্দু প্রাচ্যে ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাঁটি—যা দুর্ভেদ্য বলে সবার ধারণা ছিল—সিঙ্গাপুরের পতন ।

দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনকালে এই প্রথম জল এবং হৃলপথে ভারতবর্ষ শক্ত আক্রমণের সন্ধুয়ীন । কর্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ, সাধারণের মনে ভূতি এবং সহজবিশ্বাসপ্রবণ অভ্যন্তরের অসংবচ্ছ রসনায় নানাবিধ ত্রাসজনক রটনার সৃষ্টি হলো ।

এই পরিস্থিতির মুখোয়াথি দাঢ়িয়ে হাউস অব কম্পেস প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করলেন—ওয়ার ক্যাবিনেট সর্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্পর্কে একটি ন্যায়সংস্কৃত ও চূড়ান্ত সমাধান—জাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল সলিউশন—ফ্রিং করেছেন এবং লর্ড প্রিভিসীল সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ নিজে ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মতি সংগ্রহের জন্য মন্ত্রিসভার প্রস্তাবটি নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন ।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ভারতের দাবি । বারংবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব । মাসখানেক পূর্বে মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম এসেছিলেন ভারতবর্ষে । তাঁরা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ব্রিটেনকে ভারতীয়দের হাতে যথাসম্ভব ক্ষিপ্তায় প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন । প্রেসিডেন্ট রংজেন্ট তাঁর পরেই সুস্পষ্ট ভারতীয় চার্চিলের উক্তির প্রতিবাদ করে বলেলেন, অ্যাটলাস্টিক চার্টার সমগ্র পৃথিবীর জন্য, কেউ তা থেকে বর্ধিত হবে না । এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী এভার স্টেখানকার পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা দাবিকে ন্যায় বলে স্বীকার করে বলেলেন, সে দাবির প্রতি অস্ট্রেলিয়ানদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে ।

ভারতবর্ষে জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সম্বিলিত জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান অনুকূল মনোভাব ও প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা ব্রিটেনের বৰকংশীল কর্তৃপক্ষ বিব্রত হচ্ছিলেন সদেহ নেই । কিন্তু তাঁর চাইতেও গুরুতর কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় । সে কারণ সহদ্যতার নয়, অনুরোধ উপরোধ বা উপদেশজ্ঞাত নয় । কারণ কঠোর বাস্তব ঘটনা পরম্পরার । আটাই মার্চ রেস্টুনের পতন হলো, এবং ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটল । ভারতবর্ষের বিকৃক্ত জনমতকে শাস্তি ও ইংরেজের অনুকূল করার প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্বে এমন আর কখনও অনুভূত হয়নি । এগারই মার্চ চার্চিল ক্রীপস্ মিশনের কথা ঘোষণা করলেন ।

তবুও একথা মানতেই হবে যে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব উৎসাহের সংশ্লেষণ করেছিল । এদেশের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেটের এই নব প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করল । বোধ হয় এতদিনে সত্য সত্যাই ব্রিটেন ভারতীয় সমস্যার সত্যিকার সমাধানে উৎসুক । ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বীকৃত ।

ভারতে এই অনুকূল মনোভাবের পশ্চাতে ছিল মন্ত্রিসভার ভারপ্রাপ্ত আলোচনাকারী ব্যক্তিটির প্রতি ভারতবর্ষের আশা । সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতবর্ষ বর্তমান শতাব্দীর মুষ্টিমেয় ভারতহিতৈষী ইংরেজের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান করে থাকে । ক্রীপস ইতিপূর্বে দু'বার ভারতবর্ষে এসেছেন । কংগ্রেস নীতি, ও কর্মপক্ষতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে । পাঁচত জওহরলাল নেহেরুর তিনি একজন অস্তরেস সুন্দর । একাধিকবার ভারতে ইংরেজ শাসনের দ্বারিত সমাপ্তি কামনা করে তিনি লেখনী চালনা করেছেন । বেশী দিনের কথা নয়, মুরোপে যুদ্ধ ঘোষণার সাত সপ্তাহ পরে হাউস অব কম্পেস দাঢ়িয়ে গভীর প্রত্যয়বৃক্ষক স্বরে ক্রীপস বলেছেন, “কংগ্রেসের নয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতীয়দের ন্যায়সংস্কৃত

দাবি আজও অপূর্ণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক কলহের কথাটা একটা ছুতা মাত্র!"

সেই ক্রীপসের আগোষ আলোচনা নির্বর্থক হতে চলল! মতভেদের বর্তমান কারণ দেশরক্ষার প্রয়োগ! ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবনামারে দেশরক্ষার ভাব থাকবে একান্তভাবে প্রধান সেনাপতির হাতে। কংগ্রেসের দাবি, দেশরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর। সে দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে অনুপ্রবেশ সংগ্রহ প্রয়োজন তা একমাত্র ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের পক্ষেই সভ্য, বিদেশী কমান্ডার-ইন-চীফের নয়।

যুক্ত পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভাব কংগ্রেস প্রধান সেনাপতির উপরে ন্যস্ত করতে রাজী ছিলেন। সে ব্যাপারে তাকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দানে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেশরক্ষার মূল দায়িত্ব ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের হাতে না থাকলে স্বাধিকার লাভের অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে দেশের অন্যান্য সমস্যা ও ব্যবস্থা দেশরক্ষার বৃহত্তর প্রয়োগের স্বারাই বহুলাঙ্গে প্রভাবাব্হিত। সত্যিকার দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভের পরিমাপ দেশরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দ্বারাই নিখণ্ডিত হয়।

এই যুক্তির সরবর্তা অধীকার করা ক্রীপসের সাধা ছিল না। তাই তিনি বিকল্প প্রস্তাবিত নব দেশরক্ষা সচিবের ক্রমীয় কর্মর একটি তালিকা দিলেন, প্রধান সেনাপতি যুক্ত সচিবরাপে সমর পরিচালন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশরক্ষা সচিব আখ্যা নিয়ে একজন জমপ্রতিনিধি দেশরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

ভালো কথা। কিন্তু এ দৃঢ়নের কর্মবিভাগ হবে কী ভাবে? ক্রীপস্ প্রস্তাবিত নব দেশরক্ষা সচিবের ক্রমীয় কর্মর একটি তালিকা দিলেন। সে তালিকায় আছে, (১) পেট্রোল সরবরাহ; (২) স্টেশনারী অর্থাৎ কাগজ, পেপ্পল, নিব, কালী, কলম কেনা, রাখাৰ ভাব, ফর্ম ছাপান; (৩) ক্যাস্টিন পরিচালনা ইত্যাদি।

গার্জীর্য রক্ষা করে এই তালিকাটি পাঠ করা কঠিন। এদেশের অস্তঃপুরে পানের ভিতরে লক্ষার কৃতি, শুচির মধ্যে ন্যাকড়া ও সরবরাতে চিনির বদলে নন মেশানো প্রভৃতি কতকগুলি জামাই-ঠকানো প্রাচীন মেয়েলী কৌতুকের কথা শোনা আছে। কিন্তু চার্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ নিয়ে দুই দেশের নেতৃত্বান্বীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যেখানে চরম শুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলেছে, সেখানে এই পিড়ির মীচে সুপুরি রেখে আছাড় খাওয়ানো রসিকতা নিষ্ঠায়ি কেউ প্রত্যাপা করে না।

অপরাহ্নে ইশ্পিরিয়াল হোটেলে এক সাংবাদিক বুরুর চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বুরুটি কংগ্রেসের সমর্থক নন, গার্জীজিকে তিনি সাংসারিক বৃহিনীয় বৃপ্তিবিলাসী আন্ত্রিকটিক্যাল আইডিয়েলিস্ট—মনে করেন। ভারতীয় নন। এমেরিকানও নন,—ইংরেজ। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, “ব্রিটেনের ফোন শত্রু এই তালিকাটি বচনা করে ক্রীপসের হাতে দিয়েছে? জাপানীদের টাকা থাক্কে এমন কোনো ফিফথ কলামিস্ট নয় তো?”

অস্ত্রব নয়।

বুরুটি শীতিমতো ক্রুক্ষ হয়েছিলেন। বললেন “পেট্রোল, স্টেশনারী, ক্যাস্টিন! খাঁরা কাটি ও দাঁতের খড়কে নয় কেন—হায়াই নট বুমস্টিক্স্ আবু টুথপিক্স্?”

ভারতবর্ষের প্রথম দেশরক্ষাসচিব হবেন পশ্চিত জওহরলাল নেহরু, এই কথা গত এক সপ্তাহ ধরে নানাভাবে আমরা আলোচনা করেছি। একবার কঠনা করে দেখা যাক জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে উন্নুন করে পশ্চিত নেহরু তার অনবদ্য ভাষ্য বেতারে আবেদন করছেন, তার সঙ্গে পড়ে শোনাচ্ছেন কর্মের তালিকা—“পেট্রোল, পেপ্পল, নিব, আলপিন—।” পৃথিবীতে সব জিনিসেরই নাকি মাত্রা আছে। নেই কি শুধু নিরুদ্ধিতার? পরিহাসের?

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই,—যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের। সে দায়িত্ব শুধু ভারতের অগণিত জনসাধারণের প্রতি নয়, সে দায়িত্ব মিত্র জাতিসংঘের প্রতি, যাদের সঙ্গে সম্প্রতিভাবে ব্রিটেন যুক্ত করছে অক্ষশক্তির বিকৃক্তে। সে দায়িত্ব তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারেন না।

দেশরক্ষার প্রশ্নটি ভারতবর্ষের পক্ষে নানা দিক দিয়ে জটিল। ইংরেজীতে ন্যাশনাল আর্মি

বলতে যা বৃক্ষায় ভারতবর্ষের তেমন কোনো সেনাবাহিনী নেই। ভারতে সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে পেশাদার সিপাহীদল থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই সিপাহীদের সংগ্রহ করা হতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। একের পর এক করে কোম্পানী নগর, প্রদেশ ও রাজ্য সংখ্যা করেছে, যারে থায়ে বৃক্ষ করেছে সিপাহীদল, বেতনের আকর্ষণে।

সিপাহী বিশ্বাহের অব্যবহিত পরে কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভাব নিলেন মহারাজী ডিক্টোরিয়া। সেনাবাহিনীও সম্রাজ্ঞীর অধীন হলো। শুরু হলো পঞ্জবর্তন। সিপাহী বিশ্বাহের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করলেন ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ। প্রতি দুটি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন এক ব্রিটিশ বাহিনী, যাতে কোনোদিন কোনো কারণে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটি মাঝ ব্রিটিশ বাহিনী থাকতো। গোলদাঙ্গ বাহিনীতে একটি ভারতীয় নেওয়া হয়নি উনিশ শ খ্রিস্টিশ সাল পর্যন্ত। এই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অফিসার যাকে ভারতীয় থায়া ছিলেন তাদের আঙুলে গোনা যায় এবং থায়া ছিলেন তাদের মধ্যেও কেউ মেজরের উপরে ওঠেনি। সামরিক বিচারে বোধ করি তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের মেজরিটি প্রাপ্তি ঘটেনি।

সবচেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হলো সৈন্যদলের লোক নির্বাচনে। 'সামরিক' ও 'অসামরিক' জাতি, এই ক্রিয় শ্রেণী বিভাগের থারা ভারতীয় বাহিনী থেকে পাঞ্চাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সব দেশের লোককে স্বত্ত্বে দূরে রাখা হয়েছে। অথবা ইতিহাসে থায়ের কিছুমাত্র দখল আছে তারাই জানেন ভারতে ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের এক প্রধান অংশ সম্ভব হয়েছিল বর্তমানে 'অসামরিক' জাতি বলে উপস্থিত বাংলা ও মাঝাজোর সিপাহী সামীদেরই বাহুবলে। বর্তমানে অভ্যন্তর সহজবোধ্য কারণে যে সকল ইংরেজ রাজনৈতিক মুসলিমদের সামরিক ক্রিয় সম্পর্কে সম্ভক্ত প্রশংসন্য গদগদ এবং ইংরেজের অবর্তমানে ভারতে গৃহ-যুক্ত ঘটলে হিন্দুদের অসহায়তা নিয়ে থায়া প্রায় অক্ষ-বর্ণ করেন, সেই ভারতবক্ষেত্রের স্থান করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের কালে থায়া শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং যাদের কাছে ইংরেজ সর্বাধিক প্রতিরোধ পেয়েছে, তারা মারাঠা ও শিখ। এদের প্রথমটির ধর্মস্তুতি অবিভিত্তি হিন্দু, শৈতীয়টি ও হিন্দু ধর্মেরই হিন্দু সংক্ষারণের রূপ। একটিও ইসলাম নয়।

পাঞ্চাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রতি সেনা বিভাগের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কী? কেউ বলেন, উত্তর ভারতের লোকেরা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ও দৈহিক গঠনে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে উন্নত। কিন্তু স্টেটই সামরিক জাতি বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শৰ্থীদের তাহলে কোনকালেই থাকী পরতে হত না। বিশেষ করে সৈন্যদের ক্রিয়ত যে-যুগে তাদের দৈহিক সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করতো, আশ্বেয়ান্ত উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটেছে।

কোনো বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতিপ্রথা সৃষ্টি করা চলে। সামরিক বৃত্তি অনেকাংশে পারিবারিক হয়ে পাঠায়। পুরুষানুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বৎসরপূর্ণ চাকুরির থারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়েমি স্বার্থবোধ জাগে। নিজেকে তারা সে বাহিনীর সঙ্গে বনিষ্ঠ ভাবে জড়িত অংশবিশেষ বলে জ্ঞান করে। ঠিক যেমন করে কলকাতার বড় বড় বিলাতী কোম্পানীগুলির ক্যাশিয়ার, বড়বাবু, বা বেনিয়াদর। বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসনযন্ত্রের প্রতি শাসিতের এই মমতাবোধ সৃষ্টির সার্থকতা সাধারণ নয়।

তার চাইতেও বড় কারণ আছে। সে কারণ রাজনৈতিক। শীকার করতেই হবে যে, কিছুকাল পূর্বেও ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত ছিল রাজনৈতিক চেতনাহীন। সিপাহী বিশ্বাহের সময় পাঞ্চাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ অন্তর্ধানে। আধুনিক কালেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্চাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। গদর দল ও কোমাগাটামারুকে নিয়ে থায়া পাঞ্চাবের দেশপ্রাণতার প্রশংস্তি রচনা করেন তাদের স্থান রাখা

প্রয়োজন যে, সে পাঞ্জাবীরা বিদেশে গিয়েই দেশাঞ্চলবোধের ধারা উত্থুক হয়েছিল, দেশে থাকতে নয়। সাধারণ পাঞ্জাবী সচল জীবনযাত্রা, মোটা মাইনে, অজস্র আহার ও দামী পোষাক পেলেই খুশি থাকে, দেশ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিং-এরা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র।

ভারতীয় সেনা বিভাগে বাঙালীরাই সব চেয়ে বেশী অবাঞ্ছিত। আর্মির মনুসংহিতায় তারা হরিজন। আর্চর্চ নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে শুরু করে তারাই ভারতে ভ্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদ করেছে অবিরত, সংগ্রাম করে আসছে অমিত তেজে। ভারতের আধুনিক জাতীয় জগতের প্রথম উদ্যোগ ঘটেছে এইখানে। জাতীয় যজ্ঞে এখানে মায়ের আঙুতি দিয়েছে পুত্র, মেয়েরা দিয়েছে প্রেরণা, ছেলেরা দিয়েছে প্রাণ। এদের প্রতাব ক্ষুণ্ণ করতে কার্জন করেছে বঙ্গ-ভঙ্গ, হাতিঙ্গ স্থানান্তরিত করেছে রাজধানী, ম্যাকডোন্যান্ড কায়েম করেছে কমিউন্যাল এওয়ার্ড। সর্বনাশ! এদের সেনাদলে নিলে রক্ষা আছে? এইখানে স্বরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল বাংলাদেশেরই এক ছাউনিতে। ব্যারাকপুরে;

‘সামরিক জাতির’ প্রতি এই পক্ষপাত ভ্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে সনেহ নেই। অভাব অভিযাগের ফলে পাছে তাদের ভ্রিটিশ-অনুরক্তি হ্রাস পায় সেজন্য ভ্রিটিশ শাসকেরা এই ‘সামরিক জাতির’ পার্থিব কল্যাণ সাধনে অনেকটা তৎপর হয়েছেন, সে কথাও সত্য। সেনা বিভাগের বেতনের হার ও পেশন সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয়। তা ছাড়া বার্ধক্যে অবসর গ্রহণকালে অনেকে জায়গীরও পেয়েছে।

পাঞ্জাব সেনাবিভাগের সৈন্য ও অংশ যোগায়, তাই পাঞ্জাব সর্বদাই কর্তৃপক্ষের অধিকতর সন্নেহ মনোযোগ লাভ করে এসেছে। কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্যযোগ্য-পরিকল্পনা পাঞ্জাবে হয়েছে বেশী। সমবায় আন্দোলন ও কৃষিবিদ্যার গবেষণা শুরু হয়েছে সেখানে এবং ভারতে ভ্রিটিশ যুগের সর্বাপেক্ষা ক্ষিম্যকর ও ব্যয়বহুল ক্রত্রিম সেচকার্মের নির্দলন আছে পাঞ্জাবে ও সিঙ্গুপ্রদেশে। সেখানে বেশীর ভাগ ঢায়ারাই ক্ষেত্রে ধান, গোয়ালে গরু এবং ঘরে আর্মির মেডেল আছে। সেখানে সাহেবকে বলে হুজুর, দারোগাকে বলে ধর্মাবতার, গভর্নর্মেন্টকে বলে সরকার বাহাদুর। সেখানে স্বারাজের গরজ থাকবে কার?

কিন্তু বনা যখন আসে, তখন তাকে বালির ধীধ দিয়ে ঠেকানো যায় ক'নিন? সমৃদ্ধ যদি ক্যানুটের আদেশ মেনেই চলতো তবে আর ভাবনা ছিল কী? সমস্ত প্রতিষ্ঠেক ও সাবধানতা ব্যর্থ করে দেশাঞ্চলবোধের ধারা ঐগিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—কোথাও কোনো প্রান্তে তার আর বাধা রইল না। পক্ষিম সীমান্তে ধান আন্দুল গফুর ধান এই ভাবগঙ্গার শঙ্গীরাথ!

এই বহু অনুগ্রহীত অঞ্চলের রাজনীতির সম্পর্কবর্জিত সরল অধিবাসীদেরও তাদের স্বদেশ ও প্রজাতির বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এখন আর আগের মতো নিরাপদ নয়। বোধ হয় অনেকেই গুনেন না যে, উনিশ শ শিখ সালে সভ্যাগ্রহ আন্দোলনের কালে একদল হিন্দু গাড়োয়াল সৈন্য পশ্চায়ের মুগ্ধিম মেছেজসেবকদের উপরে গুলীবর্ষণে অস্থীকৃত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল। সে সংবাদ এদেশের ঘবরের কাগজে প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি।

সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে উনিশ শ একচত্ত্বিংশ সাল পর্যন্ত এই সেনাদলের শতকরা ধীয়ত্বিশ ভাগ '৬৩ মুসলমান, টেইশ ভাগ শিখ ও বিয়ালিশ ভাগ হিন্দু। সক্ষয় করার বিষয় এই যে, এ হিসাব ধোকে ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহুপ্রচারিত সামরিক অযোগ্যতার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ধূব সামান্য হলেও ভারতবর্ষের সামরিক নীতির প্রথম পরিবর্তন ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসন্নের পর। একান্তভাবে যুরোপীয় অফিসার পরিচালিত বাহিনীর সামান্য অংশ ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত পর্যাপ্ত হয়। ভারতীয়ের সেনাবিভাগে ক্রিংস কমিশন প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয় এবং ভারতীয় সেনানায়কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেরাদুনে ভারতীয় স্যান্ডহার্ট-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

গৃহ্মান যুক্তে এই ভারতীয়করণ ক্রস্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের প্রতি মমত্ববোধে নাথ। ইংরেজের নিজ প্রয়োজনের তাগিদে। অসামরিক জাতি বলে সেনাবিভাগে ইতিপূর্বে যাদের গান্ধেশের সন্তান মাত্র ছিল না, তারাও এখন অফিসার হতে পারে। অবশ্য এই বাধা অপসারণের

ফলে সেনাবিভাগে বাঙালীর সংখ্যা এখনও খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার বিষয়াস নেই, যদিও বিমানবহরে তাদের সংখ্যা তেমন হতাশজনক নয়। সুদৃষ্ট বৈমানিকরাপে কমেরজন বাঙালী তরঙ্গ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্জন করেছেন।

এতকাল ভারতবর্ষে দেশরক্ষার ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। কম্বুর-ইন-চীফের সবগুলি কামানের মুখ ছিল আফ্রিন্দিরের দিকে। একচক্ষু হরিণের মতো পার্ল হারবার বিধৰ্ণ হওয়ার পরে সেনাপতিয়া প্রথম হৃদয়ক্ষম করলেন, বিপদ ঠিক সে দিক থেকেই উপস্থিত যে দিকে তার সজ্ঞাবনা তারা কঢ়ান্ত করেন।

যুক্ত শাস্ত্র মতে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন নৌবহর। তা নেই। জলপথ সবটাই শক্রের দখলে। ত্রিপিশ ও ভারতীয় যে পেশদার সেনাবাহিনী ভারতে বর্তমান, তা আধুনিক যুদ্ধযোগ্য পুরোপুরি সজ্জিত নয় এবং তাদের ঘাটিগুলি সজ্ঞাবিত রংগক্ষেত্র থেকে বহু শত যোজন দূরে দেশের অপর প্রান্তে।

এই আসম আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আস্ত্ররক্ষার উপায় কী, এ প্রশ্ন সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছে কিনা জানার উপায় নেই। কিন্তু অস্ত্রবুরীহীন যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতামূল্য জনসাধারণের মনে এ জিজ্ঞাসা জেগেছে। অবশ্যে একজন এই প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ করলেন। তার নাম পশ্চিম জওহরলাল নেহরু।

পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন জওহরলাল। কাশ্মীরী পশ্চিমের বশ্যধর তিনি। তার উর্ধ্বর্তন পূর্বপুরুষ রাজকাউল ছিলেন প্রখ্যাতনামা পার্শি ও সংস্কৃতজ্ঞ পশ্চিম, প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু ছিলেন মুঘল দরবারে নামকরা ব্যবহারজীবী। এডভোকেট জনকের সন্তান জওহরলাল নিজেও মিসজীবীরাপেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। দেশরক্ষার আয়োজনে তিনিই সর্বপ্রথম পরিকল্পনা করলেন সর্বসাধারণের অসিচালনার। জনগণের কথা যিনি ভাবেন তাকেই তো আমরা বলি জনগণ-মন-অধিনায়ক।

অন্ত? চাই বৈকি। অবশ্যই চাই। পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যের অন্ত যোগাতে দেশে নতুন কল্কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কলকারখানার বিস্তার প্রয়োজন। সেটা সময়সাপেক্ষ। শত্রু তো তার জন্য অপেক্ষা করবে না। পশ্চিমজী অত্যন্ত নিকটে থেকে গভীরভাবে অনুশব্দনের সুযোগ পেয়েছিলেন স্পেন ও চীনের গণবাহিনীর যুদ্ধসম্ভাব্য ও যুদ্ধরীতি। স্পেনে চারী মজুরদের সমিতি থেকেই গড়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী। তার মধ্যে থেকেই উত্তর হয়েছে একাধিক সেনাপতির যারা প্রথম জীবনে কেউ চালিয়েছে লাসল, কেউ বুনেছে তাত। চীন থেকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার লোক আমার পরিকল্পনা করলেন জওহরলাল।

গতিশীলতা ইংরেজীতে যাকে বলে মোবিলিটি, সেই হলো এই বাহিনীর সর্বাপেক্ষ সুবিধা। রাইফেলের অভাবে হাত বোঝা দিয়ে এর কাজ চলে। সর্বত্র এদের সহযোগিতার জন্য গ্রামবাসীরা হতো ব্যগ্র। স্মৃত্যু অন্ন এবং বিপদে আশ্রয় জোগাতো তারা। দেশপ্রাণতার প্রেরণায় এই বাহিনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতো। যুরোপীয় পরিচালনায় বেতনভুক্ত সৈন্যদলের মতো তারা আদেশ পালনের যত্নমাত্র হতো না!

জনক্ষতি এই যে, কোনো কোনো ত্রিপিশ সেনাধ্যক্ষে এই পরিকল্পনা শুন্ধার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিলাত থেকে মেজর টম উইন্ট্রিহ্যাম ভারতবর্ষে এসে এই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন এমন প্রস্তাবও শোনা গেছে। উইন্ট্রিহ্যাম স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক দলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘটিত ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম নেহেরুর পরিকল্পনা ত্রিপিশ গভর্নর্মেন্ট প্রীতির চাঁধে দেখবেন এ আশা যারা করেছিলেন তারা যাই হোন মানবচরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। তাদের জন্ম উচিত ছিল, ত্রিপিশ প্রস্তাবে সৈন্যসামুজ বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা থাকে না। থাকে পেট্রোল, স্টেশনবারী ও ক্যান্টিন। কল ব্রিটেনিয়া, ব্রিটেনিয়া কলস দি প্রেস্বেস্।

ইল্পরিয়াল হোটেল থেকে ফিরছি স্বস্থানে। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি হঠাৎ ত্রেক করে সশস্ত্রে একটি গাড়ি দাঁড়াল একেবারে ঠিক সামনে। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে

ଆରୋହିତି ବଲିଲେନ, “ତାଇ ତୋ, ଆମାଦେର ବୌଚକା ଯେ ! ଏଥାନେ କୀ କରାଇସ ? ଆଯ ଉଠେ ଆଯ ।”

ବୋଚକା ଆମାର ପିତ୍ର ବା ମାତୃଦୂତ ନାମ ନୟ । ପାରିବାରିକ ସହୋଦନ ଓ ନୟ । କିଶୋର ବୟାସେ ସହପାଠୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅବିକୃତ ଉତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କରାର ଏକଟି ଅଭିଧା ମାତ୍ର । ଲାଟିମେର ଅଧିକାର, ଆମସନ୍ତେର ଅଂଶ ଓ ବିକ୍ରିଟର ବଟ୍ଟନ ନିଯେ ମତଭେଦଜ୍ଞନିତ କଲହେର ପରିଣାମେ ବିକ୍ଷକ୍ତ ପକ୍ଷ ଐ ଶବ୍ଦଟି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିଦ୍ୱାରା ଆମାର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣେର ଢେଟା କରନ୍ତ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣେ ମୟଳକାମ ହେତେ । ମନେ ଆଛେ, ଅନେକଦିନ ଖେଲାର ମାଠେ ବା ଝାଲେ ଐ ନାମଟା ଶୁଣେ ଫ୍ରାନ୍ଧେ ଓ ଅପମାନେ ପ୍ରତିକାର କରେଛି ।

নামটা একেবারে আকস্মিক নয়। তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে।

প্রথমে যেদিন বৃক্ষাবন পঙ্গিরের পাঠশালায় বিদ্যারস্ত, সে দিন দিদিমা একখানা শাস্তিপূরী জড়িপাড় ধূতি ও সিকের জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। পোশাকটা শুরুগহণামী ত্রুক্ষচারী বিদ্যার্থীর চাইতে সদ্য বিবাহাস্তে খণ্ডরালয়ে আগত জামাতা বাবাজীর পক্ষেই অধিকতর উপযোগী ছিল সদেহ নাই। কিন্তু বিপদ দেখা দিল বস্ত্রটি নিয়েই। প্রথমতঃ তার অবস্থান যথাস্থানে রাখা রীতিমতো আয়াসমাধ্য ব্যাপর, তার উপরে স্থজ্ঞে কুশিত লস্ত্রাম কোঁচার প্রাঙ্গভাগ মাধ্যাকর্ষণের ফলে কেবলই নিম্নাভিমুখি হয়ে ভূমিতে লুটিত হয়। এক হাতে প্রেট ও পঙ্গি ইঁকরাতঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয়, অপরহাতে ধূত শিখিলবঙ্গন বসনের প্রাঙ্গভাগ। কোনোরকমে তালপাকানে, অগ্নিলভাগ, দেখতে পেটিলা আকৃতি।

গোসাইদের বাড়ির সিঁড়ু ছিল পাঠশালার সর্বক্ষেপ্তা বথা ছিলো । বয়সে অন্য ছাত্রদের চাইতে অনেক বড় । লেখাপড়ায় বহুস্মিতি । বার দুই ধরে এক ঝালোই আছে । এরই মধ্যে বিড়ি ধরেছে । কাছে এসে অত্যন্ত নিরীহের মতো প্রশ্ন করল, “হাতে খোচকাটি কিসের বাপু, মুড়কির না বাতসার ?”

କ୍ଲାସ ମୁଦ୍ରଣ ସବାଇ ହେସେ ଉଠିଲ । ମେଇ ଥେବେ ଶୁଣ ହଲୋ ବୋଚକା । ଖାତା ନିଯେ, ପେସିଲ ନିଯେ ଝଗଜା ହଲେଇ ବଲେ, ବୋଚକା । ସିଧୁକେ କତ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରେଛି । ଏନ୍ତାର ମାର୍ବେଲ, ରାଶି ରାଶି ଜଳଛବି ଘୂର ଦିଯେଛି । ଆର ଯେନ କୋନଦିନ ନା ବଲେ । ପରମ ପରିତୃପ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ଜିନିସଗୁଲି ପକ୍ଷେଟେ ପୂରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଯେଛେ, “କେପେଛିମ ? ଆର ବଲି କଥନେ ବୋଚକା ? ତୋର ଏ ଲାଲ ପେସିଲଟା କିନ୍ତୁ ଆମାଯ ଦିତେ ହେବେ ।”

କିଶୋର ବାଲକେର ପକ୍ଷେ ମେଦିନ ଐ ଲାଲ ପେଣିଲଟା ଦାନ କରା କରେଣ କବଚକୁଣ୍ଡଳ ଦମେର ଚାଇହେ
କୋନୋ ଅଂଶେ କମ କଠିନ ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ତାତେ ଓ ସ୍ଥିକୃତ ହେଯେଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁନ୍ୟ କରେ ବଲେଛି,
“ଦେଖ ଭାଇ । ଅନ ଛେଲେରା ଯେନ ଆଏ ନା ବଳେ, ସାରଣ କରେ ଦିଯୋ ।”

সিধু পেশিল্টার ডেগায় জিভের লালা লাগিয়ে কাগজে মোটা অঙ্করে নিজের নাম লিখতে
লিখতে অতাস্ত তাছিলোর সঙ্গে মন্তব্য করল, “ই, বলক দেখি সাহস আছে কেন শা—”

সিধুর বিবাহের নিকট বা সুদূর কোনো সজ্ঞাবনাই তখন ছিল না। কিন্তু তার সন্তুষ্পণ পদ্ধতির অল্পনিক সহচরের উপরে না করে কোনো একটা বাক্য সমাপ্ত এবং আরম্ভ করা তার পক্ষে এঠিন ; ঐ বয়সেই ভাষায় তার এমন শব্দসম্ভাব যা এ বয়সেও উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে গভীরপণ নয়।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୃତି ଦାନ ଓ ତା ପାଲନରେ ମଧ୍ୟେ ସାମଙ୍ଗସାଧନ ନିଯେ ସିଧୁର କୋଣେ ଚିନ୍ତା ଛିଲନା । ଏ ବିଷୟେ ତାର ରେକର୍ଡ ପ୍ରାୟ ବ୍ରିଟିଶ ଗର୍ଭନମେଟେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ପରେର ଦିନିକୁ ଝାମେ ପଞ୍ଚିତ ମହାଶ୍ୟରେ ଉପହିତି ସର୍ବେଂ ପିଛନେ ବେଳି ଥିଲେ ପରିଚିତ କଟେର ଚାପା ସ୍ଵରେ ଆଓୟାଇ ଏଲ, ମୌଳ—ଅମନି ପାଦିକ ଥେବେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରେରା ପ୍ଲେଟେର ଆଡାଲେ ମୁଖ ଲୁକିଯେ ହସି ଚାପତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୋ—ହିଁ ହିଁ ହିଁ ହିଁ ।

କାହେ ଏମେ ଦେଖି ସିଖିଲି ବଟେ । ଯଦିଓ ଚନା କୁବ ସହଜ ନଥ । ପରନେ ଲାଇଟ୍ ଥେ ରଙ୍ଗେ ଶାର୍କିନ୍ଦରର ମହାର୍ଷ ସୁତ, ପାଯେ ଦାମୀ ବିଲାତୀ ଭୂତା ଯାର ଚକ୍ରମକ କରିବା ପାଲିଶେ ପ୍ରାୟ ମୁଖ ଦେଖା ଯାଯା । ଦୃଢ଼ି ହାତେ ଗୋଟା ଚାରେକ ଆଣ୍ଟି, ପକେଟେ ପାର୍କିଂ ଫିଲ୍ଟି ଓୟାନ କଲମ ଓ ପେନ୍‌ଲିଲେର ସେଟ, ଯା ଏକମାତ୍ର ଗମରିକନ ସେନାନୟକଦେର କାହିଁ ଛାଡ଼ା ଏବେଳେ ଏଥିଏ ଆବ କେଉଁ ଦେଖିଲି ବଲେଲେଟେ ହୁଁ । ଏଣ୍ଟ କି

সেই সিধু যে পাঁচ বছর আগে পটলডাঙ্গার পাইস হোটেলের নীচের তলায় এক টাকা বাবো আনা ভাড়ায় আর দু'জন শোকের সঙ্গে একটা অক্ষকার কৃত্তিরিতে থাকতো ? কোন তেলের কসের বিল কালেক্টর ছিল, মাইনে আঠারো টাকা । চিবুকের নীচে কালো বড় আঁচিলটা না থাকলে সিধু বলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো ।

“তুই এখানে কেন ? বিলাত থেকে ফিরলি কবে ? বিলে থা করেছিস তো ?” এক সঙ্গে তিনটা প্রশ্ন করল সিধু ।

“সে-সব পরে হবে, তোমার খবর কি বল দেবি ?”

“আমার খবর ভালো । যিলিটারি কন্ট্রাক্ট করছি । হাতে দু'পয়সা আসছে বে ।” সে-কথা বিশ্বে করে বলার প্রয়োজন ছিল না ।

তার কাহিনী যা শোনা গেল, সংক্ষেপে তা এই :—তেলের কলের সেই ঢাকরি ছেড়ে সে অনেক কিছু করেছে । সাবানের ক্যানভাসারি, এক টাকার ইনসিওরেন্সের দালালী, যায় কাগজের প্যাকেট চানচুর বিক্রি পর্যন্ত । কোনোটাই কিছু হয় না । মাসের মধ্যে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না অনেকদিন, এমন অবস্থা । হঠাতে বাধলো ঘৃণ । এরোড্রাম তৈরী করে এমন এক কন্ট্রাক্টরের অধীনে কুলি-তদারকের কাজ নিয়ে চলে গেল আসামের কোন জঙ্গলে । সেখানেই কশাল ফিরল । কিছু হাতে নিয়ে এসে বসল কলকাতায় । প্রথমে ছেট-খাটো জিনিস সাপ্লাই, পরে বড় বড় কন্ট্রাক্ট । এখন দিল্লীতে এসেছে ডিপার্টমেন্টের কোন এক বড় সাহেবকে ধরতে ।

পুরাণো দিল্লীর সুইস হোটেলে তার অঙ্গানা । সেখানে এসে গাড়ি থেকে নেমে নিয়ে গেল তার ঘরে । জিআসা করল, “খাকিস কোথায় ? কুইন্সওয়ে ? আজ্ঞা গাড়ি তোকে নামিয়ে দেবে সেখানে । এই দেখো ড্রাইভার, আভি ঠাহুরো । এ সাবকে কুইন্সওয়ে ছোড়নে পড়েগি ।” কুলির তদারক করে হিন্দীটা রঞ্জ করেছে সিধু মন্দ নয় ।

বাধা দিয়ে বললেম, “না, না, আমার জন্য ভাবনা নেই । আমি বাস নেবো এখান থেকে ।”

“ক্যাপা নাকি ? বাসে যা খাকুনি আর যা ভিড় ! ভদ্রলোকের ওঠা দায় । গাড়ি থাকতে সে দুর্ভোগ কেন ? ভাড়া তো তাকে পুরো দিনের জন্যই দিচ্ছি !”

এতক্ষণে বুঝলেম, গাড়িটা ট্যাক্সি এবং সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে । নয়াদিল্লীর ট্যাক্সিতে মিঠার নেই, তার নম্বরও ‘টি’ দিয়ে আরুপ্ত নয় । না জানলে বুঝবার সাধ্য নেই যে, ভাড়াটো গাড়ি । কিন্তু বিশ্বায়ের অন্ত পাইনে । খাকুনি আর ভিড়ের জন্য সিধুর ন্যায় ভদ্রবাস্তির বাসে ওঠা দায় । মনে আছে, পটলডাঙ্গা থেকে দুপুর ঝোড়ে পায়ে হৈটে একদিন টালিগঞ্জে দেখা করতে এসেছিল এই সিধু । সে খুব দেশী দিনের কথা নয় ।

বয়কে হাঁস্বি হকুম করল সিধু । নিমেখ করলেম । হেমে বলল, “ভাবছিস বুঝি ‘সোলান’ কি-বা ‘মারি’ ? ওসব দেশী মাল হৌবে এমন শৰ্মা নয় সিধুচন্দ্র । চেখেই দেখ না । খাস স্কচ । খাসা । বাবা খাবো তো খাটি জিনিস খাবো, নয়তো নয় ।”

“সে জন্য নয় । কিন্তু স্কচ পাও কোথায় ? বাজারে তো শুনেছি—”

“হ্যা, সাধা বাজারে নেই, কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী ? ভাইরে, সবই টাকার মামলা । অন্ধকানে ফেলো, জিনিস দেবে না কোন শা—”

স্বচক্ষে দেখলাম কথায় এবং কাজে তফাত করে না সিধু । তিন বোতল সোডা কিনে এনে একটা পাঁচ টাকার নোটের অবশিষ্ট ফেরত দিল্লিস বেয়ারা । “ঠিক হ্যায়, লে যাও” বলে অত্যন্ত নিলিপ্ত ঔদাসীন্যে সমস্তটাই বকশিস করল তাকে । লোকটা আভূমিপ্রণত সেলাম করে প্রহ্লান করল ।

সিধু তার বর্তমান দিল্লী আগমনের কারণ ব্যক্ত করল । কলকাতায় ছোট সাহেব নাকি তার নামে শাগিয়েছে অনেক কিছু । এখান থেকে তাই তার ফ্যাক্টরী দেখাতে যাবে কোনো একজন অফিসার । সুতরাং একটু ভাবনায় ফেলেছে ।

ভাবনাটা কিসেন ঠিক বুঝতে পারলেম না । দেখে আসুক না ফ্যাক্টরী, ক্ষতিটা কিসের ? সিধু বিরক্ত হয়ে বললো, “আবে ফ্যাক্টরী থাকলে তো দেখবে ? ফ্যাক্টরীই নেই যে ?” “ফ্যাক্টরী নেই, তবে মাল যোগাচ্ছ কেমন করে ?”

“তুই এখনও সেই বৌচকাই আছিস। বিলাত শুরেও শুকি খলল না এতটুকু! আরে মাল যোগাধার জন্য ফ্যাট্টীরী থাকার দরকার কী? অন্য লোকের ফ্যাট্টীরী নেই? সেখান থেকে তৈরী করিয়ে নিজের লেবেলে চালাতে আটকাবে কোন শা—? ছাপাখানার কিছুটা খরচ আছে! খানকয়েক চালান ফরম, লেটার হেড, রাবার স্ট্যাম্প, ব্যস। অর্ডার কি ফ্যাট্টীরী দেবে হয়? অর্ডার তো হয়” বলে মুখে চোখে এমন একটা ইজিত করল যে, তার অর্ধে কিছুটা স্পষ্ট ও কিছুটা বাপসা হয়ে আমার কাছে একটা প্রহেলিকা সৃষ্টি হলো!

জিজ্ঞাসা করলেম, “মাল যোগাছ এত দিন, এর মধ্যে তোমার ফ্যাট্টীরী আছে কি নেই সে-খোজ হয়নি?”

“হবে না কেন? তিন চার বার ইলপেকশন হয়ে ভালো রিপোর্ট চলে গোছে। এবাবেও কি যেত না? শা—ছোট সায়েব ব্যাটার খাই বেড়েছে এত যে, আর মিটাতে পারছি নে। তাই না এ-কামোডা। যাক, পরোয়া করিন নে। জানতে পারব সবই।”

“কেমন করে?”

“কেন, আপিসের কেরানীরাই খবর দেবে। দেবে না? আরে তাই দেবে কি আর অমনি? সংসারে বিনিয়নসামান্য পরিহতার্থে আর কাজ করে কোন শা—? আশী টাকার কেরানী, একসঙ্গে পাঁচ শ' টাকা দেখেছে এর আগে? খবর তো খবর, দরকার হলে ফাইলকে ফাইল গাপ করিয়ে দেওয়ার দাওয়াই পর্যন্ত জানি। এই যে মধুবাবু, আসুন আসুন। কী খবর? আজ্ঞ এক মিনিট বেস ভাই, ত্রুটি সঙ্গে একটু প্রাইভেট,—চলুন মধুবাবু বারান্দায়।” সদা আগত আগস্তকে নিয়ে বাইরে গেল সিধু।

প্রায় মিনিট কৃতি পরে ফিরে এসে বলল,—“মোটা হাতে কিছু চালতে হবে দেখছি। যাক পরে শুধিয়ে নেবো।”

বিশ্বিত হওয়ার পাশা শেষ হয়ে গোছে অনেকক্ষণ আগেই। শুধু জিজ্ঞাসা করলেম, “আজ্ঞ এসব কি শেষ পর্যন্ত চাপা ধাকে? ডিপার্টমেন্টের অন্য লোকেরা কি জানতে পারে না?”

“কেমন করে জানবে? এই যে এসেছিলেন ভদ্রলোক, খবর দিয়ে গেলেন কোন সায়েব যাচ্ছে এখান থেকে তদন্ত করতে, কবে যাচ্ছে ইত্তাদি। আপিসে ব্যখন ঘোষণা তখন উনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন, না কিছু? এমন ভাব দেখাবেন যে, জীবনে এর আগে কখনও আমাকে চোখেও দেখেননি। ব্যস, তা হলেই হলো। সব কাজেরই সিস্টেম আছে তো?”

একজন বেয়ারা গোটা দুই বিবাট প্যাকেট নিয়ে এসে বলল, “ফেরস্ কোম্পানি পাঠিয়েছে।” সিধু বললে, “ঠিক হ্যায়। কাল দোকানে সওনা করেছি কিছু। তাই পাঠিয়েছে। দেখ তো ক্ষিনিসগুলি। তোমা যতান্ত টেস্টের লোক, আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের খবর রাখিস। হ্যা, সার্ট। এক ডজন। ছাবিশ টাকা পনেরো আনা করে একটা। ওদের সেই পনেরো আনার কায়দা জানিস কো? পুরা সাতাশ টাকা লিখবে, না কিছুভেই। রুমাল! হ্যা, পিরামিড। ডজন সতৰ টাকা। পাওয়া যে যাচ্ছে এই দের, সতৰ হলেই কী, আশী হলেই কী? এটাকে কী বলে রে? দেখছি আজকাল এমেরিকান সাহেবরা পরে খুব। ডার্কিন? ডার্কিন নয়? তবে কী? জার্সিন? বাণীয় যে আকার তো? দোকানে তো আর জিনিসের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি নে। ভাববে কী? কিলোম তো, কখন পরবো সে পরে দেখা যাবে। দাম দেশী নয়। দুশ আশী টাকা। চামড়াটা ভালো কোয়ালিটি।” বিল দেখলাম আরও ঝুঁটিমাটি অনেক কিছু মিলিয়ে সাত শ' টাকার উপরে। সায়েব তার ওয়ালেট খুলে দু'খানা পাঁচ শ' টাকার নেটে বেয়ারার হাতে দিল দাম চুকিয়ে গিয়ে।

চুপ করে শ্বরণ করতে চেষ্টা করলেম, এর আগে ঠিক কখন সিধুর গায়ে তালিহীন জামা দেখেছি।

ঢুঢ়ে আদর আপ্যায়ন করল সিধু। বাল্যবസ্তুর প্রতি তার এই সহস্রয়তা দেখে মুঝ হওয়া ঢুঢ়ে। তার চালচলন দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমাকে দশ বছর মাইনে-করা কর্মচারী করে জাঁপাই মঞ্জু অর্ধে আছে তার ব্যাকে। কিন্তু কর্মচারীর বদলে অংশীদার করতে চাইল। বললে,

“আরে ব্যারিস্টার হবি যখন হবি । এখন খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে আর ক'টকা আসবে ? তার চেয়ে আমার সঙ্গে জুটে যা, নেহাত মন্দ হবে না । আমারও সুবিধে হবে, চিঠিপত্র লেখা, সামৰ-সুবোৰ সঙ্গে কথাবাৰ্তা বলা তো আমার আসে না !”

হেসে বললেম, “তার দৱকার কী ? তুমি যা বলছ তাতে কন্ট্রাষ্ট পেতে ওসবেৰ যে কিছু দৱকার আছে তা তো মনে হয় না । তোমার হয়ে তোমার টাকাই কথাবাৰ্তা কইবে ?”

“নেহাত মিথ্যে বলিসনি । যে-পূজাৰ যে-বিধি তা না হলৈ কিছুই হয় না । তবে হ্যাঁ, ইংৰেজী বলতে কইতে পাৱে, লিখতে পাৱে এমন লোক থাকলৈ আৱেও সুবিধে । তোকে শেষে আমি এখন যা পাছি তার ডবল আয় কৰতে পাৱি । বলেছিলাম নিত্যানন্দকে । মনে নেই তাকে ? সেই যে পুৰুত ঠাকুৰেৰ ছেলে নিতাই রে । পাঠশালায় একদিন তাৰ পৈতৈ ছিড়ে দিয়েছিলাম । আৱ কথা কইতে পাৱে না । কেবলই হাত দিয়ে ইশৰা কৰে ভৱব দেয় । শেষে পন্ডিতমাদেৱ কাজ থেকে পৈতৈ ধাৰ কৰে কথা বলল । নালিশেৰ ফলে শাস্তি প্লেম দ'ঘণ্টা দুই কানে ধৰে বেঞ্চিৰ উপৰে দাঙিয়ে থাকা । সেই নিত্যানন্দ এখন ডেপুটি হয়েছে । মাঝে ক'দিন সাপ্লাইৰ কাজে ছিল । রাস্তা বাতলে দিলেম, কী কৰলে দু'পয়সা হবে । বলে কিনা, ‘সিধু, ছেলেবেলায় ইস্কুলে অনেকে অকাজ কুকাজ কৱেছিস, বড় হয়ে এখন আৱ কৱিস নে ।’ শোন কথা একবাৰ ! টাকা উপায় কৰতে আমি কৰছি ঠিকাদৰী, তুই কৰছিস চাকৰি । যাতে দু'পয়সা উপৰি আসে তাৰ চেষ্টা কৰব, তাতে কুকাজটা কোনখানে ? হৱিনাম জপতে তুইও আসিসনি, আমিও বসিনি ।”

যাক, তবু ভালো । সংসারে তাহলে দু'একটা লোক এখনও আছে যাৱা ব্যক্তেৰ পাশ বইৰ উপৰে দৃষ্টি রাখাটাই জীবনেৰ চৰম মোক্ষ মনে কৰে না ।

সিধু বলল, “হ্যাঁ লাভটা কি হচ্ছে ? ওৱা সঙ্গে কাজ কৰতো আৱ এক অফিসাৰ, সে সেৱক রোডে বাড়ি কিনেছে দু'খানা, গাড়ি কিনেছে । তাৰ বউ-এৰ গায়ে হীৱাৰ গয়না । আৱ আমাদেৱ নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ পৰমহংস হয়ে বসে আছেন । বাদুড়-খোলা হয়ে ছামে চেপে আপিসে যাবো যোাহেল মো঳াৰ সুট পাৱে । আহাম্বুক এক নৰ্বৱেৱেৰ !”

তাতে আৱ সন্দেহ কি !

জিজ্ঞাসা কৰলেম, “আছা ভাই, যুদ্ধেৰ বাজাৰে কি অনেস্টি বলতে কোথাও কিছু আৱ অবশিষ্ট নেই ?”

“অনেস্টি ? তাৰ মানে সততা ? ভায়া হৈ, ওসব ভালো ভালো কথা যা আমৱা ছেলেবেলায় কপিবুকে লিখেছি—না, লিখেছি বলা ঠিক নয় ; আমি তো লেখাপড়াৰ ধাৰ ধাৰতেম না, কেবল মাস্টারেৰ বেতই খেয়েছি—তোৱা লিখেছিস, ওসব ছাপৰ বইতে থাকে,—ছেলেবেলায় মুখৰ কৰতে মন্দ লাগে না । কিন্তু সংসারে ওসব ফালতু । এই বুকে হাত দিয়ে বলছি বৌচকা, জানিবি, এমন লোকই নেই যাকে কেনা যায় না । দামেৰ কম বেশী নিয়ে কথা । কেৱালীবাবুকে দিতে হয় দশ, বড়বাবুকে পঁচিশ, সুপারিটেন্ডেণ্টকে পঞ্চাশ, ইলগেষ্ট্ৰকে এক শ' । যত বেশী মাইনেৰ অফিসাৰ, তত বেশী তাৰ দক্ষিণ । টাকায় না হয় এমন কাজ নেই । তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো সোজাসুজি টাকাটা নিতে ভয় পায় । তাদেৱ বেলায় বিলাতী হলে পাঠাৰে এক কেস ‘হোয়াইট লেবেল,’ দেশী হলে যেয়েৰ বিয়েতে দেবে বেনারসী শাড়ি ।”

সিধুচন্দ্ৰেৰ ওখানে ডিনাৰ খেয়ে তাৰই ভাড়া কৰা ট্যাঙ্কি চেপে বাড়ি ফিৰলেম অনেক রাত্রে । অনেকগুলি সিগাৱেট ভাৱে দিয়েছিল আমাৰ সিগাৱেট কেসে । ‘ব্ল্যাক আ্যাশ হোয়াইট !’ শাদা আৱ কালো । শাদা বাজাৰে তাৰ দৰ্শন এখন দুৰ্ভুত ! কিন্তু কালো বাজাৰে অভাৱ কী ? দেশে অভাৱ কী সিধুচন্দ্ৰেৰ ?

এগারো

শান্তকাৰেৱা বলেছেন, রাজদৰ্শনে পুণ্যলাভ । অমাত্যদৰ্শনেও পুণ্য আছে কিনা জানিনে । বোধ হয় আছে । নইলে এঞ্জিনিউটিভ কাউন্সিলদেৱ বাড়িতে প্ৰত্যহ ভিড় জমে কেন । ভিড় জনতাৰ নয়, আই-সি-এস-এৱ ।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের সুদৃশ্য বাংলোর সম্মুখে তৃণাঞ্চান্দিৎ বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অপরাহ্ন গৃহবাসী বসেন বিশ্রামালাপে। হাতের কাছে ছোট টিপাইর উপরে টেলিফোন, সুনীর্ধ তারের সাহায্যে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কক্ষে প্লাগ পমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সুইচ আছে। কে কথা বলেন এবং কি কথা বলেন তার গুরুত্ব বিচার করে সেক্রেটারী সুইচের দ্বারা মনিবের টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করেন। খান দশ বারো চেয়ার। বেতের। সবুজ রঙের ভালপ্পার এমামেলে প্রে-পেইন্ট করা। বাগানে কাঠের চেয়ার ব্যবহার আভিজ্ঞাত্বের চিহ্ন নয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ সমষ্টিত সৌরমণ্ডলের ন্যায় আই.সি.-এস.-পরিবৃত্ত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য সভাতল। অমাত্তের প্রাত্যাহিক আসর। সে আসর গুণজনের নয়, ধৈর্যজনের।

পরিধানে শাদা শাটিন ভিনের ট্রাউজার্স ও হাতকটা হাফসুট। টাই নেই, কোটও না। ন্যামিলীতে শ্রীমতাকালে ঐটৈই রীতি। আপিস থেকে ডিনার পর্যন্ত ঐ পোশাকই সর্বজনগ্রাহ্য। ধীরা নয়সে তরুণ, তারা সার্টের বদলে পরেন স্পোর্ট সার্ট। সেটা আরও বেশী শ্বার্ট। মোজাহিন চরণে শাদা কার্বুলী চপ্পল। আমিতে খাকীর মতো সিভিলিয়নদেরও মুনিফর্ম আছে। সে মুনিফর্ম সিখিত অনুশাসনের নয়, অলিখিত ফ্যাশনের। ঠিক যেমন বিয়ের বরবাতীদের গিলে-কোচানো ধূতি আর সোনার বোতামওয়ালা পাঞ্জাবি। মাঝাজী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিঙ্গী,—সব আই.সি.-এস.-এরই এক বেশ, এক ভাব। বলা বাহ্য, দুটোর একটাও তাদের স্বজাতীয় নয়।

যে-বস্তুকে কানুনী করে এই সভার্গবে প্রবেশ করা গেল তিনি গভর্নমেন্টের একজন পদস্থ অফিসার। প্রৌঢ়, অপস্থীক এবং অত্যন্ত সদাশয়। বহুপরিচিত ব্যক্তি। এমন গৃহ অঞ্চল যেখানে তার গতি নেই, এমন গৃহিণী অল্পতর যার ডিনার পার্টিতে তার নিমজ্জন নেই।

পুরুষ মাত্রেই বউ না থাকলে বাতিক থাকে। কারো তাস, কারো থিসেটার, কারো দেশোকার, আর কারো ব, সাহিত্য কিংবা স্বামীজি। এ-ভদ্রলোকের বাতিক পোশাকের। সবচেয়ে ভালো পোশাকের সাহেব—বেস্ট ড্রেসড ম্যান—বলে নয়দিলীতে তাঁর পরিচিতি। গুরু আছে যে চার দিনের জন্য একবার হাঁচাঁ তাঁকে ট্যারে যেতে হয়। তাড়াতাড়িতে জামাকাপড় বেশী সঙ্গে মেওয়ার অবকাশ না পাওয়াতে মাত্র দুটো ওয়ার্টার্ব ট্রাঙ্ক ও একটা সুটকেশ নিলেই নকি তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেগুলির গর্ভে শুধু গোটা পনেরো দুটি, দেড় ডজন সার্ট, দশটা টাই ও কুর্তিখানা ক্ষমাল ছিল। ভাজভাঙ্গা সার্ট বা কুজাহীন প্যান্ট পরতে দেখেনি তাঁকে কেউ কোনোদিন। সকলবেলা গয়লা, খবরের কাগজওয়ালার মতই তাঁর বাড়িতে প্রত্যহ নিয়মিত ধোবা আসে গালিশের ওয়াড, বিছানার চাদর, স্ট্রিপিং সূর্ত ও জামা কাপড় প্রেস করে দিতে বকুলা ঠাণ্ডা করে পুরামূর্শ দেন, আপিসে একটা ইলেকট্রিক আয়রন রাখতে—বড় সাহেবের ঘরে চুক্বার আগে একবার তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা ইস্তির করে নিতে পারবেন।

জ্যামাকাপড়ের প্রতি ভদ্রলোকের মনোযোগ আছে, কিন্তু আসন্তি নেই। সুদৃশ্য টাই, মনোরম শাফলার অক্ষতয়ে দান করেন আপন রক্ষুদের। গৃহে সর্বদা আতিথের অক্ষণ আয়োজন। এমন অশায়িক প্রকৃতির লোক বেশী চোখে পড়ে না।

ইনি হচ্ছেন সেই স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়দের অন্যতম ধাঁচের সাহেব সম্পর্কে কোন দুর্বলতা পেট। একবার বয়ের পথে মাঝ রাত্তিতে এক স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কার্যরায় এক সাহেবের দরজা-জানালা বজ্জ করে নিম্না দিছিলেন। হাঁকাহাঁকিতে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ঘার খুলে দেখলেন কালা আদমী। ‘ভাগো’ বলে শশকে ঘার কুক করলেন। কিন্তু এ কালা আদমীটি অন্য জাতের। সাহেবে দেখেই পুলাদপ্সরণের পাত্র নন। স্টেশন মাস্টার এসে অন্য গাঁথাঁতে তাঁর জায়গা করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নাহোড়বাল্পা। সাহেবে তো গোটা কামরাটা রিজার্ভ করেনি, সূতরাং এই কামরাটাই তাঁর যাওয়া চাই।

এতে সাহেবের ধৈর্যসূচি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। একটা নেটিভের স্পর্ধা মেখ একবার। না হয় টাকা আছে, ফাস্ট ক্লাসের টিকিটই কিনেছে। কিন্তু তা বলে একেবারে একজন খাস বিলাসী জাতোদের সঙ্গে এক কামরায়! মাই গড়, ইত্যিয়ার হলো কী? সেই আধ ন্যাংটা নেংটি ইদুর

গ্যাণ্ডীটা কি দিল্লীতে ভাইসরয় হয়েছে ? উইলিংডন কি নেই ? সাহেব তার চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ির দরজা কর্তৃ দাঢ়িয়ে বললেন, “দেখছ চাবুক ?”

ভদ্রলোক তার পকেট থেকে রিভলবার বের করে বললেন, “দেখছ পিস্টল ?”

সাহেব মিনিটখানেক হাঁ করে তাকিয়ে রাইলেন্স তার পানে, তার পরে আন্তে আন্তে দোর খুলে দিয়ে নিজের বার্দে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এ-জাতের লোকদেরই সাহেবো পুলিশের কর্তা হয়ে লাঠিপেটা করেন, হাকিম হয়ে পাঠ্ন জেলে, কিন্তু মনে মনে করেন গভীর শুক্ষা। এদেরই জন্য বিদেশে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারা যায় অকৃষ্টিত চিঠে।

আর্মির এক কর্নেল কিছুকাল এই ভদ্রলোকের উপরওয়ালা ছিলেন। পাঞ্চাবী হাবিলদার ও সিপাহীদের ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছুল পাকিয়েছেন। জানেন ভারতীয়দের দিয়ে কাজ করাবার এই একমাত্র উপায়। সে-উপায় প্রয়োগ করলেন একদিন এর উপরে। ভদ্রলোক অভ্যন্তর ধীর ও শান্ত হয়ে বললেন, “কর্নেল, একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলার বীরতি এটা নয়। মনে রেখো, তুমি চোখ রাঙালে আমিও পাল্টে চোখ রাঙাতে পারি—ইফ ইউ সাউট লাইক দ্যাট, আই ক্যান সাউট ব্যাক্টু !”

শুনেছি এই কর্নেলই পরে একে নিজের বাড়িতে ডিনার খাইয়েছেন বহুদিন। অসুখ হলে নিজে বাড়ি এসে আরোগ্য কামনা জানিয়েছেন এবং নিলিয়ার করার কালে প্রমোশন সুপারিশ করেছেন উচ্চস্থিত প্রশংসন !

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সাঙ্গ সভায় আলোচনার মধ্যপথে রঞ্জস্থলে প্রবেশ করলেম আমরা দূজনে। বছুর সহায়তায় যথারীতি পরিচিত হলেম গৃহস্থায়ী ও উপর্যুক্ত পারিষদবর্গের সঙ্গে। সুন্দর শাশে সুস্থানু পানীয় পরিবেশন করল উদি পরিহিত বেয়ারা। রাপার সিগারেট বাক্স থেকে সিগারেট। গৃহস্থায়ী নিজে বিবাহীন ধূমপারী, ইঁরেজীতে যাকে বলে চেইন-স্যোকার। একটা নিঃশেষ হতেই বাক্স থেকে আর একটা তুলে নিয়ে ঠোটে চাপেন। কে আগে তাতে দেশলাই ছেল অপি সংযোগ করতে পারেন, তাই নিয়ে কাঢ়াকাঢ়ি।

বিলাতপ্রত্যাগতদের একটা বিশেষ পর্যাপ্ত আছে এ দেশে। তার উপর বিলাতী সংবাদপত্রের সঙ্গে সংপর্ক হলে তো কথাই নেই। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য মহোদয় অমায়িক আচরণ ও অজ্ঞ ধন্যবাদের ধারা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন।

খণ্ডিত আলোচনার স্তুতি অনুসরণ করে বোৰা গেল, বিবরাটি নয়াদিল্লীর শ্রীমাধিক ঘটিত। জগজ্ঞাধুদেবের বথ্যাতার ন্যায় ভারত গভর্নমেন্টের ও বার্ষিক শৈলেয়াজা আছে। এপ্রিলের গোড়াতে দম্পত্র স্থানাঞ্চলিত হয় সিমলা পাহাড়ে। শরৎকালে উটোরথে প্রত্যাবৃত্ত হয় দিল্লীতে। বছরে দু'বার করে সিমলার কার্ট রোড আর নয়াদিল্লীর পাহাড়গুলোর পথে গুরু শাড়ি বোঝাই বাক্স পেটোরা লটবহরের মিছিল দেখা যায়। এই প্রথম শৈলবিহার হৃস্তি হয়েছে সরকারী হকুমে।

নবনিযুক্ত অস্থায়ী সেনাপতি জেনারেল মোলসওয়ার্থ দাবি করেছেন, এবার সিমলা শাওয়া চলবে না। গরমে জাপানীদের সঙ্গে সৈন্যরা বর্মার বনে জঙ্গলে লড়তে পারে, আর সেক্রেটারিয়েটের সিভিলিয়ন সাহেবো একটু গরমও সইতে পারবেন না ? এত বাবুগান্য মুক্ত জেতা যায় না।

আর্মির প্রয়োজনের উপরে কথা নেই। সুতৰাঁ সেইটোই শিরোধাৰ্ঘ করতে হয়েছে নিতান্ত অনিষ্টকৃত চিঠে। সেক্রেটারী সারকেবেয়া বিচলিত—উঃ বাবা মার্টের শ্বেত যা গরম, মে-জুনে না জানি কষ্টই বেশী হবে !

ডেপুটি সেক্রেটারীয়া বেশীর ভাগই ভারতীয়। কাজেই তারা এক ধাপ উপরে উঠে গলেন, “বেশী ? মে-জুন মাসে মেডিক্যুল লীভ নিয়ে পালাতে হবে !”

তাদের ক্ষীরা আরও সাংঘাতিক। শ্বাসীয়ার আপিসে চলে গেলে দুপুর বেলা পরম্পরের মধ্যে বলাবলি করলেন, “শুনেছ ভাই, নৃতন কমাভাব ইন-চীফের কীতি ? গরমে নাকি এবার দিল্লী থাকতে হবে। মাই শুনেন্সে। তার চেয়ে চল আমরা মেয়েরাই না হয় সিঃ নাতে গিয়ে মেস করে থাকি, ওয়া থাকুন দিল্লীতে গরমে সেক্ষ হয়ে মরতে !”

এঙ্গিকিউটিভ কাউন্সিলর জিজ্ঞাসা করলেন, “গরম কি এখানে খুব বেশী হয় ?”
একজন অমনি বললেন, “তয়ানক ! থাকতেই পারবেন না এখানে !”

আর একজন বললেন, “গরমে গায়ে কোকার মতো হয় অনেকের !”

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, “এপিল থেকেই তো শু চলবে !” ‘শু’ মনে গরম হাওয়ার ঝড়।

এঙ্গিকিউটিভ কাউন্সিলর বললেন, “তা দেখুন, সেক্রেটারিমেটের ঘরগুলি সবই এয়ার কন্সিস্ট। দুপুরবেলা সেখানেই থাকব। এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বোধ হয়।”

চতুর্থ জন, যিনি একজন কিছু বলার সুবিধা না পেয়ে অস্বীকৃত বোধ করছিলেন, তৎক্ষণাত সামনে দিয়ে বললেন, “তা নিচ্ছয়ই যাবে। গরমে কি আর দিল্লীতে লোক থাকে না ?”

এঙ্গিকিউটিভ কাউন্সিলর তার সিকে তাকিয়ে বললেন, “আর রাত্রিতে তো শু বইবে না !”

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, “যা বলেছেন সার, মাত্রিশুলি সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে। তা ছাড়া এইচ-এমদের বাংলোতে একটা করে ঘর এয়ার কন্সিস্ট করে দেওয়া হবে। এমন কিছু কষ্ট হবে না !”

‘এইচ-এম’ মানে—অনাবেল মেস্বর বা মিনিস্টার। এঙ্গিকিউটিভ কাউন্সিলরদের ঐ সংক্ষিপ্ত নামেই উচ্চারণ করা হয় সরকারী মহলে।

প্রথম বক্তা, যিনি গরমের আতিশয় নিয়ে এককণ বাগবিস্তার করছিলেন, অত্যন্ত স্থূল হলেন। চতুর্থ ব্যক্তিমূলক থারাই বলা উচিত ছিল। না বলতে পারায় মনে ‘স্ট্রি অনলোচনা ঘটল।’ চতুর্থ ব্যক্তি বলেছেন বলে, তার উপরে রাতিমতো কুকু হলেন। মনে মনে বললেন, কেবল খোশামূলি। এইচ-এম. মেই বলেছেন, গরম এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, অমনি একেবারে প্রমাণ করার চেষ্টা যেন গরমটা কিছুই নয়। হ্যাম্বাগ কোথাকার ! তিনি জানি এইচ-এম. দিল্লী থাকা অপছন্দ করলে উনি তখন উল্টো সুর গাইতেন। লোকটা যে একেবারে মোসাহেব প্রকৃতির এবং তিনি নিজে যে কোনো কালেই এমন নির্মজ্জ চাঁচুকারিত করতে পারতেন না, এ বিষয়ে মনে মনে নিজেকে আশাস দিয়ে অনেকটা আরাম বোধ করলেন।

গরম থেকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এইচ-এম. তরু করলেন সরকারী কাজকর্মের কথা। কাউন্সিলের কাহিনী। কী ভাবে ইরেজ সহকারীদের ভিত্তিপ স্বার্থ বক্তার প্রয়াস তার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রথম দুর্দান্তির ফলে কোথায় কখন গভর্নমেন্টে দেশের স্বার্থ সপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তারাই সালঙ্কার বর্ণনা।

দেখা গেল, এবিষয়ে শ্রোতাদের কাছে অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি না বলতেই তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এইচ-এম. না থাকলে অভাগিনী ভারতমাতার যে কী দারকণ দৃঢ়তি ঘটতো সে কথা কলানা করে দু-একজন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। প্রায় অঙ্গ-বরিষণের উদ্যোগ।

কান ঢানলেই মাথা আসে। দেশের কথা তুলতেই কঠেস। এইচ-এম. কঠেস নেতৃত্বদের নিষ্পত্তি মীরিত তীব্র নিদ্রা করে বললেন, “শুধু জেলে গেলেই দেশ আধীন হয় না।” কী করে হয় তা স্পষ্টিত: না বললেও সংশ্লেষণ অবকাশ রইল না যে, এঙ্গিকিউটিভ কাউন্সিলরদের প্রচেষ্টা থারাই তা হয়। এবিষয়েও পারিষদ দলের মধ্যে বিস্ময়ান্ত মতোবিধ নেই।

এইচ-এম. বললেন তিনি এত ভাবনা চিন্তার ধার ধারেন না, মুহূর্তে মন ছিঁড়ে করেন। অমনি অনুমোদন শুনলেন, “সার, ভাবনা চিন্তা দেশে অনেক হয়েছে, এখন বাঁশিয়ে পঢ়াই দরকার।”

এইচ-এম. সংশ্লেখন করলেন, “অবশ্য আগে ভাগে না ভেবেচিতে হঠাতে একটা কিছু করে বসাও আবার ঠিক নয় !”

“তাতে আর সঙ্গেই কী সার, না ভেবে কাজ করার নাম তো হঠকারিতা,” এইই ব্যক্তি বলেন অচান বদনে।

পরবর্তী সপ্তাহে এক ভিনারের নিমজ্জন বীকারাত্তে এইচ-এমকে কিলায়-সঞ্চালণ পূর্বক নিঙ্কাট হলেম পথে। সঙ্গী ভদ্রলোক জানলেন তার এক বুকু নাকি চমৎকার চাঁচাতুর্যপূর্যায় এই পারিষদদলের নব নামকরণ করেছেন ‘হৈ হৈ সংব’। নামটা সার্থক সঙ্গেই নেই।

আসল কথাটা বোঝা কঠিন নয়। এরা আই. সি. এস। দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে স্বর্গীভূত চাকরে-হেভেনবর্ন সার্ভিস। সিজার পাঁচীর সঙ্গীদের মধ্যে এদের যোগ্যতা প্রশ্নের অঙ্গীত। ভবিষ্যৎ অবারিত এবং ক্ষমতা সীমাহীন। এরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাই আজ যিনি বিহারের অধ্যাত মহকুমার এ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর, কাল তিনি কর্মাচি পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান, পরবর্ত তিনি কন্ট্রোলার অব ব্রডকাস্টিং, পরদিন ডিভেল্ও-জেনারেল অব আর্কিওলজি এবং তার পরের পরদিন গভর্নর্মেন্টের এ্যাপ্রিকালচারেল কমিশনার। তারা জানেন, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরকে খুশি রাখতে পারলেন পদোন্নতি দ্রুত হয়। তাই কেউ সংক্রান্ত এমস এইচ. এমকে নিয়ে যান সিনেমায়, কেউ নিম্নজন করেন ডিভারে, কেউ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়ে প্রত্যেক কথায় করেন হৈ হৈ, হৈ হৈ। ‘হৈ হৈ সংঘের’ সদসা হতে ঢাদা দিতে হয় না, শুধু যথাস্থানে হাজিরা দিতে হয়।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভারতে ভ্রিটিশ শাসনের অপূর্ব সৃষ্টি। এর মোট সংখ্যা এগারো শ'র কাছাকাছি, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতীয়। পরাধীন জাতির মধ্যে থেকেই সামাজিকবাদের সমর্থক সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই সার্ভিস। শ্বীত বেতন এবং লোভনীয় পেশদের আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আকৃষ্ট করেন ভ্রিটিশ গভর্নর্মেন্ট। তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বোন্মত নির্দর্শন বেছে নিয়ে নিয়োজিত করেন শাসনকার্যে, যে-শাসন দেশের দাসত্বকে করে দৃঢ়মূল ; দারিদ্র্যকে করে ক্রমবর্ধমান এবং জাতীয় আন্দোলনকে করে বিমুক্তুল।

অসাধারণ মোহ আছে ইংরেজী বর্গমালার তিনটি অঙ্গে—। I. C. S. নামের পিছনে তাদের অবস্থিতি দ্বারা সাহেব হলে বোঝায় যে, লোকটা পাবলিক স্কুলের ছাত্র, অঙ্গফোর্ড কিংবা কেমিঞ্জের পাশ এবং কঠিন কম্পিউটিভ পরীক্ষার উঙ্গীর্ণ। একটি ভারতীয় ভাষা শিখেছে, ওডারসিজ এলাইমেল পায়, চাকরি শুরু করেছে এ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর রাপে এবং শেষ করবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা প্রাদেশিক গভর্নর হয়ে। পাঁচ শ'র টাকায় আরম্ভ, হয় কিংবা আট হাজারের শেষ। শাট বছর বয়সে এক হাজার পাউডেন পেশন নিয়ে ইংলণ্ড বা রিভেয়ারাতে বাড়ি, নিচিন্ত অবসর এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রবল বিত্তক্ষা।

ভারতীয় হলে বোঝাবে,—উচ্চ বৎশ, কলেজে ভালো ফল, পুলিশের সদ্দেহাত্তীত, সদ্দেশীর স্পর্শেশশূন্য নিষ্কলঙ্ঘ ছাত্রজীবন, বিলাতের প্রতি ভক্ষি এবং চাকরিতে বিচার বিভাগের বদলে এক্সিকিউটিভ বিভাগে কায়েমার জন্য আপ্রাণ ঢেঁটা। এদের জন্য বারোয়ারি পূজার মন্দপে চেয়ারের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিভূতি সভার সভাপতিত্ব, মাসিক পত্রিকায় অপার্য গল্প চতনার সুযোগ এবং অন্যত্ব বয়স্থ কন্যার উত্তিপ্রা জননীয় আকুলি বিকুলি।

চলতি কথায় এদের বলা হয় ভারতে ভ্রিটিশ শাসনের কাঠামো। স্টালিনফ্রেম। এদের মধ্যে এমন চু'চার জন লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন ধীরা পাণ্ডিতে, প্রতিভায় ও কর্মশক্তিতে যে কোনো ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান গ্রহণের অধিকারী। তারা আবেদনের অনুবাদ করেছেন, ভ্রিটিশ ভারতের অধিনাতি আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেছেন, সার্ধক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সমবায় আলোচন প্রকরণ করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের গোড়াপ্রস্তুত করেছেন! জাতীয়তাবাদের শুরু সুরেন্দ্রনাথ, ঘৰি অববিল এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র এই সিভিল সার্ভিসের অঙ্গীভূত হয়ে বা হতে হতে ছিটকে পড়েছিলেন।

কিন্ত ব্যক্তিমূলের দ্বারাই তো নিয়মের প্রমাণ হয়। বেশীর ভাগ আই. সি. এস-ই নিতান্ত সাধারণ, ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিওকর। তারা লেখার মধ্যে লেখেন ফাইল, পড়ার মধ্যে পড়েন গেজেট এবং আলোচনা করেন ফার্লো, প্রোশেন বা রিটয়ারমেন্ট। অন্তিমে নিজের জন্য নাইটহড, স্ট্রীর জন্য বুইক গাড়ি ও ছেলের জন্য ইলিপরিয়াল সার্ভিস তাদের চরম উচ্চাভিলাষ।

ইংরেজীতে বলে, কামানের চাইতে সোনার দাম কম। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিতদের অসমৃষ্ট ঠিকিয়ে রাখবার অমোহ অস্ত্র, তাদের শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করা। সে-তথ্য জানা আছে ইংরেজের। এগারো শ'র আই. সি. এসের জন্য ভারতের রাজস্ব থেকে খরচ হয় বছরে আড়াই কোটি টাকা। প্রতি আড়াই লক্ষ ভারতীয়ের মাথার উপরে আছে একজন আই. সি. এস. প্রতি

୮୬୮ ବର୍ଗ ମାଇଲ ଏଲାକାର ଆଧିପତ୍ରେ । ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ପରିବେଶର ଫଳେ ଏକଟି ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀତ ପରିଣତ ହନ ତାରା । ଦେଶର ଦାୟ, ବିମୁକ୍ତ, ଦଶେର ଥେବେ ବିମୁକ୍ତ । ଆଇ. ସି. ଏସ. ଏକଟା ପେଶା ନୟ; ଆଇ. ସି. ଏସ. ଏକଟା ଜ୍ଞାତ । ହୋଲି ରୋମ୍ୟାନ ଏମ୍ପାଯାର ଯେମନ ନା ଛିଲ ହୋଲି, ନା ଛିଲ ରୋମ୍ୟାନ ଏବଂ ବଜା ନା ଯାଯ ଏମ୍ପାଯାର ; ଇନ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସାର୍ଟିସ ତେମନି ଇନ୍ଡିଆନ ନୟ, ସିଭିଲ ତୋ ନୟଇ ଏବଂ ସାର୍ଟିସର ବାପ ମାତ୍ର ନେଇ ତାତେ ।

ବାରୋ

ସାର ସ୍ଟ୍ୟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିଭ୍ୟାଗ କରଲେନ ।

ଆଗେର ଦିନ ସଜ୍ଜାଯ ଦିଲ୍ଲୀ ବେତାର-କ୍ଷେତ୍ର ଥେବେ ଭାରତୀୟଦେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏକ ବେତାର-ବକ୍ରତାୟ ତିନି କ୍ରିପ୍ସ୍-ସୌଭ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ଓ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରଲେନ । ବେତାର-ବକ୍ରତାପେ ଏକମାତ୍ର ଲଙ୍ଘନ ଟାଇମ୍ସର ଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ପାଦକ ଟ୍ରେଡ ଛାଡ଼ି ସମ୍ପଦ ତ୍ରିପ୍ଲ ସାମାଜିକ ବୋଧଯ କ୍ରିପ୍ସ୍‌ସେର ଜୁଡ଼ି ନେଇ । ଅର୍ପି ତୋ ବାଚନଭୂତୀ, ଅସାଧାରଣ ତୋର କଟ । ପରିଭାଷାପେର କଥା, ମେ ଦକ୍ଷତା ତିନି ପ୍ରୟୋଗ କରଲେନ ଭାରତବର୍ଷେ, ବିଶେଷ କରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟା ଅପବାଦକ୍ଷିତାରେ । ଇଚ୍ଛାକୃତ ସତାଗୋପନ ବା ସତ୍ୟରେ ବିକୃତ ସାଧନ, ଡିଶ୍ଟିନ୍ ଅଭିଯୋଗ, ପରମପର-ବିବୋଧୀ ଉତ୍ତି ଏବଂ କୁଯୁକ୍ତ ଦିକ ଦିଯେ ତୋର ଏ ବେତାର-ବକ୍ରତାଟି ରାଜନୈତିକ ଅପଭାସରେ ଏକଟି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ାହରଣ ହେଯ ଥାକବେ ଇତିହାସେ ।

ସମ୍ପଦ ବକ୍ରତାଟି ଏକ କ୍ଷମତାଗରିବିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆହତ ଅଭିମାନ ଓ ଦୂର୍ବଲେର ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞାର ଅଭିଯୁକ୍ତି । ଆସ୍ତାମାନଜ୍ଞାନମଞ୍ଚର ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ଆୟୀମେର କୃପାମାନିତ ମୁଣ୍ଡିକା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଲେ ଦାତାର ମନେ ଯେ କ୍ରୋଧରେ ସଖାର ହୁଁ, ସାର ସ୍ଟ୍ୟାଫୋର୍ଡର କଟେ ତାରଇ ପରିଚିଯ ଛିଲ ।

କ୍ରିପ୍ସ୍ ବଲଲେନ, ଭାରତବର୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ଦଲେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ପ୍ରବଳ ମତବିରୋଧ ବର୍ତ୍ତାନ, ଏକଜ୍ଞ ନିରାପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକା ନିଯେ ତ୍ରିପ୍ଲ ଗର୍ଭନର୍ମେଟ ତାର ଏକଟା ସମାଧାନ କରାତେ ଚେଯେଛିଲେନ । କ୍ରୋତାରା ବିଶ୍ୟମେ ଚକ୍ର ମାର୍ଜନା କରେ ଭାବର, ଏଡଲଫ ହିଟ୍ଲାରେର ବକ୍ରତା ତମହି ନା ତୋ ? ତିନିଓ ତୋ ବଲଲେନ, ତିନି ଟିରକାଳ ଶାପି ଚେଯେଛିଲେନ !

ଚାକରି ବଟନ, ପୃଷ୍ଠକ ନିର୍ବାଚନ, ରାଜନୈତିକ ସୁଧିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଏକାଧିକ ଉପାୟେ ଏଦେଶେ ସାମ୍ପନ୍ଦ୍ୟିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେଛନ ଏବଂ ମତବିରୋଧକେ ସଯତ୍ରେ ବୀଚିଯେ ରେଖେଛନ ଯାରା, ତାରାଇ ନାକି ମଧ୍ୟହୃତା କରାତେ ଚାନ । ପରିହାସ ଆର କାକେ ବଲେ ?

କ୍ରିପ୍ସ୍ ବଲଲେନ, ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିରାଇ ସୀକାର କରବେ ଯେ; ଯୁକ୍ତେର ଏ ଦୂଃଖମୟେ ନୃତନ ଶାସନତତ୍ତ୍ଵ ରଚନା ସମ୍ଭବ ନୟ । ଯେଣ ଭାରତୀୟ ନେତ୍ରବନ୍ଧ ଏ-କଥା ସୀକାର କରେନନି । ତାରା ଚେଯେଛିଲେନ ଶୁଣ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାବିଶ୍ଵିଟ ଏକଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକ ଜାତୀୟ ଗର୍ଭନର୍ମେଟ, ଯୁକ୍ତେର ଏ ଦୂଃଖମୟେ ଯାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବ ଚେଯେ ବେଶୀ । ଦେଶର ନେତ୍ରହାନୀର ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ସହ୍ୟୋଗିତାଯ ସେ-ଗର୍ଭନର୍ମେଟ ଗଠିତ ହେବେ, ସେ-ଗର୍ଭନର୍ମେଟକେ ଏକଟି ସାଧିନ ଦେଶର ସମର୍ଥୀପା ଦାନ କରା ହେବେ ଏବଂ ଅଲିଥିତ ଚୁଣ୍ଡ ଅନୁୟାୟୀ ବଢ଼ାଇଟ ଏକଜ୍ଞ ନିଯମତାବିହିତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ନୟର ଏ ଗର୍ଭନର୍ମେଟର ନିଯମତ କରାଯାଇବା ହେବେ ଏବଂ ଅନୁୟାୟୀ ବଢ଼ାଇଟ ଏକଜ୍ଞ ନିଯମତ କରାଯାଇବା ହେବେ ।

କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧଟାଇ ସବଚେଯେ ବେଶୀ । ବଲଲେନ, ଜାତୀୟ ଗର୍ଭନର୍ମେଟ ଗଠନରେ ଦାବି ଦାରୀ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ଆସ୍ତାମାନର ଅଯାସୀ, ଦେଶର ଡିକ୍ଟେଟର ହେତ୍ୟାର ବାସନା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଟଦଲ କଂଗ୍ରେସର । ଅର୍ଥ ଏଗାରୋଇ ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖରେ ଲେଖା ଚିଠିତେ ମୌଳିନା ଆଜାଦ କ୍ରିପ୍ସ୍‌ରେ ଲିଖେଛିଲେନ, କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଲେର ସହ୍ୟୋଗିତାଯ ଜାତୀୟ ଗର୍ଭନର୍ମେଟ ଗଠନେ ଇର୍ବୁନ । ଏ ଧାରଗାର ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରେଇ ସମ୍ମତ ଆଲୋପ ଆଲୋଚନା ଚଲାଇ । ଜାତୀୟ ଗର୍ଭନର୍ମେଟର ଜଳନ୍ଦା ସଂଖ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ଦଲେର ଅଂଶ ହିତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ନିଚ୍ଯାତିରେ ଆଲୋଚିତ ହେବେ । କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ କ୍ଷମତା ଲାଭର ଜଣ୍ଯ ବ୍ୟାକୁଳ ନୟ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣେର ହାତେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ନୟ ହେବୁ, ଏହି ଛିଲ ଜନନେତାଦେର ଦାବି ।

ଦେଶରକାର ଦାଯିତ୍ୱ ଭାରତୀୟଦେର ହାତେ ଦେଓଯାର ଆପଣି ସମ୍ପର୍କେ କ୍ରିପ୍ସ୍ ବଲଲେନ, ଭାରତୀୟ

রক্ষার দায়িত্ব ত্রিটেনের এবং মিত্রশক্তি এমেরিকার প্রতি ত্রিটেনের যে-কর্তব্য তা পরিহার করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্বে কারণও হস্তক্ষেপ যুক্তজনের অনুকূল নয়। কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, প্রধান সেনাপতির যুক্ত পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের কোনো অভিপ্রায় ছিল না কংগ্রেসের। বরং সমরমুখী হিসাবে তার হাতে আরও অধিকতর কর্তৃত অর্পণে তারা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেশরক্ষার চরম দায়িত্ব থাকবে সেলেরই একজন প্রতিনিধির হস্তে। তা না হলে স্বাধীনতার কোনো অর্থ থাকে না।

জাপানীদের বিরুদ্ধে যুক্ত পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থারের হাতে। তা সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার দেশরক্ষা সচিব অস্ট্রেলিয়ানই; মার্কিন বা ইংরেজ নয়,—এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন কেউ কেউ। কিন্তু ত্রিপিশ গভর্নমেন্ট যুক্তিকে অক্ষা করেন এমন নজির নেই।

সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি করলেন সার স্ট্যাফের্ড জাতীয় গভর্নমেন্টের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে। তিনি বললেন, “কংগ্রেস এমন একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠন করতে চায়, যার উপরে বড়লাটের বা ত্রিপিশ গভর্নমেন্টের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। একবার তেবে দেখা যাক তার মানে কী। অনিদিষ্ট কালের জন্য ভারতের গভর্নমেন্ট এমন কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হবে, যারা কোনো আইনসভা বা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী নন, যাদের কেউ কখনও নাড়াতে পারবে না।” কী সংঘাতিক কথা। সত্য তো। এ তো কোনো মতেই হতে দিতে পারা যায় না। আইনসভা, নির্বাচকমণ্ডলী এবং জনসাধারণের কাছে দায়ী ও পরিবর্তনযোগ্য গভর্নমেন্টের একমাত্র আদি এ অক্তৃত্ব নমুনা তো আছে আমাদের বর্তমান বেহুল - ম্যাক্রওয়েল - নূন - ওসমান - রামসুর্যী। পরিবৃত্ত পরম করণাময় লর্ড লিলিথগোর গভর্নমেন্টে !

বেতার-বক্তৃতার উপসংহারে ক্রীপিস্ জাপানের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধ শক্তিকে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্বৃদ্ধিমানযী উক্তি করলেন—“যুক্তি নিতে হবে, নতুন পরীক্ষা করতে হবে, পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে” এমনি সব ভালো ভালো কথা।

অপ্রতিহত্বী ব্যারিস্টার বলে সার স্ট্যাফের্ডের খাতি আছে। কিন্তু আর্ট্যু এই যে, এ-সকল উক্তিগুলি অস্তিনিহিত দুর্বলতা ও অসুস্থিতি ভার মতো ব্যবহারজীবীর মৃষ্টিতে ধরা পড়েন। “যুক্তি নিতে হবে” ঠিক কথা। তবে স্ট্রে ত্রিপিশ গভর্নমেন্টকে নয়,—নিতে হবে পদান্ত নিপীড়িত ভারতীয় জনসাধারণকে। “নতুন পরীক্ষা করতে হবে।” অর্থ ভারতবর্ষে বহাল থাকবে সেই সন্মত বৈরোধাসন। “পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে।” শুধু ভারত সম্পর্কে নয়! এই হলো ত্রিটেনের সর্বাপেক্ষ প্রগতিশীল সমাজতাত্ত্বিক ভারতবৰ্জু সার স্ট্যাফের্ড ক্রীপিস্ কথিত পুস্মাচার !!

বিলাতের ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের অনুকূল অস্থায়ী যুদ্ধকালীন গভর্নমেন্ট গঠিত হবে, এই ভিত্তিতেই মৌলিনা আজাদ ও পণ্ডিত নেহেক ক্রীপিস্ প্রস্তাবের আলোচনা করেছেন। পরে দেখা গেল, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেরই স্থানীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজী নন বিটিল কর্তৃপক্ষ। কখনও কোনো আলোচনায় ক্রীপিস্ যে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের আভাসমাজে দিয়ে ছন এমন কথা ও স্থীকার করলেন না তিনি। অর্থ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন বা তাতে যোগ দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে তিনি, সংস্থাহ আলোচনা করবেন মৌলিনা আজাদ বা পণ্ডিত জওহরলাল, একথা একমাত্র উশাদ বা বিশেষ অভিসঞ্চিপ্রয়ায়ণ ব্যক্তি ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জোরের সঙ্গে বললেন, ক্রীপিস্ ক্যাবিনেট গভর্নমেন্টের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ক্রীপিস্ তা বেমালুম অঙ্গীকার করলেন। যদিও সাংবাদিকদের মধ্যে যারা ২৩শে মার্চের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই সাক্ষ্য দেবেন যে, সেখানেও ক্রীপিস্ এই ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের কথাই বলেছিলেন।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ একটি অতি মারাত্মক ভুল করেছেন। তারা ক্রীপিস্ আলোচনার কোনো লিখিত ও অবিসংবাদিত দলিল রাখেননি। বিলাতে ব্যবসায়ীদের দেখেছি, কোনো বিশেষ জেনদেন বা চুক্তি সম্পর্কে দুই ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার একটি প্রস্পর অনুমোদিত লিখিত বিবরণ থাকে।

আলোচনার পরে একজন আলোচনার সমুদয় বিবরণ একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করে অন্যজনের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি হয় ঐ পত্রে বর্ণিত বিবরণ যথার্থ বলে অনুমোদন করেন, নয় তো অমনি দৈশ করেন। এ ব্যবস্থায় দুই পক্ষের মৌখিক আলোচনায় কোনো সময় একে অন্যের উক্তি বা মনোভাবকে ভূল বুঝালে অবিলম্বে তার সংশোধন হয়। চাইলিশ কোটি নরসুন্দীর ভাগ্য নিয়ে যেখানে আলোচনা চলছে, সেখানে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ একে কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেননি—এ শুধু আশ্চর্য নয়, বালকেচিত অদ্বৈতিনির্তিত পরিচায়ক। প্রত্যেক দিন সক্ষায় সেবিনকর আলোচনার সারমূর্ম একটি পত্রে প্রথিত করে তাতে ক্রীপসের অনুমোদন-স্বাক্ষর রাখলে পরে পরম্পরারের প্রতি এই অসত্য ভাষণের দোষাবোপ করার অবকাশ ঘটত ন।

মৌলানা আজাদ তাঁর শেষ দীর্ঘ চিঠিতে বলেছেন, দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস ও ক্রীপসের মধ্যে আলোচনা যতই এগিয়ে চলেছে, ব্রিটিশ মনোভাবের ততই ক্রমিক অবনতি ঘটছে। এ মন্তব্য অহেতুক নয়। ব্রিটিশ প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আগমন ও ভারত পরিভ্যাগের মধ্যে ক্রীপসের চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটছে।

ক্রীপসের এই ব্যর্থতার এবং পরিবর্তনের কারণ কী, তা নিয়ে বহু অনুমান, বহু সংশয়, বহু গবেষণার অবকাশ আছে। ব্যর্থতার সমুদয় দায়িত্ব ক্রীপসের নয়।

লর্ড লিন্লিথগো ক্রীপস-দৌত্যের সাফল্য কামনা করেননি, একথা অনুমান করা কঠিন নয়। যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে একাধিকবার ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহের তিনি ভার নিয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং তার দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, অন্য কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে একজন শ্রমিকদলের সদস্য দ্বারা তা সম্ভব হবে এটা তার পক্ষে কুচিক্ষণ নয়। ব্যক্তিগত মতবাদে লর্ড লিন্লিথগো যে একজন কলার্টিভ ডাইর্হার্ড সে-কথা অবিদিত নয় কাবো কাছে।

জীবিলাট আর্টিবল্ড ওয়েডেল একজন ভারতীয় দেশবক্তা সচিবের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন কি ন তা ও জানার উপায় নেই। ওয়েডেল বর্তমানে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তার স্মরণেন্পুঁজের উপরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অবিচলিত আস্থা। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে তার সামরিক ব্যাপারে ওয়েডেলের অনুমোদিত কোনো ব্যবস্থায় সম্ভব হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাধারণের ধারণা এই যে, লক্ষ থেকে টেলিফোনযোগে সার স্ট্যাক্ফোর্ডকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, তিনি যেন ওয়ার ক্যাবিনেটের সিংহাসনে প্রস্তাবের বাইরে আর এক পাও না যান। ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার্টিল ও এমারিয়ার মনোভাব এতই সুপরিচিত যে, এ অনুমান একেবারে অমূলক মনে হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতে ইংল্যন্ডের রাজনৈতিক গগনে ক্রীপস ছিলেন একান্ত নিষ্পত্তি। শ্রমিকদলের সঙ্গে সে সময়ে তাঁর সম্পর্ক ছিল হয়েছিল। উনিশ শ উনচাইলিশ সালের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে এলেন। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করলেন, বিভিন্ন ভারতীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন, পক্ষিত জওহরলালের অভিধিকারে পুঁখানপুঁখরূপ অনুসঙ্গান করলেন এ দেশের জাতীয় আন্দোলন ও তার ধারা সম্পর্কে।

ভারতবর্ষ থেকে ক্রীপস গেলেন চীনে। চীন থেকে বাণিয়া হয়ে ইংল্যন্ডে যখন প্রতার্ক্তন করলেন, চীনারলেন গভর্নমেন্টের তখন পতন ঘটেছে। প্রধান মন্ত্রীরাপে চার্টিল গঠন করেছেন শতন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট। বাণিয়া ও ব্রিটেনের বৈদেশিক সম্পর্ক সে সময় মধ্যের নয়, অথচ একমাত্র বাণিয়ার সঙ্গে মিতালীর দ্বারাই তখন যুরোপে হিটলারের প্রতিরোধ সম্ভব। কে ভার নিয়ে গাণিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রীসাধনের? ক্রীপসের নাম কে প্রস্তাব করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্ধেকার্জন পরিভ্যাগ করে রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্তৃতপ্রায় ক্রীপস অক্ষয়াৎ একদিন প্রবেশ করলেন দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে। প্রধানমন্ত্রী চার্টিল বোধ হয় বললেন, যাকে পছন্দ কর তুমি, সেখানে ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে যাও। ব্রিটেন ও বাণিয়ার মধ্যে মিত্রতার সম্ভব খাপন করা চাই। এখনই রওনা হও। ফ্র. গড়স্ সেক।

ক্রীপস্ রাশিয়ায় গেজেন এবং অসাধারণ করলেন। ত্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে তিনি হৃদ্যতার সৃষ্টি করলেন, যা ইতিপূর্বে প্রায় অসম্ভব বলে গণ্য হয়েছে। মঙ্গো ও কুইবাইসেভে নিজ কর্তব্য সমাধান করে উনিল শ বিয়ালিশ সালে যখন ইংল্যান্ডে ফিরলেন ক্রীপস্ তখন তার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দুই অপরিসীম। চার্চিল তাকে আপন মন্ত্রিমণ্ডলে গ্রহণ করলেন।

ভারতীয় সমস্যার তিনি একটা সম্মোহনক হীমাংসুধানে সক্রম হবেন, এ বিবাস ক্রীপসের ছিল। ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাব যে ভারতীয় জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা প্ররুণে অক্ষম, একথা কি তিনি বোঝেননি? তা হলে তার বহু-বিজ্ঞাপিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, গঙ্গার্জি প্রধান সাক্ষাতের দিনে ক্রীপসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “এই প্রস্তাব নিয়ে তুমি ভারতবর্ষে এলে কেন?” উপরেশ দিয়েছিলেন, “এর বেশী আর কিছু বলি তোমার দেবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ফিরতি বিমানে দেশে ফিরে যেতে পার।”

ক্রীপস্ নিচ্যন্তই জানতেন ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট নয়। কিন্তু তার আশা ছিল, ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য বর্তমান, তারই সহযোগিতায় তিনি তাদের সম্পত্তিশান্ত করবেন। কিন্তু কংগ্রেস সেত্বর্গ শিশু নন; ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগের প্রকারে তাঁরা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে দেননি।

বোধ হয় ক্রীপসের আশা ছিল, অকুস্তুলে অবস্থানকারী—ম্যান অন্ড স্পট—হিসাবে তিনি প্রস্তাবগুলির কিছু কিছু সম্প্রসারণের ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবেন ত্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে। চার্চিল তাকে বিবাশ করলেন। দুর্বিক দিয়েই তিনি বিফল-ঘনোরথ হলেন।

নিজের মতবাদে অবিচলিত ও সততায় একনিষ্ঠ ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতেন। একাশে ঘোষণা করতেন, ভারতীয়দের দাবি ন্যায়সংক্রত। ত্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাব আপস অনুসূল নয়, তাদের আন্তরিকতা সন্দেহজনক। ক্রীপস্ তা করলেন না। তিনি ত্রিটিশ গভর্নমেন্টের সমর্থন করে কংগ্রেসের প্রতি কটুক্ষণ করলেন। ত্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই চরম সম্মতিকালে ক্রীপস্ ন্যায়-নীতি অপেক্ষা মন্ত্রিসভার নিজ সহকর্মী ও প্রধানের প্রতি আনন্দগ্রস্ত কেই ব্রেষ্ট আসন দিলেন। ত্রিটিশজ্ঞতির প্রয়োজনে তিনি অপভাবের আশ্রয় নিলেন। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রী সার স্ট্যাফেড ক্রীপস্ আছত্যা করলেন।

চার্চিল জয়লাভ করলেন। শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার প্রচেষ্টায় নয়, নিজ সভ্যবপ্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানীর ধৰ্মস সাধনেও পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করলেন তিনি।

ইংল্যান্ডের জনসাধারণ চার্চিলের প্রধানমন্ত্রীর সুরী ছিল না। বিভিন্ন ব্রগুনে একটির পর একটি করে পরাজয় পার্সামেন্টের সদস্যদের বিচিলিত করে তুলেছিল। তাঁরা তীব্র ভাষায় চার্চিল গভর্নমেন্টের অক্ষমতার আলোচনা করেন। কিন্তু চার্চিলকে অপসারিত করেন না। তাঁর কারণ চার্চিলের প্রতি শ্রদ্ধা বা আশ্চর্য নয়। একান্ত নিরূপায় তাঁরা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য বিত্তীয় ব্যক্তি নেই। ইংল্যান্ডে।

রাশিয়ায় অভাবিতপূর্ব সাফল্য ক্রীপসকে যে সম্মান ও খ্যাতি দিয়েছিল, তাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর প্রতি। কেউ কেউ বলতে শুরু করল, ইংল্যান্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী সার স্ট্যাফেড ক্রীপস। ভারতীয় সমস্যার সম্মোহনক সমাধান করতে পারলে ক্রীপসের যোগ্যতায় ত্রিটিশ সর্বসাধারণের আশ্চর্য গভীর হতো, চার্চিলের প্রবল প্রতিষ্ঠানীরাপে রাজনীতিতে ক্রীপসের প্রভাব হতো অনন্য-সাধারণ। ওয়ার ক্যাবিনেটের এক শূন্যগর্ভ প্রস্তাব দিয়ে চার্চিল ক্রীপসকে ভারতে পাঠালেন, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন গাঙ্গীজি, আজাদ ও নেহরু কখনও গ্রহণ করবেন না এ প্রস্তাব।

ক্রীপস্ ব্যর্থকাম হলেন। চার্চিলের প্রধান মন্ত্রীর নির্বিঘ্ন হলো। রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠানীদের অপসারণের একাধিক উপায় আছে। স্ট্যালিন তাদের হত্যা করেন বন্দুকের গুলিতে, চার্চিল তাদের নিঃশেষ করেন কৃতিনেতিক চালে। সোস্যালিস্ট ক্রীপস্ ইলিপ্রিয়ালিস্ট টোরিয়ের সঙ্গে হাত ‘মিলিয়ে ত্রিটিশ রাজনীতিতে নিজ হাতে নিজ মৃত্যুগত স্বাক্ষর করলেন নিজেরই অঙ্গাসারে।

রাজিতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল এক বৃক্ষগ্রাহে। ভদ্রলোক কলকাতার এক নামজাদা স্বার্হে

কোম্পানীর কভেনাণ্টেড সার্টিফিসের লোক, খেতাব পরিচালকগোষ্ঠীতে একমাত্র বাঙালী অফিসার। প্রচুর বেতন, প্রভূত প্রতাপ। যুক্তির অয়োজনে গভর্নমেন্ট 'সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' নিয়ে এসেছেন আরও বেশী পারিঅ্বয়িক দিম্বে। নিজের কোম্পানীতে 'লিয়েন' আছে। যুক্ত শেষ হলে সেখানে ফিরে গিয়ে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন পূর্বৌরোবে।

নিম্নিত্তের সংখ্যা জন দশকে। একমাত্র আমিই একক। বাকি সবাই যুগলে; — মিস্টার এন্ড মিসেস। ডিলার নটায়, কিঞ্চ নিম্নিত্তের সাড়ে সাতটার মধ্যে সবাই উপস্থিত। ড্রয়িং-ক্রম তাদের হস্তা, পরিহাস ও আনন্দকলনবে মুখৰিত হয়ে উঠল।

আমদের প্রাচীন ভোজনভাষ্যলির সঙ্গে এই ডিলার পার্টিগুলির প্রভেদটা সুস্পষ্ট। তফাতটা শুধু আসন প্রেতে আহার ও ছুরি কাটার খাওয়ার ঘণ্টে নয়। আমদের ভোজন আয়োজনগুলি মূলতঃ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম সম্পর্কিত। মেয়ের বিষে, ছেলের উপনয়ন, নাতনীর ভাত ফিংবা ত্রুত, পার্বণ উপলক্ষ করে আমদের নিম্নুণ। তাতে সোক ডাকতে হয় আর্যায়তা ও কুটুম্বিতার সূচ ধরে, হৃদ্যতার বিচার করে নয়। সূতৰাঙ সংখ্যা হয় অপরিমিত। ছাদের উপর সামীয়ানা টাঙ্গিরে তার নীচে এক সঙ্গে আসন পড়ে সন্তুর কিংবা আলী। মেয়েদের জন্য শয়নগৃহে খাট-পালক বের করে খাবার জাহাগ। এতেও একেবারে সমাধা হয় না সমৃদ্ধ নিম্নিত্তের আহার। বাড়ির সিকি মাইল দূর থেকে টের পাওয়া যায় কলকোলাহল।

ইংরেজী ডিলারের বিশেষ কোনো উপলক্ষের দরকার নেই। নেই কোনো নির্দিষ্ট দিন। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ডাকার অলংকৃতীয় দায় নেই গৃহকর্তার। গৃহকর্তা বলাই ঠিক,—কারণ নিম্নুণ করেন গৃহিণীরা।

এক টেবিলে বসে খাওয়ার সীতি স্বভাবতঃই নিম্নিত্তের সংখ্যাকে পরিমিত রাখে। বেশীর ভাগই ছান্নন; উর্বর বাত্তা। তাও গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে নিয়ে। বাড়ির গৃহিণী এখানে ভাড়ারে যদ্যা মাখানো নিয়ে ব্যস্ত নয়, ড্রইং রুমে আর পাচজন নিম্নিত্তার ন্যায় আলাপ-আলোচনায় তারও যোগ আছে। তাঁর বসন হলুদের চিহ্নারা লাঙ্গিত নয়, আনন উনানের আচে বিশীর্ণ নয় এবং দেহ পরিবেশনজনিত ক্রান্তিতে পীড়িত নয়। তিনি সমৃদ্ধ অভ্যাগতদের আহারাপ্তে অপরাহ্ন বেলায় সর্বশেষে আহারে বসেন না, তাদের সঙ্গেই আর্য গ্রহণ করেন। গৃহকর্তা কোমরে গামছ জড়িয়ে জলের জাগ বা নুনের ইডি হাতে ছুটেছুটি না করেও অতিথিদের আদর আপ্যায়নের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাদের সঙ্গে বসেই আহার করেন।

খাওয়াটাই ইংরেজী ডিলারের মূল কথা নয়। সেটা বছুজনের একত্র মিলনের একটা উপলক্ষ মাত্র। তাই আহারের আয়োজন পরিমিত। সূক্ষ থেকে অস্ত্ব পর্যন্ত শব্দটা তরকারি এবং দরবেশ থেকে রাবড়ি পর্যন্ত পাঁচটা মিটারের আয়োজন না হলে সেখানে কেউ ছি ছি করে না। পাক্ষিয়া গেলার কৃতিত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা নেই ইংরেজী ডিলারে। আমদের আধুনিক সমাজের ইঙ্গ-বক্সের ঝটি অস্বীকৃত থাবৎ কখনও ক্রান্তি নেই, এই একটি ব্যাপারে অন্ততঃঁ তাঁরা যেন আমদের কাছে কৃত্ত্ব থাকেন।

আমদের নিম্নুণকর্তা মজলিসী ধরনের লোক। আসর জ্যোতির দক্ষতা আছে তাঁর। এককালে শিকারে সখ ছিল। বিহারের জঙ্গলে সহুর শিকারের গুরু করলেন, আসামের অরণ্যে মুকুড়।

শুধু গুরু নয়, তাসের ম্যাজিক জানেন অনেক রকম। চোখ বুজে প্যাকেটের মধ্য থেকে চিরিতেনের গোলাম বের করে দিয়ে বিশ্বিত করলেন সবাইকে, হরতনের নওলাকে হাত ঘুরিয়ে শির্ষের মধ্যে বানিয়ে দিলেন গোলাম এবং এক মহিলার শাড়ির ভাঁজ থেকে ইঞ্জাবের সাহেব থের করে তাঁর কাছে কপট তাড়না এবং আর সবার কাছে উচ্ছুসিত সাধুবাদ সাত করলেন। গুরু ঝটপ ও হাস্য পরিহাসের মাঝে মাঝে শীতল পানীয় এবং কক্ষটে পাশে টোমাটোর রস পরিবেশন করল বেয়ারা।

আহারের ব্যবহাৰ পাশের কষ্টে। বুকে ডিলার। একটা টেবিলের উপরে বিভিন্ন পাত্রে সাজানো পদ্ধতি আহার্য। ব্রোষ্ট, স্যালাদ, চপ, আবার তাঁর সঙ্গেই পরোটা বিরিয়ানী, পটলের সোলমা।

পৃষ্ঠিৎ আছে, রসগোল্লাও আছে। অবাক হওয়ার কিছু মেই। ইঙ্গ-বঙ্গের ছাপ থাকে আমাদের অশনে, বসনে, চিঞ্চায় ও কর্মে। হাতে দশগঙ্গা জলতরঙ্গ চূড়ির সঙ্গেই আমাদের মেয়েরা পরেন রিস্টওয়াচ; কোচানো ধূতির উপরেই ছেলেরা পরেন ডবল কাফের সার্ট।

সাইডবোর্ডে স্তরে স্তরে একদিকে সাজানো আছে প্রেট, অনা দিকে চামচে, কাঁটা এবং ছুরি। সবাই প্রেট নিয়ে স্বত্ত্বে নিজ নিজ অভিকৃত মতো আর্থাৎ তুলে নেন। ছেলেরা বেশীর ভাগ টেবিলের চার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থান। মেয়েরা কেউ বা বসেন চেয়ারে, কেউ বা ছেলেদের অনুসরণে দাঁড়িয়েই। গৃহকর্ত্তা থেতে থেতেই তদারক করেন অতিথিদের। বলেন, “এ কী ভাই; মিলি তুমি কিছু খাচ্ছ না যে? মিস্টার সেন, আর একটা চপ নিন। মিসেস দেশাই রোস্ট নিয়েছেন তো?”

মিসেস সাহার নাম শোনা ছিল ইতিপূর্বে, চাকুষ পরিচয় ঘটল এই ভোজসভায়। অতিশয় ক্ষীণাত্মী, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট ফর্সা কিন্তু পাউডার-আধিক্যের দ্বারা গন্তের স্বাভাবিক বর্ণকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছেন যে, কাগজের মতো সাদা মুখ দেখে মনে হয় বুঝি বা কোনো কঠিন অসুবিধের পর ভাওয়ালী বা মদনপলী স্যানিটোরিয়াম থেকে সদ্য উঠে এসেছেন! পরিধানে সাদা ধৰ্বধৰণে শিফনের অতি মহার্ঘ শাড়ি; প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ। তার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর ঈষৎ হাঙ্ক রঙের অস্তর্বাস। শাড়িতে পাড় থাকাটা আজকাল যথেষ্ট মডার্ন নয়। ঘটি-হাতা ব্রাউজের মধ্যে থেকে লম্বমান বিশীণ বাহুবয়। ‘ভি’ আকৃতি সম্মুখ ভাগে মর্মাণ্ডিকরণে উদয়াটিত শ্রীরাম দুই পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদ দুটি কঠা! গলায় মুক্তার একটি মালা। কানে সর্পাঙ্কতি ক্ষম মুক্তা গোথে গোথে একজোড়া দুল, প্রায় কাঁধ অবধি খোলানো। বাম হাতের মীর্ঘ সরু অনামিকায় তারাই সঙ্গে ম্যাচ-করা মুক্তবসানো মন্ত একটি আংটি। সবুজ, নীল, মেরুল, ভায়োলেট প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের শাড়িপরিহিতদের মধ্যে মহিলা আপন বেশভূয়ায় সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। যেন শীতের দিনে বর্ণাদ্য মরসূমী ফুলের বাগানে রজনীগঞ্জার উপত বৃক্তি।

মহিলা টেবিল-স্কুনের আধ চামচ বিরিয়ানি নিয়েছিলেন, তাই যেন শেষ করতে পারেন না! হোস্টেস একটু রোস্ট তুলে দিতে যাচ্ছিলেন তার প্রেটে। “পারবো না ভাই, পারবো না, দিয়ো না, মীভ” বলে টেবিলে উঠলেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর একটা চপ নিলেন এবং মানিকিউর করা দুই আঙ্গুল দিয়ে অতি সৰ্পণে তার সিকি ভাগ ভেঙে খেলেন। কেবলই বলেন, “ভয়ানক পেট ভয়ে গেছে। আর পারবিনে!”

একটা যালের চচড়ি ছিল টেবিলে, তাই একটু নিলেন মিসেস সাহা। এটাই চলতি। মিস্টার সাহা বাধা দিয়ে বললেন, “খেয়ো না, এত যাল খেলে অসুখ করে মরবে।” এতেও নতুনত নেই। স্বামীরা লক্ষ থেতে বারণ করেন এবং স্ত্রীরা তা অগ্রহ্য করে বেশী করে লক্ষ থান, এইটে প্রমাণ করাই হলো আধুনিকাদের আহার সম্পর্কিত আধুনিকতম ফ্যাশান।

ভোজনপর্বের শেষে মহিলাদের প্রতি অনুরোধ হলো গানের। কেউ গাইলেন। কেউ “অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি” বলে এড়িয়ে গেলেন। গৃহকর্ত্তা মোটামুটি রকম গাইতে পারেন এবং তাকে অনেক সাধ্য সাধনা না করলেও চলে। একটি গুজরাটি মহিলা তার স্বদেশীয় সঙ্গীত শোনালেন। তার মধ্যে একটি ভজ্ঞ কবি নরসিংহে মেহতার রচনা। তার রচিত “বৈশ্বের জনতো তেনে কহি” বলে একটি গান এককালে গ্যাজীজির প্রিয়রকাপে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মিসেস সাহার সদাশয়তা আছে। অনেক রাত্রিতে ডিনার পাঠি ভাঙলো। নিজ মোটরে পৌছে দিতে চাইলেন আমাকে আমার আবাস। মিস্টার সাহাকে বললেন, “বীরেন, মিনি সাহেবকে নামিয়ে দিতে হবে কুইন্সওয়েতে।”

অতি-আধুনিকারা স্বামীকে নাম ধরেই ডাকেন। ওটা ইংরেজীর নকল। আমি সন্মাননা নই। স্বামীর নাম করতে নেই, এ অনুসাসনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আমার বিস্বাস নেই। কিন্তু ইংরেজী জন্ম, আর্থাৎ, সিরিলের কায়দায় আমাদের স্ত্রীরাও আমাদের সুবীর, বিকাশ বা উপেন বলে ডাকতে শুরু করলে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠারও কোনো কারণ দেখি না।

মানুষের নামের যদি কেবলমাত্র সন্তুষ্করণ ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন না থাকত, তবে

নামের বদলে সংখ্যা ব্যবহারের দ্বারাই তা অনায়াসে চলতে পারত। তা হলে মেয়ের জন্ম মাঝেই মেয়ের মা তার নামনির্বাচন নিয়ে ভাবনায় পড়তেন না। নিত্য নতুন নামকরণের অনুরোধ জানিয়ে রয়ীক্ষনাধের কাছে চিঠি আসত না।

জড় বন্ধুর পক্ষে নাম একটা অভিধা মাত্র। গোলাপকে ঘৈটু আখ্যা দিলে তার গক্ষের তারতম্য ঘটে না, একথা সেরাপীয়রের মতো অন্য পাঁচজনেও জানে; যদিও একথা ঠিক যে, কাব্যের শিমানা থেকে শুধু ট্রি নামের জন্মেই তার চির নির্বাসনের সঙ্গাদ্বা ঘটে।

কিন্তু মানুষের পরিচয় তো কেবল কোনো বিশেষ একটি স্মরণ দ্বারা নয়। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তার বিভিন্ন রূপ। তাকে প্রকাশ করার জন্য তার বিভিন্ন নাম। আপিসে ক্লেনারীবাবুর কাছে যিনি মিস্টার মুখাজী, পাড়ায় বৃক্ষদের কাছে তিনি বিনোদবাবু, গালোর সহপার্টীদের কাছে বিদ্দে, বাড়িতে মায়ের কাছে খোকন এবং কোনো বিশেষ একটি মাত্র লোকের কাছে তিনি ‘ওগো’ কিংবা ‘শুনছো’ নয়তো শুধু মাত্র ‘এই’। সেগুলি তো কেবলমাত্র নাম নয়,—সেগুলি নির্দেশ। সংজ্ঞা নয়, সংজ্ঞে। সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কাছে সেগুলি বিশেষ অর্থ বহন করে, বিশেষ কানের ডিতরে বিশেষ সুর। এবং অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন, এই ছেট দুই অক্ষরের সংজ্ঞের দ্বারাই যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

তেরো

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় এমন কতকগুলি দুর্বল মুহূর্ত আসে যখন সে মন্তিক্ষ অপেক্ষা হ্রদয় দ্বারা বেশী চালিত হয়। সে মুহূর্তগুলি অতক্ষিতে দমকা হ্যায়ার মতো এসে অতিসাধারণী লোকদের হৈর্মের বক্ষন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখন সংখ্যায় যোগী পুরুষেরা লক্ষ্যপ্রাপ্ত হন, হিসেবী মহাজনেরা গরমিল করেন জ্ঞানবরচের খাতায় এবং স্বভাবতঃ চাপা প্রকৃতির হিতৰ্যী ব্যক্তিবা বিচলিতচিত্তে মনের কথা ব্যক্ত করেন অন্য লোকের কাছে। এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে আধারকারের পূর্ব ইতিহাস উদয়াচিত হলো একান্ত অপ্রত্যাশিতকরণে। ক্লান্ত সমাহিত নয়ন এবং নিঃসন্দেশ তীব্র-যাপনের অস্তরালবত্তী রহস্য শোনা গেল তারই নিজ বর্ণনায়।

অপরাহ্ন বেলায় ট্রিশান কোণে মেঘ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি প্রত্যাশা করেছিলেন শ্রীশ্বেতাঙ্গি হতভাগ্যের দল। বৃষ্টি এল না, এল আধি। ধূলির ঝড়। না দেখলে কঢ়না করা শক্ত এর রূপ। বাংলাদেশে কোনোকালে দেখা যায় না এ জিনিস। আকাশ-ভুবন আধার করে প্রবল বেগে কোথা থেকে আসে এত বিপুল ধূলিরাশি তা ধারণাতীত। মেঘের চাইতে ঘন তার আচ্ছাদন সূর্যকে থাবৃত করে। ঘরের মধ্যে আলো ঝালতে হয় দিনের বেলায়। দের জনালা নিষিদ্ধরাপে বক্ষ গরলেশ কিছু ধূলা প্রবেশ করে নাকে, মুখে, চোখে, এমনকি বাঁকু পেটরার মধ্যস্থিত গোমা-কাপড়ে। বৃষ্টির ফৌটা মাত্র নেই; শুধু শুক ধূলির ঝড়। কিন্তু এই আধির ফলেই উত্তাপ হৃৎ পায় অভাবনীয় ভাবে, ধূরণী হয় শীতল। উত্তর ভারতের এক বিশ্বকর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই ধূমধি।

কন্দম্বার কক্ষে বসেছি দৃঢ়নে মুখোযুক্তি। শোঁশোঁ শব্দে বাইরে বইছে আধির ঝড়ে হাওয়া, ধাপোড়িত হচ্ছে ধূলির পাহাড়। ধীরে ধীরে অনুচ্ছ কষ্টে বিবৃত করলেন আধারকার আপন শীখন-ইতিহাস।

আধারকারের কুলগত পেশা যুক্ত। তার পূর্বপুরুষেরা লড়েছে মুঘলের সঙ্গে, লড়েছে যশোবন্ত শিংহের বিরুদ্ধে। তার প্রপিতামহ বিসুদ্ধদণ্ড পেশোয়া বাজিরাওয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আসাইর যুদ্ধে পেশোয়ার দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে শত্রু নিপাত করেছেন অমিতবিজ্ঞমে। নিহত হয়েছেন শুকে ধূলির আধারে। আধারকার বালক বয়সে দেখেছেন তার কুধিরাস্ত লৌহবর্ম, পরিবারের স্থষ্টী রাস্ত পৌরবময় উত্তোলিকার। ধীরের ঝড় আছে তার ধূমনীতে।

পরিবারে বিষ্ণু প্রচুর, ধীরে ছিল বিখ্যাত, কিন্তু বিদ্যা ছিল না আধুনিক। আধারকার পিতার একমাত্র সন্তান, শিশু লাভ করেন পুণার এক ইংরেজী স্কুলে। একফিল্ডস্টোন কলেজ থেকে পাশ গ্রে গোলেন মাঝেস্টারে। বয়ন-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ হয়ে যখন ফিরলেন স্বদেশে, যুরোপের প্রথম

মহাযুক্ত তখন ক্ষান্ত হয়েছে। বস্তে স্থাপন করলেন এক কাপড়ের কল, অসুরের মতো খাটতে লাগলেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

বছর ধাঁচেক পরের কথা। এক সঞ্চায় এক বক্সুর আগমন সম্ভাবনায় এসেছেন দাসর টেশনে। বক্সু এলেন না। ফিরে আসছেন এমন সময় কানে এল এক নারীকষ্ট। সে তো কষ্ট নয়, সে সূর। ভাষা বুবলেন না, পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, প্যাটফরমে পাড়িয়ে এক তরঙ্গী, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সামনে সুটকেশ, হোক্সঅল, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি মালপত্র। উভয়ের মুখে উংগেগের ছাপ সুম্পট। বস্তে তখন সাম্প্রদায়িক দাসীর তাঙ্গব চলেছে সাজান্তিক। টেশনের ভিতরে কুলির অভাব, বাইরে যানবাহনের। সঞ্চায় পরে ঘরের বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা কি বস্তে এই প্রথম এলেন?”

ভদ্রলোক বললেন, “হ্যা, আমার এক আঢ়ীয় থাকেন এখানে। তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেম টেশনে হাজির থাকতে। আসেননি দেখছি। বেথেহয় টেলিগ্রাম পাননি।”

“পেলেও আসা কঠিন। শহরে দাসা বেধেছে, খুন-খারাপি চলছে বেপরোয়া। আপনারা কোথায় উঠবেন?”

“তাই তো ভাবছি। কাছাকাছি কোনো হোটেলের সকান দিতে পারেন?”

“তা পারি। কিন্তু জায়গা পাবেন না সেখানে। বেশীর ভাগ হোটেলের চাকুর, বেয়ারা, রান্ধুনি পালিয়েছে প্রাণের ত্যমে; সেখানে বাসিন্দা যারা আছে, তাদের অবজ্জলের অভাব, নতুন লোক নেয় না আর।”

“তবে তো বড়ই মুশ্কিল” বলে ভদ্রলোক সজিনীর দিকে তাকালেন। ভয়ার্ত তাব সঞ্চালিত হলো তরঙ্গীর মুখমন্ডল। টেশনে ওয়েটিং রুমে ঢেঠা করে ফল হলো না। সব আগে ভাগেই দখল হয়ে আছে দূরগামী যাত্রীতে। পরম অসহায় দৃষ্টিত তাকালেন মহিলা তার স্বামীর দিকে।”

আধারকার প্রস্তাব করলেন, “যদি আপত্তি না থাকে, চলুন আমার ফ্লাটে। কাল প্রাতে খেজু করা যাবে আপনাদের আঢ়ীয়ের। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।”

ভদ্রলোক তাকালেন স্তুর পানে। তিনি একটু সচুচিত হয়ে ইংরাজীতে বললেন স্বামীকে, যদিও উক্তির লক্ষ্য যে আধারকার তাতে সমেহ রইল না। “রাত্রিবেলা হঠাত বিনা খবরে আমরা গিয়ে উঠলে ওর স্তুকে খুব বিব্রত করা হবে।”

আবার সেই সূর। বোধ করি, এ সূর ছিল ভীমসিংহপত্নী পঞ্জিনীর, যা দিয়ে তিনি রাজপুত যুবককে উন্মুক্ত করেছিলেন যুক্তে প্রাণ দিতে, হয় তো ছিল হেলেন অব ট্রয়ের; থার জন্য সহস্র রণতরী তেসেছিল সাগরে!

আধারকার বললেন, “এক রাত্রির জন্য নিরূপায় অতিথিদের গৃহে আতিথ্য দিলে স্তুকে বিব্রত করা হয় কিনা জানি নে, হয়তো হয়। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হোন আমার স্তু মোটেই বিব্রত হবেন না, কারণ আমার স্তু নেই।”

“স্তু নেই? ওঃ, তা হলে—”বলতে বলতে ধেমে গেলেন ভদ্রমহিলা।

আধারকার বললেন, “তা হলে কী?”

“আপনাকে ধনবাদ। আমরা কোনোরকম করে রাতটা প্যাটফরমেই কাটিয়ে দেবো।”

“ওঃ, ব্যাচিলরের বাড়িতে অতিথি হওয়াটা সামাজিকতায় বাধে বুঝি? মনে ছিল না। বেশ, প্যাটফরমেই থাকবেন। ভয় নেই। গোয়ান্জ কুলীগুলি দেখছিনে বটে এখন, তবে আছে কাছাকাছি। জড়োয়া গয়না আছে গায়ে, সুটকেশগুলির ভিতরেই বা না কোন শ' কয়েক টাকার জিনিসপত্র হবে। আশা করি, তাদের আসতে বিলম্ব হবে না। কাল মৃতদেহ সন্তুষ্ট করার দরকার হলে খবর দেবেন। আচ্ছা, চলি, গুড নাইট” বলে দ্রুত পদে নিঞ্চল হলেন আধারকার। স্বরে তার অপমানিতর ক্ষোভ এবং উচ্চা।

কিন্তু মিনিট ধাঁচেক পরেই আবার দেখা গেল আধারকারকে ফিরে আসতে। বললেন, “দেখুন, একটা উপায় মাথায় এল। আমার ফ্লাটেই চলুন। আপনাদের পোছে দিয়ে আমি কাছাকাছি আমার কেরানীর বাড়িতে গিয়ে বৰং শোব। তা হলে বাড়ির দোষ থাকবে না ব্যাচিলরদের।

চিংড়ির থেকে আগল গুটে দেবেন ভালো করে, আর যাই হোক, প্ল্যাটফরমের চাইতে আশা করি সেটি নিরাপদ হবে !”

গোয়ানিজ কুলীর নামে মহিলাটির মনে ঘটেছে তব ধরেছে। স্বামীরিও প্ল্যাটফরমে রাত কাটানোর কঠনাটা খুব প্রীতপ্রদ মনে হচ্ছিল না। সুতরাং আধারকারের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কুলীর সজ্জন পাওয়া গেল না। আধারকার নিজে দু'হাতে অবস্থানক্ষেত্রে দুটো বড় সুটকেশ বয়ে নিয়ে গেলেন গাড়িতে।

ছোট ফ্ল্যাট। একটি মাত্র শয়নকক্ষ। আহরণদির পর আধারকার প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মহিলাটি পরিষ্কার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওকী, কোথার যাচ্ছেন ?”

“আমার কেরানীর বাড়িতে ?”

“কেরানীর বাড়িতে ? সে কতদূর ?”

“মাইল পাঁচেক হবে !”

“এত রাত্রিতে সেখানে ? কোনো বিশেষ দরকার আছে কী ?”

“দরকার রাত্রিটা কাটানো”

“কেন এ-বাড়ি দোষ করল কী ?”

আধারকার এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, “দোষ নয়, মানে আপনাদের অসুবিধে—”

বাধা দিয়ে মহিলাটি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, “আমাদের অসুবিধার কথা আপনাকে কে বলেছে ? আর যদি হয়ই অসুবিধা ; আপনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আপনাকেই এই দাঙ্গা হাঙ্গামার রাত্রিতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিজেদের সুবিধা করব, আমাদের এতখানি জঙ্গলী ঠাওরালেন কেন ? তার চেয়ে বলুন, আমরা আবার সেই মেটেশনের প্ল্যাটফরমেই ফিরে যাচ্ছি !”

স্বামী উত্তোলকও জের দিয়ে বললেন, “কেপেছেন মশাই, এই রাত্রিতে যাবেন বাইরে !”

কিন্তু আর একদফা তর্ক দেখা দিল শয়ন-বার্বিশু নিয়ে। একটি মাত্র খাট ! আধারকার চান সেটি দখল করবেন অতিথিরা, তিনি ড্রিং-কুর্মের মেজেতে ঘুমাবেন। অতিথিদের ইচ্ছ্য ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এবারেও মহিলাই জয়লাভ করলেন।

নিজের ঘরে শুভে যেতে যেতে আধারকার বললেন, “এ ভারি অন্যায় হলো ! মনে মনে নিশ্চয় ভাবছেন, লোকটা সুবিধের নয়। নিজে আরাম করে খাটে নিয়া দিচ্ছে, আর অতিথিদের ভূমিশয়া !”

মনু হাস্যে মহিলাটি বললেন, “লোকটি আপনি সুবিধের নন, তা টের পেয়েছি ! অত্যন্ত অগভাট্টে !”

“অগভাট্টে ? বাঃ অগভাট্টে করলোম কথন ?”

“করলেন না ? সেই যে প্ল্যাটফরমে কী বলেছি, তা নিয়ে কত কথা শোনালেন, কেরানীর বাড়ি শুভে যেতে চাইলেন ! যান, আর কথা নয়। রাত হয়েছে। এখন, লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন গে !”

পরদিন আধারকারের ঘূর্ম ভাঙ্গলো অনেক বিলম্বে ভূতের ডাকাডাকিতে। ঘড়িতে তখন প্রায় প্রাটটা। তাড়াতাড়ি বেঁশ পরিবর্তন করে এসে দেখেন, টেবিলে প্রাতরাশ প্রস্তুত। সুপ্রভাত জ্বাপন প্রস্তুত মহিলাটি হেসে বললেন, “কাল রাত্রিতে শুভে যাবার সময় বললেন, আমাদের ভূমিশয়ার নথি মনে করে খাটে শুয়ে ভালো ঘূর্ম হবে না আপনার। কনশেস খোঁচা মারবে ! এই আপনার ঘূর্ম না হওয়ার নমুনা ? কনশেসের খোঁচা নিয়েই বেলা আটটা ?”

আধারকার লজ্জিত হয়ে বললেন, “দেখতে পাচ্ছি, আমি ঘূর্মিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা কনশেসটাও ঘূর্মে বেঁশ হয়েছিল !”

উচ্চ হাস্য উঠিত হলো টেবিলে। স্বামী ও গৃহস্থামীর অট্টহাস্যের সঙ্গে মিশল নারীকঠের কল্পনি। মহিলা বললেন, “তাই নাকের ডাকে পাশের ঘরে চোখের দু'পাতা এক করা দায় !”

“নাকের ডাক ? নাক ডাকে নাকি আমার ? কই, আমি তো টের পাইনি কথনও !”

“ঐতো মজা ! যখন টের পাওয়ার অবস্থা হয়, নাক তখন আর ডাকে না !” আবার সেই পুরুষ ও নারীকঠের সম্মিলিত হাস্যোজ্জ্বল।

সক্ষ্যার কিছু আগে অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাদের আশ্চীরের ,১২। সন্নিবেদ্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন তাদের ওখানে একদিন অবকাশমতো আসবার। আধারকার প্রস্তুত ছিলেন তখনই তাদের সঙ্গে গাড়িতে ঢেপে বসতে, শুধু সেটা নিতান্ত অশোভন হবে বলেই মনকে নিরন্তর করলেন।

তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আধারকার এসে বসলেন বায়াব্দায়। পড়তে চেষ্টা করলেন অন্যদিনের মতো এক ইংরেজী প্রেমের উপন্যাস। এগুলো পারলেন না বেশী দূর। মন বার বার উগ্রান হতে সাগলো। প্রত্যহ সক্ষ্যাবেলা বিলিয়ার্ড খেলতে যান জিমখানা ফ্লাবে। সেদিন কিছুমাত্র উৎসাহ রইল না তার।

সুনন্দা ব্যানার্জীরা দিন দশক রইলেন বহেতো। প্রত্যহ অপ্রাপ্তে আপিস থেকে আধারকার সোজা এসে হাজির হতেন ব্যানার্জীর আশ্চীরগুলো। দল বেঁধে যেতেন কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন এগোলো বন্দর, কোনোদিন মহালক্ষ্মী মন্দির, কোনোদিন বা এলিফেন্টের কেডস।

বহে ত্যাগ করে স্বস্থান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করলেন ব্যানার্জী দম্পত্তি। আধারকার রইলেন বহেতো ফিরে গেলেন আপন কুপাই রসহান, বৈচ্যুবর্জিত জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে। প্রভাত আর আনে না কোনো প্রত্যাশা, সক্ষ্যায় ঘটে না কোনো প্রার্থিত সারিধা, রাত্রিতে থাকে না পরবর্তী দিবসের প্রগাঢ় প্রতীক্ষা। সুনন্দাবিহৃত নগরীর কৃত্তাপি নেই কোনো আকর্ষণ, কোনোখানে নেই মধু, নেই স্বাদ।

কিন্তু বিজেদ মানেই নয় হেব, যতিন অর্থ নয় ইতি। অমর্শনের সাজ্জনা থাকে পত্রে, বাচনের বিকর সেখনে। লাহোর শৌহে সুনন্দা ব্যানার্জী লিখলেন,—

“মিস্টার আধারকার, নিরপায় নিশাথে অপরিচিত আগস্তুকদের আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। অতিথি দিয়েছিলেন অকৃপণ ঔদার্যে,—সে জন্য ধন্যাদাদ। আপনার সৌজন্য স্মরণে রাখব চিরকাল।”

জবাবে আধারকার লিখলেন,—

“এক রাত্রির অবস্থিতির দ্বারা ব্যাচিলের শুহাকে আপনি দিয়েছেন সম্মান, গৃহস্থামীকে দিয়েছেন দুর্ভয় মর্যাদা। কৃতজ্ঞতা তো জ্ঞানের আমি। সৌজন্যের প্রকাশ কর্মে, সেটা সহজসাধ্য; প্রীতির প্রবেশ মর্মে, তা দুরহলভা। মিসেস্ ব্যানার্জী, আপনার অনুগ্রহ বচনাতীত।”

ত্বরিত উন্নত এল পত্রের। “দেখছি, আপনার কৃশলতা শুধু আতিথেয়তায় নয়, পত্রচলনায়ও বটে। মশাই, আপনি তো চারদশ বন, আপনি চারব্দাক।”

এমনি করে চিঠি লেখালেখির খেলা চলে দুই পক্ষে। সে-চিঠিতে উক্তের চাইতে অনুচ্ছে ভাগ বেশী; শব্দের চাইতে অর্থের।

অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটলো আধারকারে জীবনে। তার জীবনের প্রারম্ভ থেকে এ পর্যন্ত, কেটেছে শুধুপত্র আর কলকারখানা নিয়ে। পরীক্ষায় পাশ আর অর্ধার্জন। সোনার কাঠি ছোয়ানো কলকাতার বাজকন্যার মতো অক্ষয়াৎ জেগে উঠে আজ নিজেকে তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। অধীত বিদ্যার শুক পাণ্ডিতের মধ্যে নয়, নয় অর্জিত অর্থের বিরাট সংগ্রহস্থলীতে। আবিষ্কার করলেন আপন উপবাসী হৃদয়ের অস্তুরীন শূন্যতার মধ্যে।

কমইন সক্ষ্যায় নির্জন গৃহকোণে ভাবতে ভালো লাগে যে শুভি, সে সুনন্দার! সুষুপ্ত রাত্রির তিমিরস্তৰ প্রহরে অক্ষয় ঘূর ভেঙে মনে পড়ে যে-প্রসঙ্গ, সে সুনন্দার। প্রভাতে প্রথম জাগরণে স্মরণে আসে যে-মুখ, সে সুনন্দার। এ কী বিস্ময়, এ কী রহস্য, আনন্দ-বেদনা-বিজড়িত এ কী অনিবর্তনীয় অনুভূতি!

নিজের হৃদয় যতই উদ্বাচিত হয় নিজের কাছে, অঙ্গিত হন, অনুতপ্ত হন আধারকার। শাসন করেন দুর্বল চিত। পাছে কোনোদিন কোনো অসাবধান মুহূর্তে সুনন্দার কাছে ইঙ্গিতমাত্রে প্রকাশ পায় মনোভাব, সে দুর্ভাবনায় শক্তি হন।

“তোমাকে আর একটু জিন জ্যাঙ লাইম দেবে, মিনি সাহেব?” হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন আধারকার।

গ্রামে তথনও অর্ধেকের বেশী ছিল। তুলে ধরে বললেম, “অলমতি বিস্তরেণ।”

মিনিটখানেক চূপ করে থেকে আধারকার বললেন, “আমাকে নিচয়ই একটা ভিলেন মনে হচ্ছে।”

জ্বাবে বললেম, “আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন। আমি রিপোর্টার, রিফর্মার নই। মিনি-সংহিতায় বিধান নেই কোনো প্রায়স্তিগ্রেণ।”

স্বল্প বিবরিতির পর খণ্ডত আখ্যানের অনুবৃত্তি শুরু করলেন আধারকার।

মাস তিনেক পরে মিলসংক্রান্ত প্রয়োজনে আসতে হলো লাহোরে। বলা বাহ্য্য, অতিথি হলেন ব্যানার্জী-ভবনে।

অতিথিকে ভারতীয়েরা সেবা করেন পুণ্যকামনায়, তাকে যত্ন করেন ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু অতিথিকে আপন করা যায় একমাত্র হৃদ্যতার জোরে। সে হৃদ্যতার প্রাচুর্য ছিল সুন্দর। লাহোরে আধারকারের কাজ সমাপ্ত হলো তিন দিনে। কিন্তু বিনা কাজের প্রচ্ছিমোচন করে একাধিকবার বার্ষ রিজার্ভ ও ক্যালেশেশনের পরে বস্তে প্রত্যাবৃত্ত হলেন তিন-চারে বারো দিন কাটিয়ে। কিন্তু যে-আধারকার বস্তে থেকে গিয়েছিলেন এবং যে-আধারকার লাহোর থেকে ফিরলেন তারা এক ব্যক্তি নন। ইতিমধ্যে তার জ্ঞান্ত্রণ ঘটেছে।

লাহোরে সেদিন অপরাহ্ন বেলায় গিয়েছিলেন এক পরিচিত বজ্র সন্দর্শনে, শহর থেকে অনেকটা দূরে। আশা ছিল সজ্জার পুরৈই প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু এড়াতে পারলেন না অনুরোধ, নেশভোজন সমাধা করতে হলো সেখানে। ফেরার পথে নামল বৃষ্টি। তার উপরে বাহন হলো বিকল। টাঙ্গার অশ্ব ও আসন দুই-ই প্রচীনত্বে সমান, চলতে চলতে একটি চাকা হানচুত হয়ে ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ; আরোহী সবলে নিক্ষিপ্ত হলেন কর্দমাত্ত পথে। উত্তর ভারতে শীতকালের বর্ষণ বর্ষার প্রবল বারিপাতকেও হার মানায়। ভজ্জীন পথপ্রাণ্তে সিংহ হলেন দীর্ঘকাল, ব্যানার্জীগুহে যথন এসে পৌছলেন রাত তখন প্রায় চারটা।

মনু আঘাত করতেই দ্বার খুলে দিলেন যিনি তিনি স্বয়ং সুন্দর।

“কোথায় ছিলে এই বড় বাদলার মধ্যে? সারা রাত ধরে উৎকঠ্য মরছি” বলতে বলতে কঠ রঞ্জ হলো বাপ্পে। কর কর ধারায় অবাধ্য অঞ্চ গড়িয়ে পড়ল দুই গণে। আঘাতবরণ করতে ভৱিত অন্তর্হিতা হলেন পাশের কক্ষে।

দোর খোলার শব্দে গৃহস্থারী নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি দোতলার সিডি বেয়ে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমরা ভেবে ভেবে মরি, বিদেশ বিহুই এই দুর্যোগের রাত্রিতে কোথায় কী হয়। সুন্দর তো এক মিনিটের জন্য বিছানায় যায়নি, কেবল বারান্দায় এদিক ওদিক করেছে। একটু শব্দ হলেই টাঙ্গা এল ভেবে নীচে যায়।”

আধারকার বাহনবিস্তু বিস্তুত করলেন সবিস্তারে, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ বিলম্বের জন্য। সুন্দর বেরিয়ে এসে গঞ্জীর কঠে বাধা দিয়ে বললেন, “ভিজে জামা-কাপড়গুলি ছাড়া হবে কি? টাঙ্গার চাকা কইশি ভেঙেছে, ঘোড়া ক'গজ লাফিয়েছে সে সব কাহিনী কাল সকালে ব্যাখ্যান করলে কিছু মহাভারত অঙ্গ হবে না। মাথা থেকে এখনও জল বরছে, নিউমোনিয়া না বাধালে বোধ হয় বাহানুরিটা পুরা হবে না।”

বোরা গেল, শাসনকর্ত্তা মেপথেই ছিলেন, টাঙ্গা দুর্ঘটনার বিবরণ শুনেছেন শকর্ণে।

আপন শয়নকক্ষে এসে নিদ্রার চেষ্টা করলেন আধারকার। ঘূর্ম এল না। মুদ্রিত কমল-কলিকার পার্শ্বে শুশ্রান্ত লুক ভ্রমের মতো মন বারংবার কেবলই প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল একটি কক্ষপথে। অতিথির বিলম্বে গৃহকর্ত্তার এই ব্যাকুল উৎকঠ্য, বিনিজ্ঞ নয়নে এই সুনীর প্রতীক্ষা, শকেগ্ন অভিমান-জড়িত এই শাসন এবং সরোপরি এই অঙ্গধারা প্রাবিত অনন্তের মধ্যে দিয়ে মারীচদয়ের কোন গোপন রহস্য আজ অকস্মাত উদ্ঘাটিত হলো? শয়্যা ত্যাগ করে আধারকার গাঁথিয়ে এসে দাঢ়ালেন।

গুর্তি বিগতপ্রায়। তারকাহীন নভস্তুল মেঘমালায় আবৃত এবং দিগন্তবর্তী তক্ষণেশী বিলীয়মান মুজনীর দ্বিষৎ ঘন অঙ্ককারে আচ্ছম। আসম প্রভাতের প্রতীক্ষারত ধরণীর এই প্রশাস্ত গন্তীর মৃতির

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধারকার যেন আজ তার জীবন-সেবতার প্রসর কল্যাণ করম্পূর্ণ প্রথম অনুভব করলেন লক্ষণ। সুই হাত যুক্ত করে প্রগাম করলেন কাকে তা তিনি নিজেই জানেন না। শুধু “আমি ধন্য, আমি ধন্য” এই বাক্য তার উদ্বেল অন্তরের অন্তর্ভুক্ত থেকে উত্থিত একটি মহান সঙ্গীতের মতো পুরুলোক, ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে বিশ্বলোকের বীণাগত্ত্বাতে অনাংশ রাগিণীতে খনিত হতে লাগল।

আধারকার ধাক্কেন বছেতে, সুনন্দা থাকেন লাহোরে। প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু প্রেজনা গশনা করে নয় দূরত্ব, নেকট্টের নির্দেশ হৃদয়ে। হৃদয়ের সে অদৃশ্য যোগাযোগের নিকটে ব্যক্তে বহুমুখ্যত্বী এই দুটি নরনারী পরম্পরারের কাছে রাখিলেন নিকটতম।

সুনন্দা একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল, “চাক, ইংরেজীতে কথা কয়ে সুখ নেই। আমি যদি মারাঠি বলতে পারতেম তবে বেশ হতো।”

আধারকার বললেন, “পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসতে পারে, মহম্মদ যাবে পর্বতসম্বক্ষে।”

অসাধ্য সাধন করলেন আধারকার। ছ’মাসে শিখলেন বাংলা, বৎসরকালে কঠই করলেন রবীন্নাধের কাব্য, দুবছরে সাঙ্গ করলেন পঠনযোগ্য সমুদয় বাংলা সাহিত্য।

আধারকারের পরিজনেরা পরিলোকগত। এক বোন স্বামী-পুত্র নিয়ে আছে কঠনে। তার সঙ্গেও যোগাযোগ সুস্থ নয়। এতকাল বৃষ্টহীন পুল্পের মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিলেন আধারকার। কর্মে, চিঞ্চায়, জীবনযাপনে ছিলেন স্বাধীন। এবার সে-বনিয়ন্ত্রিত জীবনের ধারা হলো বদল। বৰে থেকে চিঠি লেখেন লাহোরে, “নবা, বাড়ির বেয়ারাটা ছুটি চাইছে তিন মাসের আগাম মাহেই সমেত, দেবো কিনা লিখো।” কিংবা লেখেন, “মালবার হিলসে ওয়ালকেরের গোড়ে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে সন্তান। কিন্বব কি?”

নিজের ভালো-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত ভাবনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এক দূরবর্তীয়ী নিঃসম্পর্কীয়া অভিভাবিকার হস্তে, কিছুদিন মাত্র আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। আস্থসমর্পণে যে এত সুখ, নির্ভরতায় যে এত প্রশান্তি, তা কখনও জানেননি এর আগে।

চৌক

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আধারকারকে যেতে হলো বিলাতে। লাহোর থেকে সংপত্তীক ব্যানার্জী সহেব এসে জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন ব্যালার্ড পিয়ারে।

দিন গেল, মাস বিগত, বৎসরও অতীত প্রায়। বিরহ বেদনায় পীড়িত যে-দিনগুলি অন্তর্ভুক্ত মনে হয় প্রথমে, তারও শেষ আছে। আধারকার প্রত্যাবৃত্ত হলেন স্বদেশে। অবিলম্বে গেলেন লাহোরে।

অস্বাগের প্রভাত। ট্রেনের কামরায় ঘূম ভেঙে গিয়ে আধারকার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, নির্মেঘ আকাশে সূর্যদয়ের স্বর্ণচূটা বিচ্ছুরিত। শাল তরুর কোমল শ্যামল পল্লবদল শিশিরাদ্ব বাতাসে মন্দু কম্পিত। টেলিগ্রাফের তারের উপরে উপবিষ্ট একজোড়া খণ্ডনী পক্ষিশাবক ঘন ঘন পুচ্ছ-আদেলনরত। অকারণ খুশিতে ভরে উঠল তাঁর মন।

অপরাহ্নে লাহোরে স্টেশনে পৌছে দেখলেন একা ব্যানার্জী সাহেব এসেছেন অভ্যর্থনায়। বাড়ি পৌছে বেয়ারার হাতে পেলেন চিঠি। অতি পরিচিত অক্ষয়ে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এক বিশেষ জরুরী কাজে একটি মহিলাকে নিয়ে যেতে হলো এক জ্যাগায়, চামের ব্যবস্থা রইল বেয়ারার কাছে। আধারকার যেন চা খেয়ে নেন। সংজ্ঞার মধ্যেই ফিলবেন্ট তিনি।

শুধু চায়ের ব্যবস্থা নয়, স্নানের ঘরে বাথ-ট্বে ধরা আছে জল, টাওয়েলরাকে ধ্বনিবে তোয়ালে, সোপ-কেসে আছে আনকোরা সুগন্ধি সাবান। শয়নকক্ষে পরিপাটি বিছানা, খাটের পাশে ছেট টিপাইর উপরে সুন্দর টেরিলিয়াম্প ও খানকয়েক সদা প্রকাশিত ইংরেজী উপন্যাস, মাঝ জয়পুরী ফুলদানীতে সংযুক্ত আধারকারের প্রিয় ষেত করবীগুচ্ছ।

অতিথির পরিচয়ি, আদরে, আপ্যায়নে লেশমাত্র জটি নেই কোনোথানে। তবুও কেন যে

অধারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে আধারকার নিজেই তা জানেন না। প্রাণে কতদিন নিষ্ঠাহীন রজনীতে করনা করেছেন আজকের এই মুরগি। কী বলবেন, তা নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করেছেন, কত বার। দীর্ঘ বারোমাসের পঞ্জীভূত কথার মধ্যে কোনটি বলবেন সর্বাপ্রে কোন প্রশ্ন, কোন সংবাদ দেবেন ও নেবেন, তাই নিয়ে অবসরক্ষণে ভেবেছেন কতদিন। দেখা হলে যে-কথা ভেবে রেখেছিলেন, তা হয়তো যেতো তরিয়ে, অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানব্য রইত চাপা, হয়তো শুধু উচ্চারণ করতেন ছাপ্ট একটি সাধারণ প্রশ্ন “কেমন আছ;” তার কিছুই হলো না। খচখচ করতে লাগল আধারকারের মন। হেমন্তের দিনটি যে অপরিসীম আনন্দের অর্থ নিয়ে শুরু হয়েছিল, সে আনন্দ নিয়ে যেন শেষ হলো না।

আধারকার সাতদিন রইলেন লাহোরে। সুন্দরার সেবা, যত্নে ও অতিধেয়তায় রঞ্জ মাত্র রইলো না কোথাও, কিন্তু তবুও যেন আগেকার সে সূর বাজল না আধারকারের মর্মে, রস সঞ্চারিত হলো না অতিথির মনে। কোথায় রঙ্গ ঝাঁক, কোনখানে ঘটল ব্যত্যয়, তার নিশান পাওয়া গেল না। শুধু ব্যথা জেগে রাইল হৃদয়ের নিচ্ছততম গহৰে। যে-অভাব চোখে দেখা যায় না অথচ বুকে বোঝা যায়, তার বেদনা দূর করার উপায় কী?

সুন্দরা কি বদলেছে? কই বোঝা তো যায় না। কিন্তু মন বলে, কী যেন নেই। অতি সামান্য বিষয় কাঁটার মতো বিধে আধারকারের মনে, কুশের অক্ষুর সম কুস্ত, দৃষ্টিঅগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম। কিন্তু সেগুলি এমনই অকিঞ্চিতকর যে, তা নিয়ে নালিশ করতে গেলে হাস্যকর ঠেকে। আধারকারের কোটোর যে একটা বোতাম ছিড়েছে তা যদি একদিন সুন্দরার চোখে না পড়ে থাকে তাতে বিশ্বায়ের কিছুই নেই। একটা মন্ত সংসারের সমস্ত পরিচালনভাব যে-গৃহিণীর মাথায়, তার পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এটা যুক্তি কথা। কিন্তু মানুষের মন তো ইশ্বরুক্তিভ লজিকের পাঠ্য কেতাব নয়। সে ফস্ক করে পাটা প্রশ্ন করে বসে, কই, আগে তো এমন চোখে না পড়তে সেখনি কখনও।

লাহোর ত্যাগের দিন আধারকার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন ব্যানার্জীদের এক বক্তু-পরিবারে। সে-গৃহে আধারকারের সম্প্রীতি যথেছিল সুন্দরাদেরই বক্তুতাসূত্রে। গৃহস্থামীর কন্যা বললেন, “আজই যাচ্ছেন কী রকম? এসেন তো এই সে দিন!”

“সে-দিন আর কোথায়, দিন দশেক তো প্রায় হলো!”

“দশ দিন? কক্ষনো নয়, আমি বলছি অনেক কম। সাত দিন। আজ্ঞা বাজী রাখুন? আপনি এসেছেন গেল শনিবারে, সেই যেদিন সুন্দরাদি, রাণু মাসিমা, আমরা সব সিনেমায় গেলাম।”

“সিনেমায় গেলে?”

“হ্যাঁ, রাণু মাসিমা এসেছিলেন এখানে বেড়াতে। তিনি সেট এন্ডুজে সুন্দরাদির সঙ্গে এক ঝাসে পড়তেন তো? তিনি ধরলেন সিনেমায় যেতে হবে। টিকিট কেলা হয়ে গেছে পর ব্যব এল আপনি আসছেন ঐ দিনই বিকালে। সুন্দরাদি তাই যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু রাণু মাসিমা চলে যাবেন পরাদিন সকালে। কাজেই শ্বেষটাই অনেক বলাতে রাজী হলেন। কই আপনি শুনছেন না তো, কী ভাবছেন? বাজী হেরেছেন কিন্তু।”

আধারকারের মুখে-চোখে যে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হলো, তাকে বাজীতে হেরে যাওয়ার শোক নাত্র বলে গণ্য করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না এককূশও।

আধারকারকে ট্রেনে তুলে দিতে সে-দিন সম্ভায় যথারীতি টেক্ষণে এসেছিলেন স্থামী স্ত্রী। ওয়েটিং রুমের একান্তে সুন্দরা জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাকে আজ সামাদিন এত অনন্মনা দেখাচ্ছেন? কী এত ভাবছো বলো তো?”

আধারকার চমকে উঠে তৎক্ষণাত্মে আস্তসংবরণ করে বললেন, “কই, না, তো?”

ট্রেন ছাড়ল। প্ল্যাটফরমের উপর রুমাল সঞ্চালনরত বাজী-বাজীদের মুঠি দূর হতে দূরতর, কীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অক্ষকারে মিলিয়ে গেল। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল জ্বল্যাটা ধীরে ধীরে চলে গেল দৃষ্টিপাতারে।

বার্থে ঝাল্লি দেহ এলিয়ে দিয়ে আধারকার ভাবতে লাগলেন সেই একই কথা যা আজ সকাল

বেলা থেকে কিছুতে তাড়াতে পারছেন না মন থেকে। কেমন করে সম্ভব হলো তার আগমন দিনে সুন্দরীর পক্ষে যাজ্ঞবীসঙ্গ ? প্রিয়সামিধের চাইতে বড় হলো সিনেমা ? টিকিট কেনা ছিল ? কত লক্ষ টাঙ্কা দাম সে টিকিটের ? কথা দেওয়া হয়েছিল বাজ্ঞবীকে ? কথা কি ভাঙা যায় না কিছুর জন্যই ? কই আধারকার তো কলনা করতে পারে না এমন কোনো এন্গেজমেন্ট যা সুন্দরীর অভ্যর্থনার জন্য সে অগ্রহ্য না করতে পারে অবহেলে। এক বছর পরে সুন্দরী যদি আসত লক্ষণ থেকে পুণ্য, কিংবা ধরো লাহোর থেকে বস্তে, আধারকার কি তার নিকটতম বস্তুর অনুরোধ এড়াত না, মাথাধরা বা শরীর খারাপের কল্পিত অজ্ঞাত দেখিয়ে ? প্রিয়জনের জন্যে মিথ্যাভাবশেও কি নেই সুখ ?

বেশ তো, না হয় ধরে নেওয়া গুল, বাল্যবস্তুর কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। আগেভাগে টিকিট কেনা ছিল, যেতে হয়েছে সিনেমায়। এতে দোষ কিছুই নেই। কিন্তু তার জন্য গোপনীয়তার আবশ্যক ছিল না, ছিল না জীবনী কাজের দোহাই দিয়ে এই মিথ্যা ছলনার !

বস্তে মন বসল না কাজে, তিক্তিতে পারলেন না দীর্ঘকাল। আবার গেলেন লাহোরে। কিন্তু ব্যক্তি লয় যেয়াল গানের মতো কিছুতে পৌছতে পারলেন না আর সমে, বেতালা বেস্তো বাজতে লাগল জীবনের রাগিণী। ভারকেন্দ্র থেকে যেন চাত হয়ে পড়ল এই দুটি অনাস্থীয় নরনারীর তিন বছর ধরে দিনে দিনে গড়া হস্তয়াসৌধ। ফিরে গেলেন বস্তে। এমনি করে বারংবার যাওয়া আসা করলেন বস্তে থেকে লাহোরে, লাহোর থেকে বস্তে।

অবশ্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতকাপে এই অস্থির ব্যাকুলতার একদিন ঘটল অবসান।

আধারকার আবার লাহোরে। সংশয় বেদনায় বিচলিত। অথচ প্রকাশ অভিযোগের নেই উপলক্ষ। কারণ সুন্দরীর প্রতি আধারকারের দাবি তো অধিকারের নয়, অনুভূতির। দাবি দহয়ে। সে হৃদয় যুক্তি-আনন্দীন শিশুর মতো বারংবার কেবলই অঙ্গভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুপুরে আপিসের কাজে বের হওয়ার কালে সে-দিন সুন্দরী কাছে এসে দাঁড়ালেন না, আগের মতো এগিয়ে দিলেন না রুমাল, ফাউন্টেন পেন, হাতের ঘড়ি ও পক্ষেটের পার্স। যি বললে, “মেমসাব রসুইমে আলু বনাতী হৈ !” পরদিন সজ্জাবেলো আপিস প্রত্যাগত আধারকার কাউকে প্রতীক্ষমানা দেখলেন না সোতলার বারান্দায়। শুনলেন ধোঁয়ার কাপড় মিলিয়ে নিতে বাস্ত আছেন মেমসাব।

রাগ করার কিছুই নেই এতে। কিন্তু অভিমানাহত মন বলে, কই ইতিপূর্বে কখনও তো ঘটেনি এমন দুঃটিনা। আধারকারের নির্গমন-আগমনক্ষণে কোনো দিন মেখা যায়নি রক্ষনশালায় আলু কর্তৃনের প্রতি গৃহিণীর এই অপ্রতিরোধ্যনীয় অনুরাগ এবং রজকের অপহরণপ্রবণতার বিকল্পে মেম সাহেবের এই সতর্ক পাহারা।

ব্যানার্জীর আপিসে কাজের চাপ ছিল বেশী, প্রত্যাগমনে ঘটবে বিলম্ব। সক্ষ্যার প্রাক্কালে আধারকার প্রস্তাব করলেন, “চল বেরিয়ে আসি, সাহাদারা গার্ডেনস্।”

সুন্দরী বললেন, “না !”

তবু পীড়াপিড়ি করলেন আধারকার।

“কেন, চল না !”

“না, একা তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে কী বলবে ?”

বিশ্বায়ে হতবাক হয়ে রইলেন আধারকার। সুন্দর অভীতের কথা নয়, স্মৃতিকে করতে হবে না মন্তব্য। এই তো বিলেত যাওয়ার আগেও কতদিন দুজনে গেছেন সালিমার বাগে, সিনেমায়, জুহুর সমুজ্জ্বলীরে, বস্তের রেঞ্জেরায়। সুন্দরী নিজে উদ্যোগ করে নিয়ে গেছেন অমৃতসেরের ঝর্ণমদির দর্শনে, ব্যানার্জী রয়েছেন লাহোরে। সে-দিন কোথায় ছিল লোকেরা, কোথায় ছিল তাদের মস্তব্যের প্রতি সহচরিণীর এই অসাধারণ শ্রদ্ধা ?

লোকে দেখলে কী বলবে ? হায়রে এ প্রশ্ন যে আধারকারই আগে তুলেছিলেন একদিন অভীতে !

বস্তে সেবার শীতের শেষে বসন্ত বোগের প্রার্বন্ধিব হলো মহামারীরূপে। আধারকারের গায়ে বেরুল গুটিকা। কী জানি কেমন করে খবর পৌছল লাহোরে। পরদিন সজ্জাবেলোয় সুন্দরী এসে

হাজির হলেন আধারকারের ফ্ল্যাটে। আধারকার বিশ্বিত হয়ে বললেন, “তুমি ?”

শক্ত, স্নেহ ও অভিমান ঝড়িত কঠের উত্তর শুনলেন, “তা ছাড়া আর দুর্ভোগ আছে কার ? ক’দিন হয়েছে ?”

“দিন চারেক, কিন্তু আমি তো খবর দেব না বলেই ঠিক করেছিলাম !”

“তা করবে না ? তা না হলে আর আমাকে ভাবিয়ে মারবে কেমন করে ?”

আধারকার উৎকণ্ঠিত কঠে বললেন, “এই ছোয়াতে রোগ, এর মধ্যে আসবার মন্ত্রণা দিল কে তোমাকে ?”

“ক্রুক্ষ হয়ে সুনন্দা বললেন, “দেখ, আমাকে রাগও না বলছি। মন্ত্রণা দিয়েছে কে ? মন্ত্রণা দিয়েছে আমার অদৃষ্ট !” খানিক থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, “চাকর বাকর হতভাগাণ্ডো গেছে কোন চূলোয় ?”

“বাবুটি আর বেয়ারাটা পালিয়েছে তবে। মাদ্রাজী ড্রাইভারাটা আছে। সে-ই ওষুধপত্র আনে !”

“খাসা ব্যবস্থা, শুধু খবরের কাগজে ‘শোক সংবাদ’ ছাপাটুকুই যা বাকী”, বলে সুনন্দা গেলেন ড্রাইভারের সকানে। তাকে নিয়ে ট্যাঙ্কি থেকে মালপত্র আনলেন উপরে। ঘরদোর করলেন আবর্জনামুক্ত, ধূলিহীন। বিছানা খেড়ে মুছে নতুন করে রচনা করলেন, স্থান্তে রোগীর পথ্য তৈরী করলেন পরম মেপুণ্ডে।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন “ব্যানার্জীকে দেখছি না যে ?”

“তিনি তো আসেননি !”

“আসেননি ? তুমি এসেছ কার সঙ্গে ?”

“কারো সঙ্গে নয়, একা !”

“মানে ?”

“মানে আবার কী ? উনি গেছেন ট্যারে ; ফিরতে দেরী হবে দিন পাঁচেক। তোমার লাহোরের এজেন্টের সঙ্গে পরশু সকালে দেখা হয়েছিল এক দেকানে। তার কাছে খবর গেলেম অসুবিধে ; গাড়িতে তালা প্রটে দুপুর সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরেছি ছুটতে ছুটতে। ওকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে এসেছি এখানে রওনা হতে !”

বিস্ময়ে অভিভূত আধারকার বললেন, “ব্যানার্জী রাগ করবেন না ?”

“হ্যাঁ তো করবেন !”

কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে আধারকার বললেন, “লোকেই যা বলবে কী ? ব্যানার্জী ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন ? একা চলে এলে কেন ?”

বিরক্ত কঠে সুনন্দা বললেন, “এসেছি আমার ইচ্ছে। সোকের ভাবনা ভেবে তোমার মাথা গরম করতে হবে না। তুমি চূপ করে ঘূমাও তো এখন !” বলে শয়াপার্শের চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঢ়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো বেশী ছিল না, রোগীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য টেবিলল্যাপ্সের একটা দিক খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। পশ্চাত থেকে সুনন্দার মুখের অংশমাত্র দেখা যায়। কিছুক্ষণ পূর্বে সুনন্দা স্নান করেছেন। আর্ট্র কৃত্তলদল পিঠের উপর অযত্পৰিষ্কৃত। পরিধানে দেশী টাতের একটি শাড়ি। বামপক্ষের উপর তার অবিন্যস্ত বক্ষিম অঞ্চলপ্রান্তের অস্তরাল থেকে নিটোল সুক্রান্ত বাহুটি অনবদ্য ভঙ্গিতে লালিত। উপর গ্রীবার নিকটে সূক্ষ্ম একটি স্বর্ণহারের একটুখানিমাত্র আভাস। শুধু দীপালোকিত কক্ষে বাতায়নবর্তনীর এই মৌন মৃত্তিটি রোগশয়াস্যায়িত আধারকারের কাছে একটি পরম নিশ্চিত আৰ্থসের মতো প্রতীয়মান হলো। দুর্জনের কেউ আর কোনো কথা বললেন না। শুধু উভয়ের উল্লেখ হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ সমাজ-সংস্কারের সমন্ত ক্ষমতা ও কলঙ্কের উর্ধ্বে দেবমন্দিরের পবিত্র হোমাপ্রিয় মতো যেন জ্বলতে সাগর একটি অনিবার্য অধৃশ্যা শিখায়।

পরের দিন ব্যানার্জীও এসে পৌছলেন। আধারকারের বসন্ত আসল নয়, চিকেন। কিন্তু শোগম্যমুক্ত হতেই সুনন্দা জোর করে নিয়ে গেলেন লাহোরে এবং পক্ষাধিককাল পূর্বে আধারকার ৩০৬ পেলেন না বৰ্ষেতে ফিরতে।

• সে-দিনের সুনন্দাৰ দৃষ্টি ছিল না বাইরে, গ্রাহ্য ছিল না লোকাপবাদেৱ, মন ছিল ইতুজনেৱ
নিষ্ঠা-প্ৰশংসনাৰ অতীত ! সংসারে ছিল না আসক্তি, গৃহকৰ্মে ছিল না আকৰ্ষণ, স্বামীতে ছিল না
মনোযোগ ! কতদিন আধাৱকাৰ শ্মৰণ কৱিয়ে দিয়েছেন সুনন্দাকে, “এই, ব্যানার্জী এসেছে আপিস
থেকে ! যাও, দেখগে তাৰ কী চাই !”

সুনন্দা বলেছেন, “আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে ! তোমাকে আৱ গিলীপনা শেখাতে হবে না। তুমি
ব্যানার্জীৰ বিভীষণ পক্ষেৱ কৌ কি না ?”

সেপিনেৱ সুনন্দা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধু ! সে শুধু প্ৰণয়নী ! সে তো সুনন্দা ব্যানার্জী
নয়, সে সুনন্দা প্ৰিয়দশিনী !

সুনন্দাৰা হিন্দু নয়, ব্ৰীষ্টীন ! বহু বৰ্ষ পূৰ্বে তাৰ পিতামহ এসে শায়ী আবাস গড়েছিলেন
আহোৱেৰ। সুনন্দা মানুষ হয়েছেন যুৱোপীয় আবেষ্টনে, বিদ্যাভাস কৱেছেন শ্ৰেতাজনেৱ কন্ডেন্টে,
পৰিণীতা হয়েছেন ব্ৰীষ্টীয় প্ৰথায়। তাৰদেৱ সমাজে তৱশীৱাৰ অবগুঠনবতী নয়, কৌৰা নহ
অস্তঞ্চুৱিকা। পুৰুষৰেৱ অবাধ সাহচৰ্য দেখানে নিষ্পন্নীয় নয়, বাইৱে বৰুসঙ্গ নয় নিষিঙ্গ ! এমনকি
বিবাহবিছেন এবং পুনৰ্বিবাহেও সামাজিক অস্তুৱায় ছিল না সুনন্দাৰ !

কঠোৱ কিন্তু সত্তা হৃদয়ক্ষম কৱলেন আধাৱকাৰ ! মোহৰ্ভূজ হয়েছে সুনন্দাৰ ! সুধাৰ পাৰ্ত
হয়েছে রিষ্ট ! মহন কৱলে আৱ উঠিবে না মধু, উঠিবে হলাহল !

সে-দিন অপৰাহ্ন বাড়ি ফিৰিবাৰ উৎসাহ ছিল না আধাৱকাৰেৰ। টেলিফোন কৱে জানিয়ে
দিলেন ক্ষিৰতে বিলাস হবে তাৰ। বহুকণ লক্ষ্যহীনভাৱে ইতিষ্ঠতঃ পৰিষ্কৰণ কৱে অবশেষে
উপস্থিত হলেন যাজৈৰ পাশে সিনেমা হলেৱ সম্মুখে। কীঁ যেন কী খেয়াল হলো, টিকিট কিনে
প্ৰবেশ কৱলেন ভিতৰে। ছবি তখন শুক হয়ে গৈৰে। অজুকাৰ ঘৱে টিকিট চেকাৰ বসিয়ে দিয়ে
গেল একটা আসনে। নিৰ্বাৰ্ক চিত্ৰ। কিন্তু শব্দে প্ৰজেক্টোৱেৰ আওয়াজ শোনা যায় স্পষ্ট।
দৰ্শকদেৱ আলাপ, আলোচনা, মন্তব্যৰেও বাধা থাকে না।

হঠাৎ নিজেৰ নাম কানে আসতে চমকে উঠলৈন আধাৱকাৰ। সামনেৱ সাপৰিতে কাৱা বসেছেন
অজুকাৰে তা দৃষ্টিগোচৰ নয়, কিন্তু তাৰা যে পুৰুষ নন সে বিষয়েও সম্বেহ থাকে না। আধাৱকাৰ
উৎকৰ্ষ হয়ে শুনেলৈন।

“যাই বলিস ভাই, এড়ম্যায়াৱাৰ-ঝৰ সংখ্যা আৱ বাঢ়াসনে। আধাৱকাৰ বেচাৰা তো মৰেছে
তাৰ হাতে, আৱ কেন ?”—চাপা কঠে বললেন একটা মহিলা।

উক্ত হলো, “হ্যা, বলেছে এসে তোৱ কানে কানে !”

আধাৱকাৰ আসন থেকে প্ৰায় পচে যাইছিলেন মাটিতে। ভুল কৱাৰ সাধা কি ও কষ্ট ? এ কষ্ট
যে তাৰ জীবন ইতিহাসেৱ সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অছেদ্য বকলনে। প্ৰথম শুনেছিলেন তিন বছৰ
পূৰ্বে সদুৱ স্টেশনে।

স্বীকৃত্যেৱ পৰিহাস পৰিবাদ চলতে লাগল মডুকষ্টে, কিন্তু আধাৱকাৰেৰ ঝতিৰ অগোচৰ ঝইল
না এক বৰ্ষও।

প্ৰৱৰ্কৰ্ত্তাৰ বললেন, “কানে কানে বলতে হবে কেন ? আমাদেৱ কী তোখ নেই ? স্পষ্ট দেখতে
পাচ্ছি, আৱ কোনো আশা নেই লোকটাৰ !”

“ইস, বড় যে দৱদু দেখছি ! ওগো কৰুণাময়ি, তবে তুমিই ত্ৰাণ কৱ না কেন তাকে !”

“বলিস কি ! সহিতে পাৱিৰি ? তা হলৈ যে তোৱ মুখচৰ্মা অমাবস্যাৰ অস্তুকাৰে ছেয়ে যাবে,
বৰুবিশেষ ঘটবে আমাৰ !”

“একটুও না ! দিবি কৱে বলছি, আমাৰ তাতে কি আসে যায় ? বৰং ছাড়া পেলে হাপ ছেড়ে
ধাচি !” কষ্ট পৰিহাসতৰল নয় এবাৰ !

প্ৰৱৰ্কৰ্ত্তা নিজেও বোধহয় কিছুটা বিশ্বিত হলেন। কৌতুক পৰিহাৰ কৱে বললেন, “কেন ভাই,
আধাৱকাৰকে তো বেশ ভালো লোক মনে হয়। ভদ্ৰ, পিক্ষিত, বিস্তৃশালী অধিক স্ব নয়,—বেশ
সিংশৰ !”

“সিংশৰ নয়, সিংশৰটৰ ! কাষজ্জন নেই এতকুন্কুন ! সব জিনিয়ই অভ্যন্ত সীৱিয়াসলি নেবে।

করে কখন fun করে কী বলেছি, কী করেছি, সেটাকেই মনে করে বসেছে, আমি ওর প্রেমে পড়েছি। ইডিয়ট! সত্যি বলছি তোকে, আমি ক্রমশঃ যেন টায়ার্ড হয়ে উঠছি।"

হঠাতে ছবির স্পুল ছিড়ে গিয়ে ছবি হলো বক্ষ, আলো জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহের। সে আলোতে দেখা গেল আলাপ আলোচনারত বাঙ্গীনীয়কে অদূরবর্তী আসনে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জোড়া-দেওয়া ফিল্ম শুরু হলো। আবার অডিটরিয়ামের বাতি দেওয়া হলো নিভিয়ে।

ছবির আখ্যান-ভাগ এক তরঙ্গী প্রেক্ষিকন্যার প্রগম্যকাহিনী। তাঁর দরিদ্র প্রেমাপ্সদ চলে যাচ্ছেন দূরদেশে জীবিকার প্রয়োজনে। সন্ধ্যাবেলায় পরিজনের অলঙ্কিতে উদ্যান-বাটিকায় তরঙ্গী সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে সঙ্গীনী হতে চাইলেন দয়িত্বে। কিন্তু তরঙ্গ চায় না ধৰ্মীকন্যাকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনতে। বলে, আমাকে ভুলে যেও। মনু করো,—এক সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতরূপে দুজনে দেখা হয়েছিল এক পাহুচালায়, রাত্রি প্রভাতে যাত্রীরা চলে গেছে নিজ নিজ বিভিন্ন পথে। আর দেখা হবে না কোনো দিন।

প্রেক্ষিকন্যার প্রেম গভীর। ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রশংসন তাঁর কাছে তুচ্ছ, দৃষ্টি নেই মণি মুক্তা বিলাসোপকরণ বা ঐরূপর্যন্তারে। যাকে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তাঁর বিহনে প্রাণ ধারণ করবেন কেমন করে? হে নিষ্ঠুর যদি ফেলে যাও এ অভাগিনীকে, পায়ে দলে যাও কোমল হৃদয় তবে জেনো মৃত্যু তাঁর অবধারিত।

দর্শকগণ রূপৰাস প্রতীক্ষায় সম্মুখের পর্দায় নিবাক্ষুর্দ্ধি।

প্রগম্যব্যকৃতা বর্মীর এই আঘাতসম্পর্কে কী করবে তরঙ্গ নায়ক? প্রচুর পাউডারপ্লিপ্প নায়িকার গণ্ডদেশে ঠাস্ করে একটি সবল চপেটায়াত করলে আধারকার সব চেয়ে খুঁশ হতেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? ছবিতে দেখা গেল, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাদ, মাধীলিতায় ফুটেছে গুচ্ছ ফুচ্ছ ফুল, পরম্পরার চঙ্গুতাড়না দ্বারা প্রণয় নিবেদন করছে তরঙ্গাখে উপবিষ্ট ক্রোক্ষমিথুন এবং উদ্যানের সরোবরে দুটি প্রকৃটিত পিয়া হঠাতে দুদিক থেকে ভাসতে ভাসতে এসে মিলল একসঙ্গে। ভারতীয় সিনেমার এই চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকে ছায়াচিত্রের নায়কেরা চিরকাল যা করে থাকে তাই করল তরঙ্গ। বাঞ্ছন্মে আবক্ষ করল নায়িকাকে। দুজনে হাত ধরাধরি করে রওনা হলো। কোথায়, তা অবশ্য একমাত্র চিরপরিচালকই জানেন! বিমুক্ত দর্শকবৃন্দের সফর করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল প্রেক্ষাগৃহ। শেষ হলো নাটিকার।

সকলের অলঙ্কিতে আধারকার নিজস্ব হলেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে। মনে মনে বললেন, একমাত্র নাটকের মধ্যেই সম্ভব এই অবাস্থা কাহিনীর অবতারণা। সেখানে তো সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই। তাই তার কল্পিত নায়িকার পক্ষে কোনো অসম্ভব আচরণ বা কোনো অস্বাভাবিক উক্তি করতেই বাধা নেই। তা শুনে আমরা বিমুক্ত দর্শকরাও 'এক্সের', 'এক্সের' বলে চেঁচিয়ে উঠি। আমরা তো জানিনে প্রেক্ষিকন্যার যে-প্রগম্যনিবেদন দৃশ্য দেখে আমাদের চক্ষু অক্ষসজ্জল হয়ে ওঠে তার খোলে আনাই স্টেজ-ম্যানেজ্মেন্ট খোলে আনাই ফান। শমষটাই ফাঁকি। হতভাগ্য নায়ক সে তথ্য জানতে পারে দুদিন পরে। কিন্তু সে তো দর্শকের দেখাব উপায় নেই। রচিত কাব্যের বিদ্বেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে সে থাকে চিরকাল লোকলোকনের অক্ষরালে। নাটকের যেখানে শেষ, জীবনের সেখানেই তো শুরু!

সেই রাত্রেই লাহোর পরিত্যাগ করলেন আধারকার।

শাত বারেটায় ট্রেন। খোয়া-ঠাঁধানো পথের উপর দিয়ে মৃত্যুর গতিতে চলেছে টাঙ্গা। এপথে ক্ষত্বার আসা-যাওয়া করেছেন আধারকার। কিন্তু আজকের এই যাত্রা তো অন্য আর বারের মত নয়। তখন যাওয়ার মধ্যে থাকতে অদূরবর্তী পুনরাগমনের আঘাত, থাকতো পুনর্মিলনের সত্ত্ব প্রতীক। আজ সে-আশা রইল না এতকূণ। যে গৃহস্থার এইমাত্র অতিক্রম করলেন, যে পথ দাখলেন পশ্চাতে, কদাচ তা পুনশ্চারণের আর সন্তানবন্ন রইল না।

যুক্তক্ষেত্রে দেখা যায়, বোমার আঘাতে আহতের একটি বাহু দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে আছে অদূরে, অর্থ তার সংজ্ঞা হয়নি বিলুপ্ত। গ্রাম্যলোক-বাহিত সে আহত স্পষ্ট দেখতে পায়,

যায়াবৰ অমনিবাস ৬

ফেলে রেখে যাচ্ছে সে আপন খণ্ডিত বাহু। আধারকার অনুভব করলেন সেই অনুভূতি। আপন চোখে দেখতে পেলেন পশ্চাতে ফেলে রেখে যাচ্ছেন—বাহু নয়, শতধায়ীর্ণ হৃদয়।

ফানই বটে! স্বেহ নয়, প্রীতি নয়, প্রোড়া-গন্ধ বিমণিত হৃদয়াবেগের বাষ্প-মাত্র নয়, শুধু কৌতুক। নিখুঁত প্রণয়ের উপশম আছে করণায়, কিন্তু উপহসিতের নেই সাজ্জনা। তার লজ্জা দুঃসহ।

এই হৃদয়হীন নারীর ছলনাকেই সত্য কল্পনা করে বিভাষ্ট হয়েছিলেন আধারকার,—একথা তেবে নিজের উপরেই গভীর বিত্তস্থ জ্ঞাল তার। কতদিন প্রমত্ত প্রগল্ভতায় হৃদয়ের কত দূর্বলতা ব্যক্ত করেছেন তার কাছে, কত স্বপ্ন গড়েছেন তাকে কেন্দ্র করে, সেসব স্মরণ করে বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিলেন আধারকার।

গভীর বেদনা ও অপরিসীম লজ্জা নিয়ে আধারকার ফিরে চললেন ব্রহ্মানে। অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি যোজন দূরের যে তারকা-শ্রেণী অনিমেষ নয়নে এই বিপুলা ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে আছে, তারা সাক্ষী রইল আর একটি সকরণ কাহিনীর। যুগ্মযুগ্ম ধরে এমন কতগুলি অঙ্গুজল বেদনাবিধুর নাট্য অভিনীত হয়েছে তাদের পলকহীন নয়নের অকল্পিত দৃষ্টির সম্মুখে। কত খেলা গেছে ভেঙে, কত ঘূল বরেছে ধূলায়, কত বাঁশরী হয়েছে নীরব।

এই স্বরূপরিসর জীবনের প্রায় সম্মুখ অংশ আধারকার কাটিয়েছেন একা। এই তো সে-দিন পর্যন্ত চাকর বেয়ারা মাত্র সম্ভব ফ্ল্যাটে আপনাকে নিয়ে আপনি ছিলেন মগ। আজও আবার সেই নিঃসংযোগে একাকিন্ত্বের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করলেন। অথচ এ দূরের মধ্যে কি অপরিসীম প্রভেদ। আকাশ আজ নিঃশব্দে শূন্য, বাতাস আজ নিরর্থক, এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ ও সম্বাদের যাবতীয় কর্ম বিস্তার ও ক্লাস্টিক।

নিজের অঙ্গীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখলেন আধারকার। একটা বিছাট মরুভূমির মতো সর্বত্র উন্নত। কোনোখানে নেই একটু ছায়া, একটু শ্যামলিমা, একটু আলোক আধার বিজড়িত লিঙ্ঘতার চিহ্ন লেশ।

আধারকার মৃদ্ধই বটে। কাঁচকে তেবেছিলেন হীরা, সদ্য টাকশাল থেকে নির্গত উজ্জ্বল ত্বক্ষ্বভূকে শ্রম করেছিলেন শিনি বলে। গাঁজিজির একটা লেখা চোখে পড়ল, আধুনিকাদের সম্পর্কে। তারা নাকি প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবে একটি ঝুলিয়েট, এক সঙ্গে আধ ডজন রোমিওর প্রগয়নী। আধারকারের মনে হয়, এতদিনে যেন অর্ধ পেলেন।

কিন্তু নিষিদ্ধ হতে পারেন না একেবাবে। আবার সংশয় জাগে চিত্তে। একাধিক রোমিওর জন্য কি দুর্ঘাগের রাত্তিরে উৎকষ্ট্য বিনিষ্ঠ রজনী যাপন করা যায়? সম্ভব হয় তাদের অসুখের সংবাদে স্বামী সংসার ফেলে একাকী একহাজার মাইল ছুটে যাওয়া!

বস্তে ফিরে মাস কয়েক বিপুল উদ্যামে চেষ্টা করলেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে কর্মের মধ্যে। মিলের কাজে খাটিতে লাগলেন সকাল থেকে সক্ষাৎ। ভুলতে প্র্যাস করলেন বিগত তিন বৎসরের ব্রহ্মায় স্বপ্নোক। করতে চাইলেন নতুন করে জীবনারস্ত। কিন্তু মন তো শিশুদের আক কষার ছেট নয় যে, ইচ্ছা মতো পেলিলের আঁচড় মুহূর নতুন করে সংখ্যাপাত করা যাবে। নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষিত হলেন আধারকার। তারপর জলের দামে একদিন হঠাৎ মিল দিলেন বিক্রি করে। অস্তর্ভিত হলেন বর্ষে থেকে।

গেলেন মালয়া, রবারের বাগানে হলেন ম্যানেজার। ভালো লাগল না বেশী দিন। গেলেন সিলোনে এক কফি কোম্পানীর কর্তৃকাপে, টিকতে পারলেন না দু'বছর। বুয়েনস এয়ার্সে কাজ করলেন মদের কারখানায়; সেখানেও বিরক্তি ধরল। পরিবারক হয়ে দীর্ঘকাল পরিপ্রেক্ষণ করলেন, দেশ দেশান্তর। নানকিং, ক্যানবারা, টরোন্টো, ওয়াশিংটন, সাইপার্সিগ, ব্রাসেলস্। তবু ভুলিল না চিত।

নিউ ক্যাসেলের এক ইংরেজ কোম্পানী থেকে এককালে নিজের মিলের জন্য আধারকার কিনেছিলেন কিছু সাজ-সরঞ্জাম। তাদের ভারতীয় শাখার ম্যানেজারকাপে অবশ্যে আধারকার এলেন দিল্লীতে। এখানে আছেন আজ প্রায় এগারো বছর। যে মিল তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন

কৃষ্ণ বছর আগে, তার ম্যানেজিং ডি঱ের্স্ট আজ কোটিপতি। সেখানে এক উজ্জন কর্মচারী আছে যারা আধারকারের চেয়ে বেশী-মাইনে পায়।

বছরের পর বছর হয়েছে গত। জীবনের আজ অপরাহ্ন বেলায় এসে পৌছেছেন আধারকার। সেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বার্ধক্যের আক্রমণ-আভাস। হৃদয়বেগের যে-তীব্রতা ঘোবনের লক্ষণ, আজ তা স্থিতিত্বে।

যে-সুন্দরকে আধারকার ভালোবেসেছিলেন, সে তো শুধু এই রক্ত মাঝের মানুষটি নয়। প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যে একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা ধীকে ভালোবাসি তাকে আমরা নিজের মনে মনোমত করে গঠন করি। যে সৌন্দর্য তার নেই, সে সৌন্দর্য তাতে আরোপ করি। যে-গুণ তার অভাব, সে গুণ তার কলনা করি। সে তো বিধাতাঙ্ক-সৃষ্টি কোনো ব্যক্তি নয়, সে আমাদের নিজ মানসোজ্জৃত এক নতুন সৃষ্টি। তাই কুণ্ঠপা নারীর জন্য রংপূর্ণ, বিস্তৰণ তরঙ্গের যথন সর্বস্ব ত্যাগ করে, অপর লোকেরা অবাক হয়ে তাবে, “আছে কী এই মেয়েতে, কী দেখে তুলল ?” যা আছে সে তো এই মেয়েতে নয়,—যে ভুলেছে তার বিমুক্ত মনের সুজনধর্মী কলনায়। আছে তার প্রণয়াঙ্গনলিপ্ত নয়নের দৃষ্টিতে। সে যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে তাহারে রচনা।

আধারকারের দৃষ্টি থেকে সে-অঞ্জন আজ বিলুপ্ত, মন থেকে সে-মোহাবেশ অপসৃত। একদিন জগতের সমস্ত কবিকুলের কল্পনাক থেকে আহত যে-সৌন্দর্য, যে-সুন্দরা, যে-বৰ্ণসংস্কার দ্বারা সুন্দরাকে তিনি রচনা করেছিলেন তিলে তিলে, আজ তার লেশমাত্র নেই। প্রবর্ধিত আধারকারের কাছে সুরুদ্বা আজ একজন অতি সামান্য রমণী মাত্র। কোনোখানে তার গত্তেকু অনৰ্বচনীয়তা, গত্তেকু বিশেষত্ব অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন ! আজও ক্ষতের মূল বরেছে গভীরে যদিও চিহ্ন গেছে মিলিয়ে। অসাবধান মুহূর্তে ছোয়া লাগলে আজও কেন টনটন করে ব্যথায় ? কেন নিঃশেষ হয় না স্মৃতি ?

আধারকারের কাহিমী শেষ হলো।

বাক্তব্যীন নিষ্ঠুরতায় বসে রাইলেম খানিকক্ষণ।

“হুজুর, ট্যাঙ্ক স্যানে পড়েগো ?”

চমকে চেয়ে দেখি আধারকারের ভৃত্য। কখন আধারকার উঠে চলে গেছেন, নিঃশেষে, টের পাইন একটুও। আপন জীবনের নিশ্চৃত গোপন কাহিনী ব্যক্ত করেছেন আজ এক অতি অল্প দিনের পরিচিত অসমবয়সী বৃক্ষের কাছে। যখন বলে গেছেন, তখন অবগাহন করেছেন স্মৃতির ধারায়। কাহিনী সঙ্গ হতেই সে-মোহজাল ছিল হয়েছে, নেমে এসেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ ভূমিতে। সক্ষেচ দেখা দিয়েছে সেই মুহূর্তে, যেই হয়েছে চোখাচোখি। তাই অদৃশ্য হয়েছেন নিঃশেষে। সূতৰাং বিলায় নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হলোম। ভৃত্যকে টাঙ্ক আনতে করলেম বারণ। পদত্বজে নিষ্কাশ্ত হলোম পথে।

গুরুপক্ষের অষ্টীম ঢাক উঠেছে মেষশূন্য আকাশে, তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দুপাশের ধালোগুলির বিস্তীর্ণ অঙ্গে। পথ জনশূন্য, ধ্বনিবিরল। কাছাকাছি কোথায় যেন হাসনুহানার খাঁড়ে ফুটছে ফুল। তার তীব্র মদির সুবাসে বাতাস হয়েছে উত্তলা আকুল, রঞ্জনী হয়েছে গুর্বিহূল।

চলতে চলতে ভাবছিলেম আধারকারের কথা। কানে বাজতে লাগল সকরূপ শীকারোক্তি, “বার্ম সাহেব, আমি ইডিয়টই বটে ! পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম ; খেলাকে ভেবেছি সত্য। কিন্তু আমি তো একা নই। জগতে আমার মতো মূর্খরাই তো জীবনকে করেছে বিচ্ছিন্ন ; সুবে দুঃখে অশুল পিণ্ডিত। যুগে যুগে এই নির্বোধ হতভাগ্যের দল ভুল করেছে, ভালোবেসেছে, তারপর সারা জীবনভোর কেঁদেছে। হৃদয়নিংডানো অশ্রুধারায় সংসারকে করেছে রসবন, পৃথিবীকে করেছে কৃষ্ণমীয়। এদের ভুল, ক্রিত, বৃজিহীনতা নিয়ে কবি রচনা করেছেন কাব্য, সাধক বৈধেছেন গান, শিল্প। অক্ষন করেছেন চিত্র, ভাস্তুর পায়াণ-খণ্ডে উৎকীর্ণ করেছেন অপূর্ব সুন্দরা। জগতে গুরুমান্বয় করবে চাকরি, বিবাহ, ব্যাকে জমাবে টাকা, স্যাকরার দোকানে গড়াবে গহনা ; স্তু, পুত্ৰ,

স্থামী, কল্যান নিয়ে নির্বিষ্ট জীবন যাপন করবে স্বচ্ছ সচ্ছলতায়। তবু আমরা মেধাহীনের দল একথা কোনো দিন মানবো না যে, সৎসারে যে বখনা করল, দ্রুত নিয়ে করল ব্যাস, সুধ বলে দিল পিটুলী,—তারই হলো জিত, আর ঠকল কেবল সে, যে উপহাসের পরিবর্তে দিল প্রেম।”

অতি দুর্বল সাক্ষনা বৃক্ষ দিয়ে, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে বলা সহজ—“জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।” কিন্তু জীবন তো মানুষের সম্পর্ক বিবর্জিত একটা নিছক তর্ক মাঝে নয়। শুধু কথা গেঁথে ছবি রচনা করা যায়, জীবন ধারণ করা যায় না।

আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যারা কিছুই হাতে রাখতে জানেন না। অন্দের কপালে দৃঢ় অনিবার্য। পলিটিজ্রো মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে এ্যাড্জাস্টমেন্ট আর কম্প্রেমিজ। এ দারুণ ইন্ড্রেশনের বাজারেও সৎসারে শুধু দুরয়ের দাম খুব বেশী নয়।

সুন্দর পক্ষে সম্ভব ছিল না আধারকারের গতিতে তাল রেখে চলা। সে নারী। প্রেম তার পক্ষে একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। আবিক্ষার নয়, যেমন পুরুষের কাছে। মেয়েরা স্বভাবতঃ সাবধানী, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাঁধে। ছেলেরা স্বভাবতঃই বেপরোয়া, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙে। প্রেম মেয়েদের কাছে একটা প্রয়োজন, সেটা আটগোলে শাড়ির মতো নিতান্তই সাধারণ; তাতে না আছে উল্লাস, না আছে বিস্ময়, না আছে উচ্ছলতা। ছেলেদের পক্ষে প্রেম জীবনের দুর্লভ বিলাস, গরীবের ঘরে বেনারসী শাটীর মতো ঐরুবর্যময়, যে পায় সে অনেক দাম দিয়েই পায়। তাই প্রেমে পড়ে একমাত্র পুরুষেরাই করতে পারে দুরহ ত্যাগ এবং দুসূর্যাসাধন।

আধারকার নিজেই একদিন বলেছিলেন, “মিনি সাহেব, জগতে যুগে যুগে কিং এডওয়ার্ডেরাই করেছে মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য বর্জন, প্রিলেস এলিজাবেথেরা করেনি কোনো জন, যিন্ত বা ম্যাকেঞ্জির জন্য সামান্যতম ত্যাগ। বিবাহিতা নারীকে ভালোবেসে সর্বদেশে সর্বকালে আজীবন নিঃস্কর্জীবন কাটিয়েছে একাধিক পুরুষ; পরের স্থামীর প্রেমে পড়ে কোনোদিন কোনো নারী রয়নি চিরকুমারী।”

কোমলদূস বলে আমার খাতি নেই। কিন্তু আধারকারের জন্য সত্যিকার বেদনা বোধ করলেও হাদয়। সুন্দর ব্যানার্জী আজ কোথায় আছেন জানি নে। অনুমান করিছি, এতদিনে তার যৌবন হয়েছে গত, দেহ বিগতশ্রী, দৃষ্টি বিশ্বার্থীন এবং কপোলের রেখাগুলি প্রচুর প্রসাধনপ্রলেপের দ্বারাও আজ আর কোনো মতেই গোপনসাধ্য নয়। কোনো দিন কোনো অবকাশ ময়ূর্তে বহু বৰ্ষ আগেকার এক মারাঠি আঙ্গোরের চরম মিশ্রিতাতার কথা স্মরণ করে ক্ষণেকের জন্যও তাঁর মন উস্মানা হয় কিনা, সে কথা আজ জানার উপায় নেই। অথচ তাঁরই জন্য আধারকার দিলেন চরম মূল্য। নিজেকে বষ্ণিত করলেন সাফল্য থেকে, খাতি থেকে, ঐহিকের সর্বিধি সুধ স্বাজল্য থেকে! সব চেয়ে বড় কথা, নিজেকে বষ্ণিত করলেন সত্ত্বপুর উত্তরপুরুষ থেকে, বংশের ধারাকে করলেন বিলুপ্ত।

কোনো দিন সঞ্চালোয় তাঁর কৃশল কামনা করে তুলসীমঞ্চে কেউ জ্বালাবে না দীপ, কোনো নারী সীমন্তে ধৰবে না তাঁর কল্যাণ-কমলার সিদ্ধান্তচক্র, প্রাবাসে অদৰ্শনিবেদনয় কোনো চিহ্ন হবে না উদাস উত্তল। রোগশয্যায় ললাটে ঘটবে না কারও উদ্বেগকাতর হস্তের সুফল্পর্শ, কোনো কপোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না নয়নের উজ্জ্বল অঙ্গীবিদ্যু। সৎসার থেকে যেমন হবেন অপসৃত, কোনো পীড়িত দুরয়ে বাজবে না এতটুকু ব্যথা, কোনো মনে রইবে না ক্ষীণতম স্থৃতি।

প্রেম জীবনকে দেয় ঐরুবর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবালিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ। যে আগুন আলো দেয়—না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দাহনে পলে পলে দক্ষ হলেন কাণ্ডানাহীন হতভাগ্য চান্দমস্ত আধারকার।

